ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ডঃ অতুল সুর

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক ল কা তা ৬

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৫ । জুলাই ১৯৮৮

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

প্রুফ : দাশরথি মুখোপাধ্যায় ও অশোক উপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলকাতা ৬

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর
শ্রীচরণ স্মরণে

বিষয়সূচী

প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভূপৃষ্ঠে তার আবির্ভাবের দিন থেকেই মানুষ ভারতে বাস করে আসছে। এর পেছনে যে যুক্তি আছে, সেটাই এখানে দিচ্ছি। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তার আগের দুইশত ষাট লক্ষ বৎসর ধরে প্রকৃতির কর্মশালায় চলেছিল এক বিরাট কর্মকাণ্ড। এক শ্রেণীর বানর-জাতীয় জীবগণ (**dryopithecus**) চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হতে। একরূপ এক শাখা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল নরাকার জীবসমূহ। এসব জীবের মধ্যে যারা বৃক্ষ ত্যাগ করে ভুমিতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অন্যতম জীবের নাম রামপিথেকাস (**Ramapithecus**)। রামপিথেকাস থেকেই পরে মানুষ উদ্ভূত হয়েছিল। রামপিথেকাসের আবিষ্কার ঘটেছিল বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত প্রত্নাস্থিতত্ত্ববিদ (**palaeontologist**) স্যার আর্থার কীথ তাঁর **Antiquity of Man** গ্রন্থে লেখেন— **'India is a part of the world from which the student of early man has expected so much and so far has obtained so little.'** ('প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে।') স্যার আর্থারের এই উক্তির অনুসরণেই ত্রিশের দশকে আমেরিকার ইয়েলের ন্যাচারাল মিউজিয়ামের অধ্যাপক ডক্টর টেরা **(Dr. H. De Terra)** ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এ বিষয়ে এক অনুসন্ধান চালান। যদিও তাঁর এই প্রথম অভিযানে প্রাচীন যুগের প্রকৃত মানবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া

যায়নি, তথাপি মানবের বিবর্তনের কতকগুলি মূল্যবান সূত্র তিনি এখানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এককথায় বলতে গেলে, মানবাস্থির সন্ধান না পেলেও মানবের পূর্ববর্তী পুরুষদের অস্থির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক গিরিমালা অঞ্চলে তিনি রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নামধেয় নরাকার জীবের জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার-গুলি নৃতত্ত্বের ওপর নূতন আলোকপাত করে; কারণ ইতিপূর্বে এই পর্যায়ের জীবগণের তথ্য অজ্ঞাত ছিল। ইয়েল অভিযানের সদস্য লুইস সাহেবের মতে এইজাতীয় জীবগুলি (higher primates) জগতের এই অঞ্চলেই প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এদের চিবুকাস্থি ও দান্তিক সংস্থান অনেকটা মানবেরই কাছাকাছি। এ থেকে মনে হয় যে, মানবের বিবর্তন এই অঞ্চলেই ঘটেছিল।

এর অল্পদিন পরে ইয়েল ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ডক্টর টেরা ভারতে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অভিযানেও তিনি আদিম যুগের মানবের জীবাশ্ম পাননি। তথাপি এই প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, এই অভিযানদ্বয়ে এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসরের পুরাতন ভূ-স্তর থেকে তৎকালীন ভারতে মানব-বাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। এ থেকে মনে হয় যে ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্মের সন্ধান নিতান্ত স্বপ্ন-বিলাস মাত্র নয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে রামপিথেকাসের আবিষ্কারের পর আমরা তার জ্ঞাতি-ভাইদের কঙ্কা-লাস্থি পেয়েছি চীন দেশের কেইয়ুয়ানে ও আফ্রিকার কেনিয়ায়। তবে তাদের মধ্যে রামপিথেকাসই সবচেয়ে প্রাচীন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আজ থেকে ১২০ লক্ষ বৎসর পূর্বে শিবালিক গিরিমালা অঞ্চলেই রামপিথেকাসের উদ্ভব ঘটেছিল, এবং সেখান থেকেই তার

জ্ঞাতি-ভাইরা আফ্রিকা ও চীনদেশে গিয়ে সেখানকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে নিজ নিজ বিশিষ্টতা লাভ করে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। রামপিথেকাসের পরবর্তী যে জীবের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি, তারা আজ থেকে কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস। এরা সবাই মানুষের পূর্বপুরুষ মাত্র, ঠিক মানুষ নয়। তবে তারা মানুষের বিবর্তনের পথে এক একটা ধাপ। রামপিথেকাস যেমন আফ্রিকা ও চীনদেশ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, অস্ট্রালোপিথেকাস তেমনই ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জাভা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এরূপ জীবের অস্থি আমরা পেয়েছি জাভার সানগিরানে। আরও পেয়েছি আফ্রিকার তানজানিয়ার অন্তর্গত ওলডুভালে ও গারুসিতে, কেনিয়ার অন্তর্গত বারিনগো এবং লোথাগামে, দক্ষিণ আফ্রিকার টাউঙ, মাকাপান, সোয়ারটক্রানস্ ও স্টার্কফনটেনে। প্রকৃত মানুষ ও অস্ট্রালোপিথেকাসের মধ্যবর্তী জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তাদের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি জাভার সানগিরানে ও মডজোকারটোতে, আফ্রিকার তানজানিয়ার ওলডুভালে, দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়ারটক্রানস্ ও সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত চাদ-এর টায়োতে। তারপর পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে ঋজুভাবে চলাফেরা করতে পারে (**homo erectus**) এরূপ মানবের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি জাভার ট্রিনিলে, চীনদেশের পিকিং ও লানটিয়ানে, তানজানিয়ার ওলডুভালে, আলজিরিয়ার টারনিটাইনে, জারমানির হাইডেলবারগে, হাঙ্গেরির ভেরটেস্‌জোলোসে। তার পরের পর্যায়ের মানুষের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি ইংলণ্ডের সোয়ানস্কুমে, জারমানির স্টাইনহাইমে ও চীনদেশের মা-পা-তে। এর পরবর্তী পর্যায়ের মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ানডারথাল (**Neanderthal**) জাতির মানুষ। নিয়ানডারথাল জাতির মানুষের কঙ্কালাস্থি

আমরা পেয়েছি ইউরোপের নানা স্থানে ও মধ্যপ্রাচী থেকে। আনুমানিক চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্বে নিয়ানডারথাল জাতির মানুষ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার স্থান অধিকার করে ক্রোম্যানিয়োন (Cromagnon) জাতির মানুষ। ক্রোম্যানিয়োন জাতির মানুষ হতেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে।

এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদগণ একমত যে পৃথিবীতে বর্তমানে যত জাতি বিদ্যমান আছে, তারা সকলে একই বর্গ (**genus**) ও প্রজাতি (**species**) হতে উদ্ভুত। তবে তাদের মধ্যে যে-সকল বৈশিষ্ট্যমূলক আবয়বিক পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন জাতিপর্যায়ের (**races**) লোক বলা হয়। যে-কারণে এইসকল নর-গোষ্ঠীর মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য ঘটেছে, তা হচ্ছে—(১) **gene mutation** বা জীনঘটিত পরিব্যক্তি, (২) **natural selection** বা প্রাকৃতিক নির্বাচন, (৩) **genetic drift** বা জীনের নিষ্ক্রিয়তা, (৪) **environmental influence** বা পরিবেশের প্রভাব, ও (৫) **population mixture** বা জন-মিশ্রণ।

আবির্ভাবের দিন থেকেই মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। যে যুগে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, সে যুগে সে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল অতিকায় হস্তী (**mammoth**), বন্য-মহিষ (**bison**) ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু দ্বারা ; আর তার খাদ্য ছিল বন্য ফলমূল ও পশুমাংস। মাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। সেজন্য তাকে পশুশিকারে বেরতে হত। আত্মরক্ষা ও পশুশিকারের জন্য তাকে নানারকম আয়ুধ তৈরি করতে হত। এই আয়ুধগুলিই হচ্ছে প্রাচীন মানবের একমাত্র কৃষ্টির নিদর্শন। মানুষ ছিল বুদ্ধির ধারক (**homo sapiens**)। সেজন্য বুদ্ধি খাটিয়ে ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে, সে প্রস্তরনির্মিত নানারূপ আয়ুধ তৈরি করে ফেলেছিল। তার মানে, মানুষ যে কেবল বুদ্ধির ধারক বা **homo sapiens** মাত্র ছিল, তা নয়। সে

কারিগর বা homo faber-ও ছিল। তার নির্মিত আয়ুধসমূহ আমরা পৃথিবীর নানা স্থান থেকে পেয়েছি। পশ্চিম ইউরোপে এইসকল আয়ুধ চকমকি পাথর বা flint দিয়ে তৈরি করা হত। আর ভারতে এগুলি তৈরি করা হত নদীর ধারে পাওয়া নুড়ি (pebbles) ও কোয়ার্টজাইট পাথর দিয়ে।

ইউরোপে যারা এরূপ আয়ুধ তৈরি করত, তারাই হচ্ছে নিয়ান-ডারথাল মানুষ। এইজাতীয় মানুষের কঙ্কালাস্থির সঙ্গেই আমরা তাদের তৈরি আয়ুধসমূহ পেয়েছি। ভারতে কিন্তু সে-যুগের মানুষের কোন কঙ্কালাস্থি পাওয়া যায়নি। মাত্র তার নির্মিত আয়ুধসমূহই পেয়েছি। বস্তুত ভারতে প্রাচীন মানবের জীবাশ্ম পাওয়া না গেলেও, আমরা তার কৃষ্টির নিদর্শন বহুল পরিমাণে পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি। সুতরাং আদিম মানব যে ভারতে বহুবিস্তৃতভাবে বাস করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওই যুগের নানা বর্গের আয়ুধ ও ব্যবহার্য বস্তুর নিদর্শন যেমন পশ্চিম ইউরোপে পাওয়া গিয়েছে, তেমনই বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, গোদাবরী, নর্মদা ও কৃষ্ণার অববাহিকায়, মধ্যভারতে, কর্ণাটকে, ছোটনাগপুরে, বিহারের কোন কোন স্থানে, আসাম, পঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশে পাওয়া গিয়েছে। ওই যুগের আয়ুধ-সমূহকে প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ (palaeoliths) বলা হয়। ওর পরবর্তী নবোপলীয় যুগেরও আয়ুধ ভারতের নানা অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। তবে মাত্র নবোপলীয় (neolithic) ও তৎপরবর্তী তাম্রাশ্ম ও লৌহ যুগের (chalcolithic and megalithic ages) মানবেরই জীবাশ্ম আমরা ভারতে পেয়েছি।

ভারতের যে-সব জায়গা থেকে এরূপ কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে, তার বিবরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে :

১. ১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত ৪১টি কঙ্কাল।

২. ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের হরপ্পায় প্রাপ্ত ২৬০টি কঙ্কাল।

৩. ১৯৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের তক্ষশিলার ধর্মরাজিকা মঠে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।

৪. ১৯৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের চান্হু-ধারোয় প্রাপ্ত ১টি কঙ্কাল।

৫. ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর নিকট কুমহার-টেকরিতে প্রাপ্ত ৪২টি কঙ্কাল।

৬. ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে তামিলনাড়ুর কোদাইকানালে প্রাপ্ত ৫টি সমাধিপাত্রপূর্ণ কঙ্কাল।

৭. ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরিতে প্রাপ্ত ১৪টি কঙ্কাল।

৮. ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে কর্ণাটকের পিকলিহালে প্রাপ্ত ৩টি সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও একটি চিবুকাস্থি।

৯. ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে কর্ণাটকের মাসকীতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

১০. ১৯৫৪-৫৬ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের নেভাসায় প্রাপ্ত ৩০টি কঙ্কাল।

১১. ১৯৫৬-৬০ খ্রীস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকুণ্ডের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত ১৩টি নবোপলীয় যুগের কঙ্কাল ও ১৪টি মেগালিথিক যুগের সমাধি-কঙ্কাল।

১২. ১৯৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে পঞ্জাবের রূপারে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল।

১৩. ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তামিলনাড়ুর অরিথমঙ্গলে প্রাপ্ত ১০টি সমাধিপাত্র পূর্ণ কঙ্কাল।

১৪. ১৯৫৭-৫৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত ৮টি পুরুষ ও ৪টি নারীর কঙ্কাল।

১৫. ১৯৫৮-৬০ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের লোথালে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল।

১৬. ১৯৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকুণ্ডের ঠিক বিপরীত দিকে কৃষ্ণা নদীর ওপর ইল্লেশ্বরমে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।

১৭. ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের নিকট চণ্ডোলি গ্রামে প্রাপ্ত ২৪টি কঙ্কাল।

১৮. ১৯৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দে রাজস্থানের কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত কয়েকটি কঙ্কাল।

১৯. ১৯৬৩-৬৪ খ্রীস্টাব্দে কর্ণাটকের টেক্কলকোটায় প্রাপ্ত ৯টি কঙ্কাল।

২০. ১৯৬৩-৬৫ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ১৪টি সমাধি-কঙ্কাল।

২১. ১৯৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরের শ্রীনগরে নবোপলীয় যুগের সমাধিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

২২. ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

২৩. ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের রামগড়ের অদূরে সিজুয়ায় প্রাপ্ত প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের জীবাশ্মীভূত এক ভগ্ন চোয়াল।

শেষোক্তটি সবচেয়ে প্রাচীন কঙ্কালাস্থি বলে মনে হয়। এ ছাড়া 'মেগালিথিক' যুগের (প্রধানত লৌহযুগের) যে-সকল সমাধিস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে :

১. ১৮৯৯ থেকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আলেকজাণ্ডার রিয়া (Alexander Rea) কর্তৃক আবিষ্কৃত তিনেভেলি জেলার আদিচানালুরের সমাধিসমূহ।

২. ১৯১৬ থেকে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ডক্টর হাণ্ট (E. H. Hunt) কর্তৃক আবিষ্কৃত হায়দারাবাদের পূর্বদিকে রায়গির ও ভঙ্গির সমাধিসমূহ।

৩. ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের পরে ব্রহ্মগিরিতে চিংগিলপুট জেলার সানুরিলে, ত্রিচুর জেলার পরকালামে, অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকুণ্ড ও ইল্লেশ্বরমে, কর্ণাটকের মাসকিতে, মহীশূরের জদিগেহল্লি, ও পণ্ডিচেরিতে সৌটেইকেলি ও মাওস্তরপেলের সমাধিসমূহ।

উল্লিখিত এই কঙ্কালসমূহকে আমরা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি—(১) নবোপলীয় যুগের, (২) হরপ্পা যুগের, (৩) দাক্ষিণাত্যের তাম্রাশ্ম যুগের, (৪) মেগালিথিক (প্রধানত লৌহ) যুগের ও (৫) আদি ঐতিহাসিক যুগের। তবে মেদিনীপুরের সিজুয়ায় প্রাপ্ত অশ্মীভূত চোয়ালটির বয়স ১০,০০০ বৎসর বলে দাবি করা হয়েছে। সেটা যদি যথার্থ হয়, তা হলে ওটি অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের।

কঙ্কালগুলির আবয়বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন—(১) হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের লোকেরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরস্ক এবং বিস্তৃতনাসা ছিল, তবে মহেঞ্জোদারোর লোকদের নাক হরপ্পা-লোথালের লোকদের মত অত বিস্তৃত ছিল না। (২) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লোকদের তুলনায় লোথালের লোকদের মাথা চওড়া ছিল। (৩) এইসকল পার্থক্য, যথা—মাথার খুলির আকার, নাকের গঠন, ও আকারের দিক থেকে বোঝা যায় তারা সকলে একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৪) তারা দীর্ঘশিরস্ক, প্রশস্তনাসা ও আকারে লম্বা ছিল বটে, কিন্তু হরপ্পা যুগে গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। (৫) ব্রহ্মগিরি, নাগার্জুনা-কুণ্ড, পিকলিহাল, মাসকী ও ইল্লেশ্বরম থেকে মেগালিথিক যুগের প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে মেগালিথ (সমাধিস্তূপের উপর স্মৃতিফলক) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই বিস্তৃতশিরস্ক, আকারে লম্বা ও দৃঢ়-দেহ বিশিষ্ট লোক ছিল। (৬) কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের আদি-চান্নালুরের ও দক্ষিণ ভারতের সমাধি-স্তূপগুলিতে যে-সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে,তারা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরস্ক ছিল। (৭) উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তক্ষশিলা হতে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ওইসকল স্থানে দীর্ঘশিরস্ক জাতির লোকেরাই প্রথমে বাস করত, এবং পরে সেখানে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

সুতরাং এইসকল সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে,

(১) নবোপলীয় যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরস্ক ছিল। (২) হরপ্পা ও অন্যান্য তাম্রাশ্ম যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরস্ক ছিল। কিন্তু গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। (৩) মেগালিথিক যুগের লোকেরা বিস্তৃতশিরস্ক ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহের আগমন পরে ঘটেছিল। এখানে বক্তব্য যে বাঙলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে তা দীর্ঘশিরস্ক। তারা যে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক, তা ওখানে প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় এক সীলমোহর দ্বারা সমর্থিত হয়।

খুব বিপদসঙ্কুল ছিল প্রথম মানবের জীবন। একদিকে যেমন তাকে অতিকায় এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হত, অপরদিকে তেমনই খাদ্য আহরণের জন্য তাকে পশু-শিকারে বেরতে হত। এককথায় প্রাণের ও পেটের দায়ই ছিল তার সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া কোন এক বিশেষ জায়গাতেও সে বহুদিন অবস্থান করতে পারত না। কেননা কোন এক জায়গায় পশুর সংখ্যা হ্রাস পেলে তাকে অপর জায়গায় সরে যেতে হত। তার মানে তাকে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হত। এভাবে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তাকে ৪৯০,০০০ বৎসর কাটাতে হয়েছিল। তার জীবনের এই প্রথম অধ্যায়টাকে আমরা প্রত্নোপলীয় (palaeolithic) যুগ বলি। কেননা এ যুগের মানুষ মাত্র পাথর দিয়েই তার আয়ুধ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস তৈরি করত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানুষ কৃষির উদ্ভব ঘটাতে পারেনি এবং কোনরূপ ধাতুর ব্যবহারও জানত না। তবে এই সময়ের মধ্যে মানুষ পাথর দিয়ে তৈরি শিল্পের একটা ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছিল। এই ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্নো-পলীয় যুগকে তিনটি দশায় ভাগ করা হয় : (ক) early বা আদিম দশা, (খ) middle বা মধ্য দশা, ও (গ) late বা অন্তিম দশা। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের অপর নাম mesolithic period বা

সন্ধিকালের যুগ। সন্ধিকালের যুগ বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এটাই ছিল প্রত্নোপলীয় (palaeolithic) ও পরবর্তী নবোপলীয় (neolithic) যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন।

আগেই বলেছি যে ইউরোপে প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ চকমকি পাথর (flint) দিয়ে তৈরি করা হত; আর ভারতে এগুলি তৈরি করা হত নদীর ধারে পাওয়া নুড়ি (pebbles) ও কোয়ার্টজাইট পাথর দিয়ে। আদিম (early) প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ ছিল পাথরের কেন্দ্রগ আয়ুধ (core tools)। একটা নুড়িকে অপর একটা নুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে, তা থেকে চাকলা তুলে পাথরের পিণ্ডটা দিয়ে এগুলি তৈরি করা হত। এ-যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল হাত-কুঠার (hand-axes), মাংস কাটবার অস্ত্র (choppers), মাংস ছেদন করবার আয়ুধ (cleavers) ইত্যাদি। তবে মূল নুড়ি থেকে যে চাকলাগুলি বেরত, সেগুলিও কোন কোন ক্ষেত্রে ছুরি হিসাবে ব্যবহার করা হত। প্রত্নোপলীয় যুগের মধ্যম দশার বৈশিষ্ট্য-মূলক আয়ুধগুলি পাথরের চাকলা দিয়েই তৈরি করা হত। এ যুগের মানুষরা এই শ্রেণীর আয়ুধ নির্মাণেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। মাংস চাঁচবার জন্য এইসকল আয়ুধ (scrapers) ব্যবহৃত হত। এ-রকম আয়ুধসমূহকে 'flake tools' বলা হয়। আগেকার যুগের আয়ুধ-সমূহও এ-যুগের মানুষ ব্যবহার করত, তবে সেগুলির নির্মাণরীতি আগেকার যুগের নির্মাণরীতি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত ধরনের ছিল। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহকে 'mesoliths' বলা হয়। এগুলি নানা ধরনের অতি-ক্ষুদ্রকায় আয়ুধ। এ-যুগের মানুষ পর্বতগুহায় ও পাহাড়ের ছাউনির তলায় (rock-shelters) বাস করত এবং পর্বতগাত্রে নানারকম চিত্রাঙ্কন করত। বোধহয়, এসকল চিত্রাঙ্কন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হত। ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াই ছিল আদিম মানুষের সর্বজনীন ধর্ম।

ভারতে প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ প্রথম আবিষ্কার করেন ব্রুস ফুট (Bruce Foote), কিংগ (King), ওল্ডহাম (Oldham) ও অন্যান্য অনেকে। সর্বপ্রথম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের নিকটে পল্লবরম নামক জায়গায়। তারপর প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন জায়গায়, যথা—পাকিস্তানের রাওলপিণ্ডি জেলার সোহান নদীর তীরে ও ভারতে তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের অনেক জায়গায়, ওড়িষার ময়ূরভঞ্জ জেলায়, বিপাশা ও বনগঙ্গা নদীর উপত্যকায়, কৃষ্ণা, সবরমতী, মহি, ওরসংগ ও নর্মদা নদীসমূহের উপত্যকায়, উত্তরপ্রদেশের রিহাংগ নদীর অববাহিকায় ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে। বিলাসপুর, দৌলতপুর, দেহরা, গুলার ও নালাগড় প্রত্নোপলীয় যুগের সংস্কৃতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। গুলারে পাঁচটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উপরের চারটি স্তরে আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে কুরনুল জেলার বিল্লসুগম গুহাপুঞ্জের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এসকল গুহা থেকে অশ্মীভূত জীবাস্থি ও অস্থিনির্মিত আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নোপলীয় যুগের কেন্দ্রসমূহে যে-সকল আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে আছে হাতকুঠার, মাংস কাটবার যন্ত্র (choppers), চাঁচবার বা ঘষবার যন্ত্রফলক ইত্যাদি। অধিকাংশ আয়ুধই কোয়ার্টজাইট পাথরের তৈরি। যদিও প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ সম্বন্ধে বেশকিছু অনুশীলন হয়েছে, তবুও আমরা ভারতে প্রত্নোপলীয় যুগের মানবের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে রচনা করতে সক্ষম হইনি। তবে বুঝতে পারা যায় যে প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ নদীর ধারে বা নিকটে বাস করত, এবং পশুপক্ষী শিকার দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করত। মনে হয় যে, যারা নদীর ধারে বা সমুদ্রের উপকূলে বাস করত, তারা বোধহয় গোড়া থেকেই মাছ খেতে আরম্ভ করেছিল। আর যে-সকল পাহাড়ে ঝরনা থাকত, সে-সব পাহাড়ের গুহাতে ও

পাহাড়ে ছাউনি তৈরি করেও তারা বাস করত।

মধ্য-প্রত্নোপলীয় যুগের (middle palaeolithic period) আয়ুধসমূহ পাওয়া গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধুর উপশাখা সোহান নদীর চত্বরে*। উত্তরভারতে বিপাশা নদীর উপত্যকায়*, পূর্বভারতে আসাম*, বঙ্গদেশ* ও ওড়িশায়*, মধ্যভারতে নর্মদা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত আদমগড় পাহাড়ে*, জব্বলপুর অঞ্চলে*, ভেরাঘাট*, বরসিমলায়*, পাণ্ডব জলপ্রপাতে ও বনগঙ্গা নদীর চত্বরে*। দাক্ষিণাত্যে ওই যুগের আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে মহারাষ্ট্রের নেভাসায়*, বোম্বাই-খাণ্ডিবলি অঞ্চলে*, নর্মদা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত গুণ্ডিয়া ব্রহ্মেশ্বরমে*, মাদ্রাজের নিকট অত্তিরাপক্কমে*, তামিলনাডুর গুডিয়াম পর্বতের ছাউনিতে*, ও কৃষ্ণা সেতুতে। (তারকাচিহ্নিত জায়গাগুলিতে আদিম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধও পাওয়া গিয়েছে)।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ পাওয়া গিয়েছে পূর্বভারতে দামোদর নদীর উপত্যকায় অবস্থিত বীরভনপুরে, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়; মধ্যভারতে আদমগড় পাহাড়ে, জব্বলপুর-ভেরাঘাট অঞ্চলে, ও বরসিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে, সিধপুর ও লেখানিয়ায়, মোদি পাহাড়ের ছাউনিতে, বরাকৈচায়, মোরহানা পাহাড়ে, জামবুদিপাদে, ও ডরোথি ডীপ পাহাড়ের ছাউনিতে। এ যুগের আয়ুধ দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়েছে মহারাষ্ট্রের বোম্বাই-খাণ্ডিবলি অঞ্চলে, তামিলনাডুর অত্তিরাপক্কম ও গুডিয়াম গুহায়, কোণ্ডাপুরে, কৃষ্ণা সেতুতে, জলাহল্লি ও টেরি অঞ্চলে। অধিকাংশ স্থলেই এগুলি হচ্ছে ক্ষুদ্রাশ্ম অস্ত্র (microliths) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির নির্মাণে বিভিন্ন শৈলীরীতি অনুসৃত হত।

নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বিশেষ করে পেয়েছি কাশ্মীরে বুরঝহোমে; মাদ্রাজের তিরুনেলবেলি জেলায়; সবরমতী নদীর উপত্যকায়; মহারাষ্ট্রের খাণ্ডিবলি ও অন্যান্য স্থানে; গুজরাটে; গোদাবরী নদীর নিম্ন-অববাহিকায়; নর্মদা ও মহি নদীর উপত্যকায়;

মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে; বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে।

নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ তৈরি করা হত গভীর রঙের আগ্নেয় শিলাখণ্ড দিয়ে। তাছাড়া, সেগুলোকে ঘর্ষণ করে (polishing) মসৃণ করা হত। এইসকল আয়ুধের মধ্যে আছে—কুঠার, বাটালি, পাথরের লাঠি, মসৃণকারী পাথর (polishing stones), হাতুড়ির মাথা ইত্যাদি। নবোপলীয় যুগের সবচেয়ে প্রাচীন আয়ুধ ডক্টর এইচ. ডি. টেরা (Dr. H. De Terra) কাশ্মীরের বুরঝহোমে আবিষ্কার করেন। বারো ফুট মাটি খনন করে তিনি তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সন্ধান পান। সবচেয়ে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। তার তলার পর্যায় হচ্ছে হরপ্পা-উত্তর যুগের। আর সবচেয়ে নীচের স্তর হচ্ছে নবোপলীয় যুগের। পরে বুরঝহোমে পুনরায় খনন করে জানতে পারা গিয়েছে যে, ওখানকার নবোপলীয় যুগের লোকেরা গর্তের মধ্যে বাস করত এবং গর্তে নামবার জন্য সিঁড়ি ব্যবহার করত। তারা প্রস্তর-নির্মিত কুঠার, অস্থিনির্মিত আয়ুধসমূহ ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। নবোপলীয় যুগের আয়ুধ ও দ্রব্যসম্ভারসমূহ আরও যে-সব জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের হামির-পুর, আলাহাবাদ ও বান্দা জেলা, লখনউ জেলার নাগওয়া; মধ্য-ভারতের পাল্লা; মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার গারহি, মরিলা ও বুলুতরাই প্রভৃতি জায়গা; বিহারের হাজারিবাগ, পাটনা, সাঁওতাল পরগনা ও সিংভূম; পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দার্জিলিং ও নদীয়া জেলা; আসামের গারো ও নাগা পাহাড় এবং কাছাড় জেলা; অন্ধ্রপ্রদেশের রায়চুর ও ওয়ারাংগাল জেলা; মহীশূরের বাঙ্গালোর ও চিতলদুর্গ জেলা; তামিলনাড়ুর অনন্তপুর, বেলারি, চিংগলপেট, গুনটুর, উত্তর আর্কট, সালেম ও তাঞ্জোর জেলা। মনে হয়, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের নবোপলীয় যুগের লোকেরা পরে কিছু কিছু তামার ব্যবহারও শিখেছিল। উপরের বর্ণনা থেকে

পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় ও পরে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ হয় নদীর ধারে, আর তা নয়তো পাহাড়ের ওপরে বা পাহাড়ের ছাউনির মধ্যে মাটির ঘর তৈরি করে বাস করত। এসব জায়গায় কোন কোন স্থানে আয়ুধ-নির্মাণের কারখানাও পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সে-যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে যাযাবরের জীবন যাপন করত না। তার মানে, এ যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল। সেটা বুঝতে পারা যায় কয়েক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে তাদের চিত্রাঙ্কন থেকে। এ চিত্রগুলি তারা খুব সম্ভবত ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ধর্মেরও উন্মেষ ঘটছিল।

এই স্থায়ী বসতিস্থাপনের প্রবণতা নবোপলীয় যুগেই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। তারা পশুপালন ও কৃষির উপযোগী স্থানেই বসতিস্থাপন করত। কৃষির উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল, সেটা এখানে বলতে চাই। ভূমিকর্ষণের সূচনা করেছিল মেয়েরা। পশুশিকারে বেরিয়ে পুরুষের যখন ফিরতে দেরি হত, তখন মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনা-চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান-উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেইহেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে, পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (পরবর্তীকালে আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা 'ভূমি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি

কর্ষণ করতে থাকে। (**Przyluski** তাঁর **'Non-Aryan Loans in Indo-Aryan'** প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল'— এই তিনটি শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন)। মেয়েরা এইভাবে ভূমি কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। তারা লক্ষ্য করল লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active। Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্রথম 'নবান্ন' উৎসব হল, সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গপূজা ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। (অতুল সুর, 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য', পৃষ্ঠা ৮১ দ্রঃ)। লিঙ্গপূজার সূচনা যে নবোপলীয় যুগেই হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে আমার 'বিগিনিংস্ অভ্ লিঙ্গ কালট্ ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে (অ্যানালস্ অভ্ দি ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিট্যুট, ১৯২৯)।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে নবোপলীয় যুগের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তাদের বয়স আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয়নি। মাত্র ইদানীং কালে প্রাপ্ত যেগুলির রেডিয়ো-কারবন-১৪ পরীক্ষা হয়েছে, সেগুলির তারিখ নীচে দেওয়া হল। (সবই খ্রীস্টপূর্ব তারিখ)

১.	কাশ্মীরের বুরজহোম	২,৪১৮–১৫৯৩
২.	অন্ধ্রপ্রদেশের উটনুর	২১৭০–১৯২৫
৩.	কালিবঙ্গানের প্রাক্-হরপ্পীয়	২১৪৫–১৬০০
৪	মহীশূরের টেকলকোটা	২৬৭৫–১৪৪৫
৫.	মহীশূরের নরশিপুর তালুক	১৬৯৫–১৩৯৫
৬.	মহীশূরের সঙ্গমকল্লু	১৪৯০–১৩৫০
৭.	মহীশূরের হুল্লুর	১৬১০–
৮.	মাদ্রাজের পৈয়ামপল্লী	১৩৯০–

(মাত্র এই তারিখগুলি থেকে ভারতে নবোপলীয় কৃষ্টির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে।)

কাশ্মীরের বুরজহোমের নবোপলীয় যুগের লোকেরা মাটির তলায় গুহাগৃহে বাস করত। গুহার প্রবেশদ্বারের নিকট রন্ধনের জন্য উনুন তৈরি করত। বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের পালিশ-করা মৃৎ-পাত্র, হাড়ের তৈরি সুঁচাল সুঁচ যন্ত্র, ও হারপুন, পাথরের তৈরি কুঠার, পাথরের তৈরি গোল বালা ও মাংস কাটবার ছুরি ও অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে এখানে পাথরের তৈরি ছুরির ফলা ও জাঁতা-জাতীয় কোন পেষণ-যন্ত্র পাওয়া যায়নি। রেডিও-কার্বন-১৪ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এই কৃষ্টি খ্রীস্টপূর্ব ২৪১৮ অব্দ থেকে ১৫৯৩ অব্দ পর্যন্ত প্রাদুর্ভূত ছিল। অন্তিমদশায় ধনুকে ব্যবহারের জন্য তামার তৈরি একটিমাত্র বাণমুখ পাওয়া গিয়েছে। এরা মৃতব্যক্তিকে ডিম্বাকার গর্তের মধ্যে কবর দিত এবং মৃতের সঙ্গে কুকুরকেও সমাধিস্থ করত।

দক্ষিণভারতে অনেককাল আগেই ব্রুস্ ফুট (R. Bruce Foote) কর্ণাটক অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় নবোপলীয় যুগের বহু কুঠার পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পর স্যার মর্টিমার হুইলার (Sir Mortimer Wheeler) ব্রহ্মগিরিতে খনন শুরু করবার পর থেকে সমনকল্লু, পিকলিহাল, মাসকি, টেক্কলকোটা, হল্লুর, উটনুর ও কুপগলে নবোপলীয় যুগের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। উটনুর ও কুপগলে নবোপলীয় যুগের গরুর খাটালও পাওয়া গিয়েছে। এসকল স্থানে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে (উপরে দেখুন)। সবচেয়ে পুরানো যে তারিখ পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে খ্রীস্টপূর্ব ২১৭০ অব্দ অন্ধ্রপ্রদেশের উটনুরে।

দক্ষিণভারতের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টিসমূহকে তিনটি অবিচ্ছিন্ন অন্তর্দশায় বিভক্ত করা হয়। যারা সর্বপ্রথম বসতিস্থাপন করেছিল তারা গরু, ভেড়া ও ছাগল (তুলনা করুন বাংলা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত লহনা-ফুল্লরার কাহিনী) পালন করত। তাদের বৈষয়িক সম্পদের মধ্যে

ছিল পাথরের তৈরি মসৃণ কুঠার ও ছুরির ফলা, ধূসর বা বাদামী রঙের হাতে-গড়া মৃৎপাত্র ইত্যাদি। তাদের তৈরি মৃৎপাত্রের সঙ্গে আমরি ও কালিবঙ্গানের প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এদের বসতি ছিল পাহাড়ের ওপর বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী মালভূমিতে এবং খাটালগুলি নিকটস্থ বনে অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের গায়ে তারা চিত্রাঙ্কন করত ও পোড়ামাটির ককুদ-বিশিষ্ট বলীবর্দ প্রভৃতির মূর্তি তৈরি করত। তাদের মধ্যে জাঁতার ব্যবহার ছিল; সুতরাং তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তারা শস্য উৎপাদন করত। ধাতুর ব্যবহার তাদের মধ্যে মোটেই ছিল না।

দ্বিতীয় অন্তর্দশায় এই কৃষ্টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এযুগে তারা ছ্যাঁচাবেড়ার মাটির ঘর তৈরি করত। মাটির ঘরগুলি চক্রাকারে নির্মিত হত! এ যুগে প্রস্তরনির্মিত শিল্পের বহুমুখী বিকাশ ঘটে। এদের তৈরি মৃৎপাত্রসমূহের সঙ্গে তামা ও ব্রোঞ্জে নির্মিত কয়েকটা টুকরা বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। রেডিয়ো-কারবন-১৪ পরীক্ষায় এ যুগের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ১৮০০ থেকে ১৫০০ অব্দ।

তৃতীয় যুগে প্রস্তরনির্মিত কুঠার ও ছুরির ফলাশিল্পের অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত বস্তু বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তামার বঁড়শিও পাওয়া গিয়েছে, এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মৎস্যভোজী ছিল। এ যুগে মৃৎপাত্রগুলি চক্রে নির্মিত হত এবং সেগুলি আগেকার যুগের মৃৎপাত্রের চেয়েও কঠিন করা হত। তবে মহীশূরের হল্লুরের লোকেরা ঘোড়া (?) ব্যবহার করত। এসব বস্তুর রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা বিশেষভাবে করা হয়নি। তবে মহারাষ্ট্রের জোরওয়ের কৃষ্টির ভিত্তিতে এর বয়স নিরূপিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ থেকে ১০৫০ অব্দ পর্যন্ত।

নবোপলীয় যুগের প্রাদুর্ভাব পূর্বভারতেও ছিল। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহল মনে

করতেন যে মধ্য-প্রাচীর জারমো, জেরিকো ও কাটাল হুয়ুক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ ইরানীয় অধিত্যকা ও মধ্য-এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, এরও আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড্ শিলার। সি. ও. সয়ারও তাঁর 'এগ্রিকালচারেল অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ডিসপারসেল' গ্রন্থে বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ কারলটন এস. কুন তাঁর 'দি হিস্ট্রি অভ্ ম্যান' বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠায় 'নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ'-এর যে মানচিত্র দিয়েছেন, তাতেও তিনি নবোপলীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব-ভারতে এক স্বতন্ত্র উৎপত্তি-কেন্দ্র দেখিয়েছেন। কারলো চিপোলোও (Carlo Cipollo) তাঁর 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অভ্ ওয়ার্লড পপুলেশন' গ্রন্থে নানা তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে 'বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই স্বাধীনভাবে ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনের সূচনা হয়েছিল'। তবে পূর্বভারতে নবোপলীয় যুগের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা উৎখননের ফলে পাওয়া যায়নি। সবই মাটির ওপর থেকে বা নদীর স্তরের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশই হচ্ছে নবোপলীয় যুগের রীতি অনুসারে নির্মিত পাথরের মসৃণ কুঠার। আসামের নানা স্থানে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় মিরজাপুর ও বান্দা জেলায়, বিহারের সাঁওতাল পরগনায়, ওড়িষার ময়ূরভঞ্জে, ও বাঙলার বন-অসুরিয়া, কচিণ্ডা, জয়পাণ্ডা উপত্যকা, অরগণ্ডা, কুকরাধুপি, তমলুক, শুশুনিয়া, তামাজুরি, চাতলা, আগাইবানি, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থান থেকেও এরূপ কুঠার পাওয়া গিয়েছে।

নবোপলীয় যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ পশুপালন

করতে শুরু করে। এ যুগের ধর্মীয় আচার সম্বন্ধে আমাদের খুব বেশি কিছু জানা নেই। তবে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষের মত তারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত ও মৃতব্যক্তির সমাধির ওপর একখানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত পাথর আমরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় লক্ষ্য করি। সেগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়।

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তরফলক আমরা পশ্চিমবঙ্গের যে-সব জায়গায় পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। বাঁকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনায় এক পুকুরের কাছে এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত স্মৃতিফলক আমরা দেখতে পাই। এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গায়ে অপরিণত শৈলীর ক্ষোদিত মূর্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যে-সকল সাহসী বীর সৈনিক যুদ্ধে নিহত হতেন, এগুলি তাদেরই সমাধির ওপর প্রোথিত। মেদিনীপুরের কিয়ারাচাঁদ গ্রামেও এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত বহু প্রস্তরফলক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে—'Rounded at the top, they seemed to have been deliberately chiselled and stand on the open field as rigid and uncommunicative sentinels which they certainly are, continuing to baffle historians as to how they originated.'

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তরফলক বাঁকুড়া জেলার ছাতনার দু-মাইল দূরে মৌলবনায় ও হুগলি জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে। হুগলি জেলাতে এগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়। মনে হয়, এগুলি অনু-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির অবদান। কেননা, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও আমরা এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তরফলক দেখি। নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসী কুড়ুম্বা উপজাতির লোকেরা

এরূপ প্রস্তরফলককে 'বীরকল্লু' নামে অভিহিত করে ও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কুড়ুম্বা ও ইরুলা উপজাতিদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'বীরপুরুষের স্মৃতিফলক'। এককথায়, এগুলি হচ্ছে সমাধির ওপর স্মৃতিফলক। সমাধির ওপর এরূপ স্মৃতিফলক ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা জাতির গ্রামেও ডালটন (**Dalton**) দেখেছিলেন। নীলগিরি পাহাড়ের কুড়ুম্বাদের মত ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডারাও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ছোটনাগপুরের খেরিয়া উপজাতির মধ্যে প্রচলিত এরূপ স্মৃতিফলক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'Besides thc grave-stones, monumental stones are set up outside the village to the memory of men of note. The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made ιo them'.

মনে হয়, বাঙলাদেশে মানুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইরে যে 'বৃষকাষ্ঠ' স্থাপন করা হয়, সেগুলি এরূপ প্রস্তরফলকেরই কাষ্ঠনির্মিত উত্তর-সংস্করণ। (**A. K. Sur, 'History & Culture of Bengal' (1963), pages 20-21,** 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন', পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮ দ্রঃ)।

বস্তুত নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি ; যথা—ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া ও শস্য পেষাইয়ের জন্য জাঁতা ইত্যাদি। তা ছাড়া, বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও সেই প্রথা ছিল) আমরা আমাদের গৃহস্থালিতে পাথরের থালা, গেলাস, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। এগুলি সবই নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী, যদিও লৌহনির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হত।

প্রত্নোপলীয় যুগের যে-সব আয়ুধ ভারতে পাওয়া গিয়েছে তার

একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলির সঙ্গে একদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অপরদিকে জাভায় প্রাপ্ত আয়ুধসমূহের অসাধারণ মিল আছে। এছাড়া, ভারতে যে flake tools শিল্প গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে চীন ও ব্রহ্মদেশের flake tools শিল্পেরও সাদৃশ্য আছে। নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা চলে। তবে নবোপলীয় যুগে পূর্ব-ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। ('দি গেজেটিয়ার অভ্ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন', প্রথম খণ্ড দ্রঃ)। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ভারতের প্রস্তর যুগের কৃষ্টি যে মাত্র দেশজ ছিল, তা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার বিস্তারলাভ ঘটেছিল। তা ছাড়া, ভারতের যে-সব জায়গায় খননকার্য চালানো হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই নবোপলীয় যুগের পরেই তাম্রাশ্ম যুগের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ, নেভাসা, সোনাগাওন প্রভৃতি ও বাঙলাদেশের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষদল প্রভৃতি। সুতরাং ভারতে তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতা যে দেশজ সভ্যতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের তাম্রাশ্ম সভ্যতাকে আমরা 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'হরপ্পা সভ্যতা' নামে অভিহিত করি। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে এক ঢিবি উৎখনন করে ভারতের এই লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কার করেন। এই সভ্যতার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে। ওই বৎসর ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা অধিকরণের সর্বময় কর্তা স্যার জন মারশাল আমাকে নিয়োগ করেন 'হিন্দু সভ্যতার গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান' সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য। ওই গবেষণার কাজ দু'পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে মহেঞ্জোদারোয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতায়। প্রথম পর্যায়ে আমি যখন মহেঞ্জোদারোতে সরেজমিনে গবেষণা চালাচ্ছি, তখন এক বাঙালী-বিদ্বেষী অফিসারের

হাতে নিপীড়িত হবার ভয়ে আমাকে কলকাতাতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সে-কথাটা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে যায়, তখন তাঁরা আমাকে বৈতনিক গবেষক নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওই অনুশীলন চালিয়ে যেতে বলেন। দু'বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে আমি এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে বারো-আনা ভাগ আছে সিন্ধু উপত্যকার প্রাক্-আর্য সভ্যতা; আর মাত্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত আর্য সভ্যতার আবরণে। আমার গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ আমি স্যার জন মারশালের কাছে পাঠাতাম, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিশদ প্রতিবেদন পেশ করতাম। আমার সতীর্থ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমার গবেষণা-সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিছু অংশ 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেনসে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে (পৃষ্ঠা ১০) বলেন—'হিন্দু সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।'

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা আমাদের ঐতিহাসিকরা বুঝলেন না। গতানুগতিকভাবে ভারতের ইতিহাস রচনা করে যেতে

লাগলেন, মাত্র বৈদিক যুগের আগে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে দিয়ে।

আমি যখন মহেঞ্জোদারোয় যাই, তখন নগরীর যে অঞ্চলে খননকার্য চলছিল, তার নামকরণ করা হয়েছিল : DK Area—Intermediate III period। মহেঞ্জোদারোর প্রশস্ত রাজপথ ও সমান্তরাল রাস্তাগুলি তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী। রাজপথটি তখন মাত্র এক কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা হয়েছিল। এই পথটি ৩১ থেকে ৩৬ ফুট প্রশস্ত, আর সমান্তরাল পথগুলি ২০ থেকে ২৫ ফুট। সে বৎসর আরও আবিষ্কৃত হয়েছিল নগরীর পয়ঃ-প্রণালী। পোড়া ইট দিয়ে তৈরি এই পয়ঃপ্রণালী অনেকটা পথ রাস্তার পশ্চিম ধার দিয়ে এসে, একজায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূর্বপাশ ধরে চলে গিয়েছিল। বাড়ির দূষিত জল এই পয়ঃ-প্রণালীতে এসে পড়ত, তবে অনেক বাড়িতে 'সোক্‌পিট'ও ছিল। প্রতি বাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ। প্রবেশ-পথের নিকট প্রাঙ্গণের একপাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আবরু রক্ষার জন্য কূপগুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকান-ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধ হয় পাটাতনগুলির ওপর বিক্রেতারা দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত, এবং রাত্রিকালে সেগুলিকে দোকান-ঘরে তুলে রাখত। ছোট ছোট যে-সব দ্রব্যসামগ্রী আমরা সে-বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তারা যে বেণী ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।

ব্যাপকভাবে খননকার্যের ফলে এখন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছাড়া তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র খুঁজে বের করা

হয়েছে। এর ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে এই সভ্যতার বিকাশ পনেরো লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশ-বিভাগের পর এইসকল কেন্দ্রের কিছু পাকিস্তানে ও কিছু ভারতের মধ্যে পড়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যে-সব কেন্দ্র ভারতের মধ্যে পড়েছে সেগুলি হচ্ছে—কালিবঙ্গান, লোথাল, রূপার, চণ্ডীগড়, সুরকোটড়া, দেশলপুর, নবিনাল, রঙপুর, ভগৎরাও, মাণ্ড, বরা, বরগাওন, বাহাদারাবাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপুর, কায়াথা, গিলাণ্ড, টড়িও, দ্বারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, রোজড়ি, আমরাফলা, জেকডা, সুজনপুর, কানাসুতারিয়া, মেহগাওন, কাপড়খেদা ও সবলদা। এ ছাড়া তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি—লালকিলা, নোয়া, মানাটি, দৈমাবাদ, মহিষদল, বাণেশ্বরডাঙ্গা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থান থেকেও। ১৯২৯-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলন করছিলাম, তখন আমার প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলেছিলাম—'এ সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন গঙ্গা উপত্যকাতেও পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এ-সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও বিস্তারলাভ করেছিল।' আজ খননকার্যের ফলে আমার সে অনুমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতার ন্যায় আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। এ সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ভারতেই ঘটেছিল। মূলগতভাবে সিন্ধু সভ্যতা ছিল তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতা (chalcolithic civilization)। তার মানে, প্রস্তর যুগের শেষে এই সভ্যতার ধারকদের মধ্যে তামার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রস্তর যুগ পর্যন্ত স্তরবিন্যাস আমরা হরপ্পায় পাই। প্রস্তর যুগের যে স্তর থেকে তাম্রাশ্ম যুগের উদ্ভব

হয়েছিল, তাকে আমরা নবোপলীয় যুগের (neolithic) সভ্যতা বলি। এই নবোপলীয় যুগের মানুষই প্রথম ভূমিকর্ষণ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের মানুষরা পশুপালন করত, মৃৎপাত্র তৈরি করত, বস্ত্রবয়ন করত ও নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে-সকল আয়ুধ বা যন্ত্রাদি ব্যবহার করত, সেগুলিকে বেশ মসৃণ বা 'পালিশ' করত। বস্তুত নবোপলীয় যুগেই প্রথম সভ্যতার সূচনা হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পাবে, হরপ্পা সভ্যতা যদি প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের নবোপলীয় সভ্যতারই স্বাভাবিক পরিণতি হয়, তাহলে নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল কোথায়? আমি আগেই বলেছি যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে এ-সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ছিল। প্যালেস্টাইনের 'ডেড সী' উপত্যকায় জেরিকো নামক স্থানে একটি প্রাচীন নবোপলীয় গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছিল। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয় খ্রীস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ। সেখানে নবোপলীয় ও প্রত্নোপলীয় যুগদ্বয়ের সন্ধিক্ষণের (mesolithic) দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই সন্ধি-যুগের বয়স প্রায় ৮০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা হত যে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম সহস্রকে জেরিকোতেই নবোপলীয় যুগের সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। ইরাকের জারমো ও ইরানের টোপ সবাব নামক স্থানদ্বয় থেকেও খ্রীস্টপূর্ব ৭০০০ থেকে ৬৫০০ অব্দের মধ্যেকার দু'টি নবোপলীয় যুগের গ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তি থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি নিকট-প্রাচীতেই উদ্ভূত হয়ে জগতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের খনন এবং রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মধ্য-প্রাচীর নবোপলীয় কৃষ্টির সমসাময়িক কালেই বা তার কিছু আগে নবোপলীয় গ্রাম থাইল্যাণ্ডেও ছিল। আরও জানতে পারা গিয়েছে যে, নিকট-প্রাচীর নবোপলীয় মানুষদের আগেই

জাপানের আদিম অধিবাসীরা মৃৎপাত্র তৈরি করতে জানত। এখন এটা একরকম প্রায় স্বীকৃতই হয়ে গিয়েছে যে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি জগতের একাধিক স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল। ভারতে আমরা প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় এই উভয় যুগের বহু কৃষ্টি-কেন্দ্র আবিষ্কার করেছি। সুতরাং ভারতের তাম্রাশ্ম যুগের কৃষ্টি যে দেশজ নবোপলীয় ও প্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টি থেকে উদ্ভূত, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার 'প্রি-হিস্ট্রি অ্যাণ্ড বিগিনিংস অভ্ সিভিলিজেশন' পুস্তকে বলেছিলাম—'মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যত্র যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, খুব সম্ভবত সে-সভ্যতার আদি জন্মস্থান পূর্বভারতে, এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূর-দেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল।' কেননা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় ঘটেছিল যেখানে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেত। ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাম্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন বাঙলার প্রধান বন্দরের নাম 'তাম্রলিপ্ত', আমার সেই মতবাদকেই সমর্থন করে।

যেহেতু তাম্রাশ্ম সভ্যতাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সেহেতু এটা মনে করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গই সভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাম্রাশ্ম যুগের পূর্বে যে-সব কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল, যথা নবোপলীয়, মধ্য-পলীয়, প্রত্নোপলীয় ইত্যাদি, এগুলির অস্তিত্ব আমরা পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে, যেমন—বীরভূমের মালাতি, পিতনউ, সুবর্ণরেখার অববাহিকা, কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী নদীর উপত্যকা, ঝাড়গ্রামে ডুলুর নদীর ধারে, বনকাটি প্রভৃতি স্থানে পেয়েছি।

তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ওই সভ্যতার ধারকদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে খাদ্য-উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতার

ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগেকার যুগের মানুষের মত তাদের শিকার, ফলমূল ও মৎস্য আহরণের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করতে হত না। অবশ্য, নবোপলীয় যুগের অভ্যুত্থানের পর থেকেই এই অনিশ্চয়তা অনেকটা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু তাম্রাশ্ম যুগে এই অনিশ্চয়তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছিল। এ যুগের লোকেরা নগর-নির্মাণ করতে জানত এবং নগরেই বাস করত। এ যুগের নগরগুলি (যেমন হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি) গ্রামীণ কৃষিজাত ফসলসমূহ গোলাজাত করত এবং গোলাজাত শস্য নগরবাসীদিগকে খাদ্য-উৎপাদনের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত করাতে সক্ষম হত।

সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার যে-সকল লক্ষণ, তার সবই আমরা সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহে লক্ষ্য করি। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল বলেন যে চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি। নগরগুলির রাস্তাঘাট বেশ সুপরিকল্পিত ছিল। ঘরবাড়ি দগ্ধ-অদগ্ধ ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত হত। নগরের মধ্যে ছিল সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার-বিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, দেবালয় ও সমাধিস্থান। এককথায়, সংবদ্ধভাবে নাগরিক জীবন যাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসনব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহসামগ্রী নির্মাণে তামা ও ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহণের জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার রূপদানের জন্য লিখন-প্রণালীরও ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার মানে, সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। নগরগুলির নির্মাণরীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে, বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কিত কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ

অনুযায়ীই নগরগুলি নির্মিত হত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের যে পাটী-গণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষরকম জ্ঞান ছিল তার বহুল নিদর্শন আমরা পেয়েছি। ধাতুবিদ্যাতেও তাদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল (অতুল সুর, 'সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান' দ্রঃ)।

অনেকেই বলেন যে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক আর্য সভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু এটা যে ভ্রান্ত মত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুই সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই এটা বুঝতে পারা যাবে। দুই সভ্যতার মূলগত পার্থক্যগুলি নীচে দেওয়া হল :

১. সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন-উপাসক ছিল ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না ও শিশ্ন-উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। আর্যরা পুরুষ-দেবতার উপাসক ছিল। মাতৃকা-দেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা ঋগ্বেদে পাই না।

২. আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল। ঘোড়াই ছিল তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু। এখানে বলা দরকার যে, ঘোড়ার কোন অশ্মীভূত (fossilized) অস্থি আমরা সিন্ধু সভ্যতার কোনও কেন্দ্রে পাইনি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল। এটা সীলমোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রতিকৃতি ক্ষোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব আরাধনার প্রমাণও মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেরই বাহন। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়।

৩. সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সেজন্য তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম পুরন্দর রেখেছিল।

৪. আর্যরা মৃতব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত।

৫. আর্যদের মধ্যে লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন-প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।

৬. সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু-পাঞ্চাল দেশ অর্থাৎ যেখানে আর্য সভ্যতা বিস্তার-লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে যে-সব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে সে-গুলির রঙ 'কালো-লাল'।

৭. সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষিকার্য জানত না। এটা আমরা শতপথব্রাহ্মণের এক উক্তি থেকে জানতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' দ্রষ্টব্য)

৮. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নূতন জীববিশেষ ছিল। সেজন্য তারা হাতিকে 'হস্তবিশিষ্ট মৃগ' বলে অভিহিত করত। বস্তুত হাতিকে প্রাচ্য ভারতের পালকাপ্য নামে এক মুনিই প্রথম পোষ মানিয়েছিলেন।

এসব প্রমাণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আর্য সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতা এক নয়।

গোড়ার দিকে আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই গোড়ার দিকের বৈরিতা পরবর্তীকালে আর স্থায়ী হয়নি। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হল, ততই তারা এদেশের লোকের সংস্পর্শে এল। তারা এদেশের মেয়েদেরও বিয়ে করল। যখন অনার্য রমণী গৃহিণী হল, তখন আর্যদের ধর্মকর্মের ওপর তার প্রতিঘাত পড়ল। ক্রমশ তারা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাগণকে পশ্চাদ্‌ভূমিতে অপসারণ করল। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হল।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে

আমরা 'কুরু-পাঞ্চাল' দেশ বলতাম যা গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চল। সেখানে আর্যদের আপস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতালাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতিগান করে না; বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে না। নূতন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল। বেদ সংকলন ও মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি রচনার ভার ন্যস্ত হল এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর!

তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামা-ই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর, সুমের, সিন্ধু উপত্যকা সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে-সেখানে অবশ্য তামা সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলাদেশে। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দরের নাম ছিল 'তাম্রলিপ্তি'। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি থেকে।

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগাইবানিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছি তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ-আকারের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট আকারের আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খান-কতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারি। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে, এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানবগোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামে তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে ওই ধরনের আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্য-প্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়েও পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল আগাইবানির ধরনের ৪৭টি তামার বালা ও পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (**migration**) পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে ঘটেছিল।

বাঙলায় তাম্রাশ্ম সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের লোকরাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার ধারক ছিল। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কুলালের কাজও

জানত। পূর্ব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

এ-সব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সুদূর অতীতে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্ধমান-মেদিনীপুর অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধিশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাই। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বাঙলায় প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমত খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বাঙলাদেশেই ঘটেছিল এবং বাঙলাদেশই সভ্যতার জন্মভূমি ছিল।

বাঙলাই যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার জন্মভূমি, তার সপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয়। আজও বাঙালী তাম্রাশ্ম যুগের অনেক কিছু দ্রব্য ব্যবহার করে। প্রথমে, রক্ষণশীল পরিবারের ঠাকুরঘরের কথা ধরা যাক। এ-সব পরিবারের পরিবেশ আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। যুগ যুগ ধরে এ-সব পরিবারের ঠাকুরঘরের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ-সব পরিবারের ঠাকুরঘরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ঠাকুরঘরের সব বাসন-কোসন পাথর ও তামা দিয়ে তৈরি; যথা,—পাথরের থালা-বাটি-গেলাস, তামার কোষাকুষি ইত্যাদি। এগুলো বাঙ্গালী তাম্রাশ্ম যুগ থেকে একনাগাড়ে ব্যবহার করে আসছে। কেননা তামার কোষাকুষি আমরা মহিষদল থেকেও পেয়েছি। মহিষদলের যে স্তর থেকে আমরা ওই কোষাকুষি পেয়েছি, তা তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার।

আগেই বলেছি যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (migration) পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল। সম্প্রতি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগরী পয়সেলও বলেছেন যে ভারতের তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুত্থানের মূলে ছিল তামার ব্যবহার। বাঙালীরাই সেই তামা তাম্রাশ্ম সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে নিয়ে যেত।

বাঙালীরা যে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাঁচটি সূত্র থেকে পাই—(১) মাতৃদেবীর উপাসনা, (২) মৎস্য-ভক্ষণ, (৩) হস্তীর সহিত পরিচয়, (৪) ধান্যের ব্যবহার এবং (৫) শিব ও শিবলিঙ্গের আরাধনা।

মৎস্যভক্ষণ বাঙালীরই বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদারোতে যে বঁড়শি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী ছিল যারা মৎস্য ভক্ষণ করত। মহেঞ্জোদারোতে আমরা হস্তীর প্রতিকৃতি পেয়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী হস্তী প্রাচ্যভারতের পালকাপ্য মুনি কর্তৃক পালিত জন্তু। তিনিই প্রথম হস্তীকে বশ করেন ও হস্তীবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙলাদেশই হাতির আদিম নিবাস। মহেঞ্জোদারোতে হাতির উপস্থিতি বাঙলাদেশের সঙ্গে ওই সভ্যতার সম্পর্ক সূচিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহেঞ্জোদারোর 'সীল'সমূহে উৎকীর্ণ হাতির প্রতিকৃতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার উৎকীর্ণ পাঞ্চ-মার্ক মুদ্রায় প্রদর্শিত হাতির বিশেষ মিল আছে।

বাঙলার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার ঘনিষ্ঠতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে লোথালে ধান্যের ব্যবহার। চাউল বাঙালীর প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। ধান্যের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোন স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে কোন দ্বিমত নেই। কারলো চিপোলো তাঁর 'দি ইকনমিক হিস্টরি অভ্ ওয়ার্লড পপুলেশন' গ্রন্থে এই মতই প্রকাশ করেছেন এবং বাঙলাদেশকে নির্দেশ করেছেন।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে মাতৃদেবীর পূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। বাঙলাই মাতৃদেবীর পূজার লীলাকেন্দ্র। আগেই বলেছি যে, মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব নবোপলীয় যুগে কৃষির সূচনার সঙ্গে ঘটেছিল। বাঙলায় নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ধান্যের চাষ নিয়ে। মনে হয়, ধান্যের

চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার অপর নাম খন্দপূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফসলাদি। লক্ষ্মীপূজা যে অতি প্রাচীন-কাল থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে, তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকেই প্রকাশ পায়। সূচনায় মাতৃদেবীর পূজা যে ফসলাদির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল তা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রে (হরপ্পায়) প্রাপ্ত এক সীলের ওপর খোদিত নারীমূর্তি থেকে প্রকাশ পায়। এই নারীমূর্তির যোনি-মুখ থেকে নির্গত হয়েছে পল্লবিত ছোট চারা-গাছ, লতা-পাতা, গুল্ম ইত্যাদি। ষাট বৎসর পূর্বে আমি আমার 'প্রি-আরিয়ান এলিমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে বলেছিলাম যে মাতৃদেবী আদিতে যে শস্যাদির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তা তাঁর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী ইত্যাদি অভিধা থেকেই প্রকাশ পায়। অবশ্য অন্নপূর্ণা নামটি সংস্কৃত। কিন্তু আদিতে এই শব্দটির কী রূপ ছিল, তা আমরা জানি না। তবে প্রাচীন সুমেরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'এ-নান্না' নামের সঙ্গে এর যথেষ্ট নৈকট্য আছে। (তুলনা করুন হিংলাজের অধিষ্ঠাত্রী 'নানা' দেবী)।

মাত্র নামের সাদৃশ্য নয়। সুমের ও ভারতের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই উভয় দেশের মাতৃদেবীর মূলগত সাদৃশ্য হচ্ছে—(১) উভয়দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ভর্তা ছিল। বোধ হয়, মহাষ্টমীর দিন বাঙলাদেশে 'কুমারী' পূজা তারই স্মারক। (২) উভয়দেশেই মাতৃ-দেবীর বাহন 'সিংহ' ও তাঁর ভর্তার বাহন 'বলীবর্দ'। (৩) উভয়-দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম, যথা যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। (৪) প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার লিপিসমূহে তাঁকে বারম্বার 'সৈন্যবাহিনীর নেত্রী' বলা হয়েছে। আমাদের দেশের 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর 'দেবীমাহাত্ম্য' বিভাগেও বলা হয়েছে যে দেবতারা

যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। (৫) মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেজন্য তাঁকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত। ভারতে মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে। (৬) সুমেরে মাতৃদেবীর নাম ছিল 'এ-নান্না'; সে নাম হিংলাজে 'নানা'দেবীর নামে এখনও বর্তমান। (৭) সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন 'কৌনক' তালপাতা দিয়ে তৈরী করা হত; প্রাচীন ভারতে দেশজ লোকদের পাতা ও 'বল্কল' পরিধান ও পর্ণশবরীর (দেবীর এক নাম) নাম আমাদের তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (৮) দু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এসিয়ায় এটার উদ্ভব হয়েছিল ঐন্দ্রজালিক (mimetic or homoeopathic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয়শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা-লাভের জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য। সব তন্ত্রেই বলা হয়েছে মৈথুন ছাড়া কুলপূজা (তন্ত্র অনুযায়ী দেবীর পূজা) হয় না। যেমন, 'গুপ্তসংহিতা'য় বলা হয়েছে, 'কুলশক্তিম বিনা দেবী যো যপেত স তু পামর'। আবার 'নিরুত্তরতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে 'বিবাহিতা পতিত্যাগে দুষণম্ ন কুলার্চনে'। তার মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার পতি ত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না। (৯) উভয়দেশেই দেবীপূজার সঙ্গে নরবলি প্রচলিত ছিল। (কালিকাপুরাণ, ৭ অধ্যায়)।

লক্ষ্মীর কথা আগেই বলেছি। লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। 'শ্রী' প্রাচীন ভারতের এক লোকায়ত দেবী ছিলেন। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ আমরা তাঁর প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাঁকে প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে। এবং খুব অর্থবহভাবে তাঁর নৈবেদ্য শয্যার মাথার দিকে রাখার কথা বলা হয়েছে। বৈদিকযুগের একেবারে অন্তিমকালের

পূর্ব পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁরসম্পর্কের উল্লেখ নেই। 'সিরি কাল-কন্নিজাতক' অনুযায়ী 'সিরিদেবী' হচ্ছেন চারজন লোকপালের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। সেখানে 'সিরিদেবী'কে আমরা বলতে শুনি : 'মানবজাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি ; আমি জ্ঞান, সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবী।' মহাভারত অনুযায়ী 'শ্রী' দেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন, পরে দেবগণের ও ইন্দ্রের সঙ্গে। মনে হয় এর মধ্যেই ইঙ্গিত আছে তিনি গোড়ায় প্রাগার্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ্যদেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন।

সিন্ধু-সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরের কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরের লোকেরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সে জায়গাটা কোথায়? সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের পূর্বেই নিকট-প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল (Hall) বলেছিলেন যে সুমেরের লোকেরা ভারত থেকে গিয়েছিল। বহু পূর্বে আমিও দেখিয়েছিলাম যে এসম্বন্ধে 'যোগিনীতন্ত্র'-এ উল্লিখিত 'সৌমার' দেশের সঙ্গে 'সুমের'-এর এক শব্দগত সাদৃশ্য আছে। 'যোগিনীতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে : 'পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগচল/অষ্টকোণম্ চ সৌমারম্ যত্র দিক্করবাসিনী।' তার মানে দিক্করবাসিনীর আবাসস্থল 'সৌমার' নামে অষ্টকোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখা হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণনদী (শোনকুশী), পশ্চিমে করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দপর্বতসমূহ (মুণ্ডাজাতি-অধ্যুষিত পর্বতমালা) ও উত্তরে বিহগচল (হিমালয়)। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে 'সৌমার' দেশ প্রাচ্যভারতে অবস্থিত ছিল। সুমেরের লোকেরা যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল এবং তাদের নূতন উপনিবেশের নাম আগন্তুকদের দেশের নাম অনুযায়ী করেছিল (এরূপ নামকরণ পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে) ও মাতৃপূজার কল্পনার সাদৃশ্য থেকে তাই মনে হয়। (ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ১৯৩৪, পৃষ্ঠা ১৪—২৪,

পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সিন্ধু উপত্যকার প্রাগার্য অধিবাসিগণ যে মাত্র মাতৃদেবীর পূজা করতেন, তা নয়। সুমের ও মধ্য-প্রাচীর প্রাচীন অধিবাসীদের ও বর্তমানকালের ভারতীয় হিন্দুদের মত তাঁরা সৃজন-শক্তির আধার হিসাবে এক পুরুষ দেবতারও উপাসনা করতেন। মহেঞ্জোদারো থেকে যে তিন-মুখবিশিষ্ট এক দেবতার উৎকীর্ণ মূর্তি এক সীলের ওপর পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে। এই দেবতা সিংহাসনের উপর আসীন। তাঁর বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, তাঁর দুটি হাত বিস্তৃতভাবে হাঁটুর উপর স্থাপিত। তিনি পর্যঙ্ক-আসনে উপবিষ্ট হয়ে, ধ্যানস্থ ও ঊর্ধ্বলিঙ্গ। তাঁর উভয়পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। তাঁর সিংহাসনের নীচে দুটি মৃগকে পশ্চাদ্দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই যে আমাদের আদি-শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত পরবর্তীকালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা, আমরা এখানে দেখতে পাই—তিনি (১) যোগীশ্বর বা মহাযোগী, (২) পশুপতি, ও (৩) ত্রিমুখ। আমি আমার 'প্রি-আরিয়ান এলিমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান কালচার' গ্রন্থে দেখিয়েছি যে, বৈদিক রুদ্রদেবতা যে এই আদিশিবের প্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয় ; লিঙ্গ ও যোনি হিসাবেও পূজিত হন। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরা যে লিঙ্গ-যোনি উপাসক ছিলেন তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রতীকসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এছাড়া, আমরা সেখানে প্রস্তরনির্মিত পুরুষলিঙ্গের এক বাস্তবানুগ প্রতিরূপ পেয়েছি। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরাই যে ঋগ্বেদে বর্ণিত সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহের

আর্য-বৈরী 'শিশ্নোপাসক' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে 'অ্যানালস্ অভ্ দি ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিট্যুট' পত্রিকায় লিখিত 'বিগিনিংস অভ্ লিঙ্গ কালট ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে লিঙ্গ-উপাসনা ভারতে তাম্রাশ্ম যুগের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুত ভারতের অধিবাসিগণের ঐন্দ্রজালিক ধ্যানধারণায় এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। মাদ্রাজ মিউজিয়ামের 'ফুট কালেকশন'-এ নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের একটি সুন্দর প্রতিরূপ আছে। এটা মাদ্রাজের সালেম জেলার শিবারয় পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল। এটা খুবই বাস্তবানুগ ও 'নীস' (gneiss) পাথরের তৈরি। সালেম জেলার শিবারয় পাহাড়ই একমাত্র স্থান নয়, যেখান থেকে নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে। বরোদার নানা জায়গা থেকেও নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি যে সবই সৃজন-শক্তি-উৎপাদক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি যে প্রৎসিলুসকি (Przyluski) দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' শব্দদ্বয় অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দ, এবং ব্যুৎপত্তির দিক থেকে উভয় শব্দের অর্থ একই। তিনি বলেছেন যে পুরুষাঙ্গের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'লিঙ্গ' শব্দটি অস্ট্রো-এসিয়াটিক জগতের সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু প্রতীচ্যের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরও বলেছেন যে সংস্কৃত ভাষায় যখন শব্দ দুটি প্রবিষ্ট হল, তখন একই ধাতুরূপ ('লনগ্') থেকে লাঙ্গুল, লাঙ্গল ও লিঙ্গ শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল। অনেক সূত্রগ্রন্থ ও মহাভারত-এ 'লাঙ্গুল' শব্দের মানে লিঙ্গ বা কোন প্রাণীর লেজ। যদি 'লাঙ্গল = লাঙ্গুল', এই সমীকরণ স্বীকৃত হয়, তা হলে এই তিনটি শব্দের (লাঙ্গল, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ) অর্থ-বিবর্তন (semantic evolution) বোঝা কঠিন হয় না। কেননা, সৃষ্টি প্রকল্পে লিঙ্গের ব্যবহার ও শস্য-উৎপাদনে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধ্যে একটা

স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রিকভাষাভাষী অনেক জাতির লোক ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে লিঙ্গ-সদৃশ খনন-যষ্টি ব্যবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিউবার্ট ও. ময়েস বলেছেন যে মেলেনেসিয়া ও পলিনেসিয়ার অনেক জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খননযষ্টি লিঙ্গাকারেই নির্মিত হয়। মনে হয়, ভারতের আদিম অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগে বা তার কিছু পূর্বে এইরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তারা লাঙ্গল উদ্ভাবন করল, তখন তারা একই শব্দের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল।

আগেই আমরা বলেছি যে লিঙ্গের যেসব প্রতিরূপ পেয়েছি, তা দাক্ষিণাত্য থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার যে একপ্রকার লিঙ্গ-উপাসনা, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সূত্রসংহিতায় বলা হয়েছে যে দৈত্যরাজ বাণ মহাদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে, তাঁর অর্চনা করতেন। শতবর্ষ এইরূপ পূজা করবার পর মহাদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়ে তাঁকে এক বর দিয়ে বলেন—'আমি তোমাকে চৌদ্দ কোটি বিশেষ গুণ-সম্পন্ন লিঙ্গ দিতেছি। এইসকল লিঙ্গ নর্মদা ও অন্যান্য পুণ্যসলিলা নদীতে পাওয়া যাবে। ভক্তগণকে এইসকল লিঙ্গ মোক্ষদান করবে।' হিমাদ্রি যাজ্ঞবল্ক্যকে উদ্ধৃত করে তাঁর 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' গ্রন্থে বলেছেন : 'এই-সকল লিঙ্গ অনন্তকাল ধরে অবিরাম নর্মদা নদীর স্রোতে আবর্তিত হবে। প্রাচীনকালে নৃপতি বাণ ধ্যানস্থ হয়ে মহাদেবের আরাধনা করলে, মহাদেব প্রীত হয়ে লিঙ্গরূপ ধারণ করে পর্বতের উপরে অবস্থান করেন। সেই কারণে এই লিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলা হয়। এক কোটি লিঙ্গের অর্চনা করে উপাসক যে ফল পাবেন, একটি বাণলিঙ্গ অর্চনা করলেও সেই ফলই পাবেন। নর্মদা নদীর তীরে প্রাপ্ত বাণলিঙ্গের অর্চনা করলে মোক্ষলাভ উপাসকের করায়ত্ত হয়।'

বাণলিঙ্গের উপাসনার সঙ্গে বাণের নাম সংযুক্ত থাকাটা খুবই অর্থবহ। কেননা বাণ বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে বর্তমান বাণগড়-ই বাণরাজার রাজধানী ছিল। বাণের পিতা ছিলেন অসুররাজ বলি। মহাভারত অনুযায়ী অসুররাজ বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতিগুলির আদিপুরুষদের জন্ম হয়েছিল। বলি শিবেরই উপাসক ছিলেন। সুতরাং শিবপূজার সঙ্গে বঙ্গদেশের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বস্তুত বর্তমানে লিঙ্গরূপী শিবের মন্দির বাঙলাদেশে যত দেখা যায়, ভারতের আর কোথাও তত দেখা যায় না। শিব যে প্রাগার্য দেবতা তা এখন পণ্ডিতমহলে সর্বজন-স্বীকৃত। এটা মহেঞ্জোদারোয় আদি-শিবের প্রতিরূপ পাওয়া থেকেই বুঝতে পারা যায়। শিব মাতৃদেবীর ভর্তা। মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব বাঙলাদেশেই ঘটেছিল। বস্তুত যেরূপ জাঁকজমকের সঙ্গে বাঙলাদেশে মাতৃদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের আর কোথাও তা হয় না। আবার বাঙলাদেশে মাতৃদেবীর পূজা যেরূপ জনপ্রিয়, শিবের গাজন উৎসবও (বিশেষ করে নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে) সেরূপ জনপ্রিয়। এবং প্রাগার্যকাল থেকেই এটা চলে আসছে। ঋগ্‌বেদে লিঙ্গ-উপাসকদের প্রতি ঘৃণা-প্রকাশ ও কটূক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লিঙ্গ-উপাসনা প্রাগার্য সভ্যতার অবদান।

আগেই বলেছি যে মাতৃদেবীর পূজা ও লিঙ্গ-উপাসনা ভূমিকর্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভূমিকর্ষণের ওপর সৌরশক্তির প্রভাব মানুষ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ-কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে (যথা বঙ্গদেশ) আমরা মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি। যেহেতু সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল, এটা খুবই স্বাভাবিক যে সেখানে সূর্যপূজারও অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর আমরা চক্র ও স্বস্তিকচিহ্ন লক্ষ্য করি। এগুলি সূর্যেরই প্রতীকচিহ্ন, কেননা প্রাচীনকালে সূর্য নরাকারে পূজিত হতেন

না, তাঁর চিহ্ন দ্বারাই উপাসিত হতেন। চক্র ও স্বস্তিক ছাড়া সূর্যের অপর যা প্রতীকচিহ্ন ছিল, তা হচ্ছে মণ্ডলাকার চাকতি ও বলদ। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়া, সূর্যের এসব প্রতীকচিহ্ন আমরা পেয়েছি মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট মহকুমার গুঙ্গেরিয়া নামক স্থান থেকে। এখানে তামার কুঠারের সঙ্গে আমরা রূপার চাকতি ও বলদের মাথারূপে পরিকল্পিত চাকতি পেয়েছি। এই শেষোক্ত জিনিসগুলি সূর্যপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখনও মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া জাতি ধর্মীয় নৃত্যের সময় বৃষের মস্তকের চিহ্ন পরিধান করে।

সূর্যপূজা অবশ্য বৈদিক আর্যগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্যগণ কর্তৃক সূর্য নরাকারে কল্পিত হতেন। বৈদিক সূর্যপূজা যে প্রাগার্য ধর্মকে কোনরূপে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং পরবর্তীকালে আর্যদের সূর্যপূজা যে আগন্তুক মগ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আনীত সূর্যপূজা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। তবে প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছটপূজা ও বাঙলার ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ।

গুঙ্গেরিয়ায়-প্রাপ্ত তামার কুঠারের সঙ্গে রূপার চাকতি ও বলদের মাথারূপে পরিকল্পিত চাকতি বিশেষ অর্থবহ। পশ্চিম এশিয়ার দেবতা-গণ প্রায়ই বৃষরূপে কল্পিত হতেন এবং সেখানকার প্রাচীন সীলমোহর-সমূহে নরাকার দেবতাগণকে বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট ধারণ করতে দেখা যায়। সুমেরীয়রা তাদের সর্বোচ্চ দেবতাকে 'স্বর্গের বৃষ' বলে অভিহিত করত। সুমেরের প্রাচীন সীলমোহরের ওপর তাঁকে বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট-পরা অবস্থায় ও তাঁকে বৃষ কর্তৃক অনুষঙ্গী হতে দেখা যায়। অসুর জাতির সর্বোচ্চ দেবতা 'অসুর'ও বৃষরূপে কল্পিত হত। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই আমরা এখানে শিবকে স্মরণ করি। মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি-শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানে আদি-শিবকেও আমরা বৃষ-

শৃঙ্গের কিরীট পরিহিত অবস্থাতে দেখি।

আরও অনেক পূজা, যথা নাগপূজা, অশ্বত্থবৃক্ষ পূজা, হিন্দু দশাবতার প্রভৃতির কল্পনা, আমরা প্রাগার্যদের কাছ থেকে পেয়েছি। এছাড়া, আমরা আরও পেয়েছি শিল্প ও স্থাপত্য, লিপিপদ্ধতি, গোযানের ব্যবহার ইত্যাদি। (এ-সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'প্রি-আরিয়ান এলিমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান কালচার', ১৯৩১, দ্রষ্টব্য।)

বাঙলার মধ্যযুগের লোকায়ত দেবদেবীসমূহ যে নবোপলীয় যুগের, তা মঙ্গলকাব্যসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ (লহনা-খুল্লনা ও কালকেতুর কাহিনী তুলনা করুন) থেকেই বুঝতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিলেই এটা স্পষ্ট হবে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার বারমাস্যায় বর্ণিত হয়েছে : 'কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম / জগজ্জনে কৈল শীত নিবারণ বসন। । নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড় / অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।' আমি বহুবার বহু জায়গায় বলেছি যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যসমূহের রচনাকাল এক, আর তার কাহিনী-কাল আর এক। উপরের উদ্ধৃতিতে ফুল্লরার 'হরিণের ছড়' পরাটা নবোপলীয় যুগের বা প্রাচীন অস্ট্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই চণ্ডী-উপাসনার প্রকৃতকাল ইঙ্গিত করছে।

প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তা এখানেই শেষ করলাম। এই আলোচনার ফলে, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের লৌকিক জীবনচর্যার (অন্যত্র এটাকেই আমি 'কালচার' বা ধর্ম বলেছি) বনিয়াদ গঠনে প্রাচীন মানবের যথেষ্ট অবদান আছে। সেটাই এই আলোচনার যুক্তি।

ভারতের আবয়বিক নৃতত্ত্ব

আবয়বিক নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে নানা মানবগোষ্ঠীর লোক ভারতের মহাক্ষেত্রে এসে মিলিত ও মিশ্রিত হয়েছে। এই মিশ্রণ ও মিলনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ করা বর্তমানে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে যে চেহারা ও অবয়বগত সাদৃশ্য আছে, তার ভিত্তিতে আমরা তাদের নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করতে পারি। কোন্ কোন্ অবয়বগত সাদৃশ্য থাকলে, মানুষকে কোনও এক বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, যা নৃতত্ত্ববিদ-গণ স্বীকার করে নিয়েছেন, তা হচ্ছে—(১) মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ, (২) গায়ের রঙ, (৩) চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য, (৪) দেহের দীর্ঘতা, (৫) মাথার আকার, (৬) মুখের গঠন, (৭) নাকের আকার ও (৮) শোণিত বর্গ বা **blood group**। এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ প্রধান। চুলের বিশিষ্টতার দিক দিয়ে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম, ঋজু বা সোজা চুল (**straight hair**)। এটা মংগোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ। দ্বিতীয়, কুঞ্চিত বা কোঁকড়া চুল (**woolly hair**)। এটা নিগ্রো-জাতির লক্ষণ। তৃতীয়, তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলানো চুল (**smooth wavy or curly hair**)। এটা জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেকসময় অনেক পুরুষের **(generations)** রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডিত চুলকে অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ পায়। খণ্ডিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কি-ভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কী কী লক্ষণ প্রকাশ

পেলে তাকে কোন্ বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, সে-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা এ-স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা এ সম্বন্ধে সাঁ-মারতাঁর বই পড়ে নিতে পারেন। তবে নৃতত্ত্ববিদ-গণ চুলের এবং চোখের রঙ অপেক্ষা গায়ের রঙের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গিয়েছে যে কালো গায়ের রঙের সঙ্গে কালো চুলের একটা সম্পর্ক আছে, কালো চুলের সঙ্গে কালো চোখের কিন্তু এরূপ কোনও পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণত গায়ের রঙ অনুযায়ী মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় —ফর্সা বা সাদা রঙ, ময়লা বা কালো রঙ, ও পীত রঙ। ফর্সা বা সাদা রঙ ককেসীয় জাতির লক্ষণ, পীত রঙ মংগোলয়েড জাতির লক্ষণ, আর ময়লা বা কালো রঙ অন্যান্য জাতির লক্ষণ। অবশ্য এই তিন শ্রেণীর গায়ের রঙের অনেক উপবিভাগ আছে।

দেহের দীর্ঘতা অনুযায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটারের কম।

২. খর্বাকৃতি বা বেঁটে (short)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ মিলিমিটার।

৩. মধ্যমাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫৮২ মিলি-মিটার থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার।

৪. দীর্ঘ (tall)—উচ্চতা ১৬৭৭ মিলিমিটার থেকে ১৭২০ মিলিমিটার।

৫. অতি দীর্ঘ (very tall)—উচ্চতা ১৭২১ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মানুষের মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা (index number) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচক-সংখ্যা বলা হয়। মাথার

দীর্ঘতার (সম্মুখভাগ nasion হতে পশ্চাদ্ভাগ occiput পর্যন্ত) তুলনায় মাথার চওড়ার দিকের (parietal থেকে parietal পর্যন্ত) মাপের শততমাংশিক অনুপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের মাথাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

১. লম্বা মাথা বা দীর্ঘশিরস্ক (dolichocephalic)—অনুপাত ৭৫ শতাংশের কম।

২. মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic)—অনুপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।

৩. গোল মাথা বা বিস্তৃতশিরস্ক (brachycephalic)—অনুপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ প্রথার অনুরূপ। নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (তলদেশের) দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতকে nasal index বা নাসিকা-সূচক-সংখ্যা বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের নাককে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যথা—

১. লম্বা সরু নাক (leptorrhine)—অনুপাত ৫৫ শতাংশ থেকে ৭৭ শতাংশ।

২. মাঝারি নাক (mesorrhine)—অনুপাত ৭৮ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশ।

৩. চওড়া নাক (platyrrhine)—অনুপাত ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ।

নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নির্ণয়ের জন্য রক্তের চারিত্রিক গুণও পরীক্ষা করা হয়। দানা-বাঁধা গুণের (agglutination) দিক দিয়ে রক্তকে 'O', 'A', 'B', 'A-B', 'M', 'N', Rh positive ও negative, ও

বীজাণু-প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদনের দিক দিয়ে 'A' বর্গের রক্তকে A_1, A_2 শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যখন দুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের চারিত্রিক মিল থাকে, তখন তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। আঙুলের রেখা-বিন্যাসের (**finger-prints**) মিল দ্বারাও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের নৈকট্য নির্দেশ করা হয়।

তবে, এ কথা এখানে বলা দরকার যে নৃতত্ত্ববিদগণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়-ভুক্ত করবার জন্য অবয়বের কোন এক বিশেষ লক্ষণের ওপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত আবয়বিক লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের ওপর নির্ভর করেই তাঁরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

এইসকল আবয়বিক লক্ষণের ভিত্তিতে ভারতের জনগণকে পাঁচ নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। যথাক্রমে তারা হচ্ছে :

১. প্রটো-অস্ট্রালয়েড (**Proto-Australoid**) বা আদি-অস্ট্রাল : তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। আদি-অস্ট্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের মিলও আছে। ভারতের আদি-অস্ট্রাল ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের (**'A' agglutinogen**) শতকরা হার খুব বেশি। তা থেকেই রক্তের সাদৃশ্য বুঝতে পারা যায়।

একসময় আদি-অস্ট্রালদের ব্যাপ্তি উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। (এ. সি. হ্যাডন, 'রেসেস্ অভ্ ম্যান' দেখুন) নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌঁছায়।

আদি-অস্ট্রাল জাতির লোকেরা খর্বাকার ও তাদের মাথার খুলি

লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো ও মাথার চুল ঢেউখেলানো। মহেঞ্জোদারোয় ও তিনেভেলি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসকল মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে তারা অনাস, তাদের গায়ের রঙ কালো ও তাদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের নিষাদরাই যে আদি-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত কোন জাতি, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, এই মূল জাতির এক শাখা ভারত ত্যাগ ক'রে সিংহল, ইন্দোনেসিয়া ও মেলেনেসিয়ায় যায় ও সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌছায়।

২. দ্রাবিড় (**Mediterranean**) : এরাই ভারতের প্রথম আগন্তুক জাতি। এরা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে বলেই এদের 'দ্রাবিড়' বলা হয়। এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে। সেজন্য নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের 'ভূমধ্য' বা 'মেডিটেরেনিয়ান' নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের আকৃতি মধ্যাকার এবং মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও গায়ের রঙ ময়লা। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ-জাতির বেশি মিল আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিতান্নালুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে-সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই ভূমধ্যসাগরীয় লোকের। মহেঞ্জোদারোতেও এ জাতির নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। খুব সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পনি'রা এই গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

৩. আলপীয় (**Alpinoid**) : দ্রাবিড়দের অনুসরণেই আলপীয়রা এদেশে আসে। আলপীয়রা আর্য-ভাষাতেই কথা বলত। এরা বিস্তৃত-শিরস্ক, গায়ের রঙ ফর্সা কিন্তু সামান্য বাদামী আভাবিশিষ্ট, চুল ঢেউ-খেলানো, নাক পাতলা ও দীর্ঘ, দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ঊর্ধ্বে, মাথার চুল

কালো, চোখ কালো ও মুখ গোল। অনুমান করা হয়েছে যে, মধ্য এসিয়ায় যে পর্বতমালা আছে তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে এই গোষ্ঠীর লোকদের প্রথম জন্ম হয়েছিল। মনে হয়, এদের একদল এসিয়া-মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে ওড়িশা ও বাঙলায় এসে কেন্দ্রীভূত হয়। বাঙলার পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত এই নরগোষ্ঠীর বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে উক্ত অসুররা খুব সম্ভবত এই গোষ্ঠীর লোক ছিল। তাম্রাশ্ম সভ্যতার যুগে লোথালে এই গোষ্ঠীর মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে।

৪. নর্ডিক (Nordic): আর্য-ভাষাভাষী এই জাতি উত্তর এসিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের অন্তর্বর্তী কোন একসময় এদের এক বড় ধারা স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদেরই এক শাখা ভারতের দিকে এগিয়ে আসে ও পঞ্চনদের উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতর জাতিসমূহের মধ্যে এদের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে উত্তর ভারতে ভূমধ্যীয় জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ সর্বত্রই স্পষ্ট। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশী লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। এরাই বেদ রচনা করেছিল। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্বদিকে আলপীয় উপাদানই বেশি।

৫. প্রত্ন-মংগোলয়েড (Palae-Mongoloid): এই নরগোষ্ঠীর লোকরা মধ্যমকায় এবং গায়ের রঙ ঘোর থেকে হালকা বাদামী ও কিছুটা পীত-ঘেঁষা। ভ্রূ-অঞ্চল খুব লক্ষণীয় নয়, এবং মুখ ছোট ও গণ্ডাস্থি অভিক্ষিপ্ত। নাক মাঝারি এবং সাধারণত মংগোলয়েড

জাতিসমূহের মত চ্যাপটা। মুখে এবং দেহে চুল বিরল, এবং চোখ ছোট ও খাঁজকাটা। মাথার খুলি দীর্ঘ থেকে মাঝারি, ও পিছনদিকটা বাইরের দিকে প্রসারিত। এই নরগোষ্ঠীর লোকদের হিমালয়ের পাদদেশে এবং আসাম ও অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এদের আমরা মংগোল-উদ্ভূত জাতি বলেই অভিহিত করি। মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত 'কিরাত' জাতি এই নরগোষ্ঠীভুক্ত।

দক্ষিণ ভারতের কাদার, পুলায়ান, ইরুলা, ও রাজমহল পাহাড়ের কোন কোন উপজাতি এবং আংগামি নাগাদের স্বল্পসংখ্যক কোন কোন লোকের মাথায় কুঞ্চিত কেশ দেখে, নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের জনগণের মধ্যে 'নিগ্রিটো' উপাদানও আছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কিন্তু অন্যেরা তা অস্বীকার করেছেন। মধ্যযুগের মুসলমান শাসকেরা ভারতে হাবসী দাস আমদানি করতেন, এবং মনে হয় শাসকদের অনুসরণে তারা এদেশের মেয়েদের সচরাচর ধর্ষণ করত, এবং বোধ হয় সেই কারণেই এদেশের কোথাও কোথাও কুঞ্চিত কেশের বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়।

ভারতীয় জাতিসমূহের পরিমাপ প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে লোকগণনার সময় ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিভাগ (**Indian Ethnographic Survey**) কর্তৃক। ওই পরিমাপ গ্রহণের জন্য তৎকালীন সমগ্র ভারতের লোকগণনা সম্পর্কিত চীফ কমিশনার ও নৃতত্ত্ববিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার হারবার্ট রিজলি (**Sir Herbert Risley**) কয়েকজন এদেশীয় সাধারণ সরকারী কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এ কথা বলা প্রয়োজন যে, নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের জন্য স্যার হারবার্ট রিজলি নৃতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে যে-সব কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউই নৃতত্ত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কেবল নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের স্কন্ধে

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের পরিমাপের বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেজন্য ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় যেখানে পরবর্তীকালের অন্য কোন নৃতত্ত্ববিদ কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত পরিমাপ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রিজলির পরিমাপ সবসময় তুলনা করা উচিত নয়। পরন্তু রিজলির সময় এশিয়াবাসীদের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান ছিল বর্তমানে তা অপেক্ষা যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে। এসব কারণে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে লোকগণনার সময় উক্ত গণনা সম্পর্কিত চীফ কমিশনার মিস্টার হাটন (Hutton) ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের (Indian Zoological Survey) নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের ওপর রিজলি ও তৎপরবর্তী কালের নৃতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপগুলির তুলনামূলক মূল্যের ওপর নির্ভর করে ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করে পরিশোধিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ভার অর্পণ করেন।

সেই পরিশোধিত সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ওপর যে নূতন আলোকপাত করেছে, তার ফলে আমরা জানতে পারি যে ভারতের (বর্তমানে পাকিস্তানের) সীমান্তবর্তী হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পর্যায় বিদ্যমান আছে। অন্তঃস্রোতার মত যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি এদের মধ্যে সর্বত্রই ব্যাপ্তিলাভ করেছে সেই পর্যায়ের লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা, দীর্ঘ দেহ, ফিকে রঙের চুল ও চোখ ও ফর্সা চেহারা। পাঠান ও কাফির জাতিরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, এবং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত চিত্রল ও মাস্তাজের খস্ ও ভারতের কাশ্মীরের পণ্ডিত জাতিদের মধ্যে এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বর্তমান। এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকরা

আর্যজাতির ভারতে আগমনের সমসাময়িককালে এইসমস্ত স্থানে এসে বসবাস শুরু করেছিল বা সেই আর্যজনস্রোতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর একটি পর্যায় যা এইসমস্ত প্রদেশে লক্ষিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত লোকদের মাথা গোল, নাসিকা উন্নত, গায়ের রঙ ফর্সা, কিন্তু চোখ ও চুলের রঙ মাঝামাঝি। এই গোষ্ঠী ইউরোপের দিনারিক (**Dinaric Race**) পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইউজিন ফিশার (**Fisher**) এদের নামকরণ করেছেন 'নিকট-প্রাচ্য জাতি' (**Near Eastern Race**)। এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি আংশিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় কাফির ও পাঠানদের মধ্যে এবং খুব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় পাকিস্তানের চিত্রলের খস্, গিলগিট উপত্যকার বুরিশ, দারদি এবং সারিকল, মাস্তাজ ও কাশ্মীরের হুনজা উপত্যকার ওয়াখিস জাতি-সমূহের মধ্যে। কাশ্মীরের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা, উন্নত নাসিকা, গোলাপী আভাবিশিষ্ট ফর্সা গায়ের রঙ ও বাদামী (**brown**) রঙের চোখ ও চুল। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বাদাকশানের বাদাক-শিরাও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ফিশার এই লক্ষণবিশিষ্ট জাতি-সমূহের নামকরণ করেছেন 'প্রাচ্য জাতি' (**Oriental Race**)। এ ছাড়া, কাশ্মীরের লাডাক উপত্যকা ও দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আমরা একটি মংগোলীয় স্তরও লক্ষ্য করি। চিয়াংপো-রা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিম নেপালের লাডাকী, লাহুলী, গুরুং ও অন্যান্য কয়েকটি জাতির মধ্যে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য-গুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সামান্য পরিমাণে এই বৈশিষ্ট্য লাডাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পুরিগি ও মাচনোপা জাতিগুলির মধ্যেও বোধ হয় বিদ্যমান আছে।

উপরি-উক্ত নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গুলি পর্যালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এরা

সকলেই অতীতকালের আগন্তুক পর্যায়। এই অঞ্চলসমূহের আদিম বা মৌলিক অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য—খাটো দেহ, লম্বা মাথা, মাঝারি নাক, চওড়া মুখ ও বাদামী রঙের দেহ। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয় কুলু-র কানেট জাতিসমূহের মধ্যে। প্রসিদ্ধ জার্মান নৃতত্ত্ববিদ আইকস্টেট (Eickstet) এই পর্যায়টির নামকরণ করেছেন 'গাড়ওয়ালি' ও ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ এর নাম দিয়েছেন 'হিমালয়ান'।

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল পরিত্যাগ করে পঞ্চনদে উপনীত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এখানকার অধিবাসীরা উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের পাঠান ও অন্যান্য দীর্ঘশিরস্ক জাতিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদিও আইকস্টেট পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যে দুটি নৃতাত্ত্বিক উপশ্রেণী নির্দেশ করেছেন, তথাপি তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের শিখ ও পশ্চিমের মুসলমানদের মধ্যে অবয়বগত নৃতাত্ত্বিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে যে বৈষম্য সাধারণত বাইরে থেকে দেখা যায়, তা কেবলমাত্র বেশভূষা ও কেশধারণের স্বাতন্ত্র্যের জন্য।

ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসীরা কিন্তু ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অল্পবিস্তর গোল মাথা, পাঞ্জাবীদের অপেক্ষা খর্বতর দৈহিক দৈর্ঘ্য, গোলাকার মুখ ও প্রসারিত নাক। এ থেকে মনে হয় যে, সিন্ধুপ্রদেশের আদিম অধিবাসীরা উত্তরাঞ্চলের লম্বামাথাবিশিষ্ট জাতিসমূহের অন্তর্গত ছিল এবং পরে কোন এক গোলমাথাবিশিষ্ট জাতির আক্রমণ ও সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান 'সিন্ধী' জাতির উদ্ভব হয়েছে।

পাঞ্জাব ও হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অংশবিশেষে আমরা যে লম্বামাথাবিশিষ্ট জাতি লক্ষ্য করেছি সেই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের

আধিপত্য আমরা দেখতে পাই উত্তরপ্রদেশে। বিশেষ করে উত্তর-প্রদেশের ব্রাহ্মণরা এই পর্যায়ের অন্তর্গত, তবে তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের যে সামান্য পার্থক্য আছে, তা লক্ষিত হয় পাঞ্জাবীদের দীর্ঘতর দৈহিক উচ্চতায়, বৃহত্তর মাথায়, দীর্ঘতর নাকে ও অধিকতর প্রসারিত মুখে। এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে গায়ের রঙের কিন্তু বিশেষ বৈষম্য নেই, কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অধিকতর ফর্সা লোক দেখা যায়।

উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশের অনেকগুলি জাতি নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক থেকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যদিও বাঘেল রাজপুতদের মধ্যে গোল মাথাও পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি রাজপুতানার সাধারণ নৃতাত্ত্বিক স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা সুন্দর উন্নত নাক। মধ্যভারতের অধিবাসীরাও একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই পর্যায়ের জাতিসমূহের নাসিকা সম্বন্ধে এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শতকরা ১৩ থেকে ১৪ জনের নাসিকার উপরের ভাগ ধনুকাকার (convex) বা কুব্জ এবং যথেষ্ট-সংখ্যক লোকের মধ্যে নাসিকার মূলদেশ সামান্য পরিমাণে অবনত দেখা যায়। এইসমস্ত জাতিসমূহের সাধারণ গায়ের রঙ বাদামী (brown) এবং চুলের রঙ কালো। খুব কমসংখ্যক লোকের মধ্যে ফিকে-ফিকে রঙের চোখ, চুল ও চেহারা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু একটি বিশেষসংখ্যক লোকের মধ্যে গোলাপী আভাবিশিষ্ট গায়ের রঙ, ঘোর বর্ণের চুল ও চোখও দেখা যায়।

কাথিয়াবার ও গুজরাটের অধিবাসীদের কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোল মাথা। যদিও নগর ব্রাহ্মণ এবং বেনিয়া-জৈন, ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং ঔদিব ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি পারস্পরিক নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে, কুম্বী ব্রাহ্মণদের কিন্তু ঔদিব ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য সূচিত হয় না। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কুম্বীরা

গুজরাটে এসেছিল, এই জনশ্রুতিও তাদের পূর্ব-বর্ণিত নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করে। ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছিলেন যে গুজরাটের নগর ব্রাহ্মণদের পদবীর সঙ্গে বাঙলার কায়স্থদের পদবীর একটা মিল আছে।

যদিও গুজরাটের জাতিসমূহের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তথাপি তাদের পরস্পরের গায়ের রঙের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়; নগর ব্রাহ্মণরা দেখতে সর্বাপেক্ষা ফর্সা এবং তাদের প্রায় কাছাকাছি রঙ হচ্ছে ব্রহ্মক্ষত্রিয়দের। বেনিয়া-জৈনদের গায়ের রঙ ময়লা, এবং কাথিদের গায়ের রঙ আরও ময়লা।

ভারতের উপদ্বীপাংশকে (**Peninsular India**) মোটামুটি দুই ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমাংশ বিন্ধ্যপর্বত থেকে শুরু করে নীলগিরি শৈলমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর নাম দাক্ষিণাত্য। দ্বিতীয়াংশ ১৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের প্রধান জাতিসমূহ হচ্ছে দেশস্থ ব্রাহ্মণ, করহাদ ব্রাহ্মণ, কুন্বী ও মারাঠা। চিৎপাবন, সারস্বত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং প্রভুকায়স্থ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জাতি, ভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস করেছে বলে মনে হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে জারম্যানো ডি সিলভা-র (**Germano de Silva**) এক শিষ্য প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, গোয়া অধিবাসী সারস্বত জাতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার গৌড় ব্রাহ্মণদের নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে।

মোটামুটিভাবে মহারাষ্ট্রের জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরস্ক (**brachycephalic**), এবং দীর্ঘনাসা (**leptorrhine**) থেকে নাতিদীর্ঘনাসা (**mesorrhine**)। চিৎপাবনরা সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ। অন্যান্য জাতি এদের চেয়ে ময়লা। দেশস্থ মারাঠা ও সারস্বতদের মধ্যে অল্পসংখ্যক পিঙ্গলবর্ণ (**tawny**) ত্বক্‌ও পরিলক্ষিত হয়। পরস্পরের মধ্যে চোখ ও চুলের রঙেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে এ বিষয়ে

চিৎপাবন, প্রভুকায়স্থ ও সারস্বতদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ **blonde element**-ও দেখতে পাওয়া যায় এবং ভারতীয়দের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ ও তাদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফিকে রঙের চুল ও চোখ পরিদৃষ্ট হয়।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ বোম্বাইয়ের পারসী জাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে, তারা অতিমাত্রায় বিস্তৃতশিরস্ক (brachycephalic), তাদের নাসিকা দীর্ঘ, উন্নত ও প্রায়ই কুব্জ (aquiline), এবং তাদের মুখ বিস্তৃত, কিন্তু অল্পবিস্তর ছোট। যদিও পারসীরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক থেকে ভারতের অন্যান্য জাতিসমূহ হতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত, তথাপি তাদের সঙ্গে জরথুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী, অগ্নিপূজক প্রাচীন পারসীক জাতির কোন নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য নেই। প্রাচীন পারসীক জাতি দীর্ঘশিরস্ক (doli-chocephalic) ও দীর্ঘনাসা (leptorrhine) এবং তাদের মুখ লম্বা। এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার আর্যভাষাভাষী জাতিদের সঙ্গে তাদের নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য খুব বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয়।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে খুব নিকটতম ঘনিষ্ঠতা আছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই যে, গুজরাট রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃতশিরস্কতা (brachycephaly) খুব বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং তাদের নাকও বেশি পরিমাণে দীর্ঘ ও সুন্দর। ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মধ্য-ভারত থেকে মহারাষ্ট্র দেশে একটি সাধারণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের আগমন ঘটেছিল, এবং পশ্চিম ভারতে ওই পর্যায়ের ওপর কোন এক বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি এসে নৃতাত্ত্বিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠা ছাড়া আরও অনেক জাতি আছে। যেমন কর্ণাটক, দক্ষিণ-পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের সমমালভূমির পশ্চিমাংশের কন্নড় জাতিসমূহ, উত্তর ও পূর্বাংশের তেলেগুভাষাভাষী

জাতিসমূহ ও মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যবর্তী দক্ষিণ কানাড়ার কানাড়া বা কন্নড় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত তুলুভাষী জাতিসমূহ। শিরাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা (cephalic index) ৭৮·০ থেকে ৮০·০ পর্যন্ত এবং নাসিকাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা (nasal index) ৭১·৪ থেকে ৭২·২ পর্যন্ত। তার মানে, তুলুরা অনুবিস্তৃতশিরস্ক ও দীর্ঘনাসা। তুলু-ভাষী জাতিসমূহের মধ্যে কন্যাগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, এবং সাধারণত তারা মৃতের শবদাহ করে, যদিও সমাধিস্থ করার প্রথা তাদের অজানা নয়। মৃতকে যখন তারা সমাধিস্থ করে, তখন তারা ওই স্থানের ওপর কোণাকার সমাধিস্তূপ নির্মাণ করে।

কর্ণাটকের কানাড়াভাষী জাতিসমূহের শিরাকারজ্ঞাপক ও নাসিকা-কারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা যথাক্রমে ৭৯·৩ ও ৭৩·৫। বেলারী ও কর্নুল জেলার কানাড়াভাষী জাতিসমূহের মাথা কিছু বেশি দীর্ঘ ও নাকও কিছু বেশি বিস্তৃত। তাদের শিরাকারজ্ঞাপক ও নাসিকাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা যথাক্রমে ৭৮·৮ ও ৭৫·৩। ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ কানাড়া-ভাষী ব্রাহ্মণদের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মাথা গোল (শিরাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৭৯·৩৪) এবং তাদের নাক লম্বা (নাসিকাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৭৬·২০)। কয়েক ক্ষেত্রে কুব্জ নাসিকাও (aquiline) দেখা গিয়েছে। ব্রাহ্মণ-দের দেহদৈর্ঘ্য (stature) অব্রাহ্মণ জাতিসমূহ অপেক্ষা কম; কিন্তু অব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ব্রাহ্মণদের চেয়ে ময়লা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালো বা পিঙ্গলযুক্ত বাদামী। চোখের রঙ ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয়েরই ঘোর বাদামী বা কালো—যদিও খুব অল্পসংখ্যকের মধ্যে ফিকে রঙও দেখতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বাংশে ও গঞ্জাম থেকে সংযুক্ত জেলাসমূহের উপকূলভাগে যে-সমস্ত জাতি বাস করে, তাদের নাম অন্ধ্র। অন্ধ্রদের শিরাকারজ্ঞাপক ও নাসিকাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা যথাক্রমে ৭৭·৬

এবং ৭৫'৪। তার মানে, তারা নাতিদীর্ঘনাসা। মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের অন্ধ্রদের মধ্যে দুটি প্রধান জাতি, যথা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য কুমটিদের দেহ-দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি, মুখ লম্বা এবং নাক অল্পবিস্তর লম্বা ও উন্নত। ব্রাহ্মণ-দের গায়ের রঙ অন্যান্য জাতির চেয়ে ফিকে। কিন্তু চোখের রঙ সকলেরই কালো থেকে ঘোর বাদামী। চুলের রঙ খুব বিশিষ্টভাবে কালো, এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে নাক খুব বিস্তৃত।

ভারতের উপদ্বীপের ১৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের তলভাগস্থ ভূভাগের অধিবাসীদের আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম, কেরালা ও পশ্চিম উপকূলের মালয়ালীভাষী জাতিসমূহ ও দ্বিতীয়, পূর্ব উপকূলের তামিলভাষাভাষী জাতিসমূহ। কেরালার মালয়ালী ভাষা-ভাষী জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক ও দীর্ঘনাসা। তাদের মধ্যে নাম্বুদ্রি, নায়ার ও ইলুবার জাতিসমূহ যথাক্রমে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর প্রতিভূস্বরূপ। নাম্বুদ্রিরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়, নায়াররা মধ্যকায় ও ইলুবাররা খর্বকায়। নাম্বুদ্রিরা সর্বাপেক্ষা ফর্সা, নায়ারদের গায়ের রঙ বাদামী থেকে পিঙ্গলযুক্ত বাদামী ও ইলুবাররা সর্বাপেক্ষা মলিন। চোখের রঙ সকলেরই কালো থেকে ঘোর বাদামী এবং চুলের রঙ কালো, অল্পসংখ্যকের মধ্যে ফিকে রঙও পরিদৃষ্ট হয়। নাম্বুদ্রিদের মুখের আকার নায়ারদের অপেক্ষা লম্বা এবং তাদের নাকের গঠনও বেশ উন্নত। মনে হয় নাম্বু-দ্রিরা বহির্দেশ থেকে কেরালায় এসে বসবাস করেছে, কিন্তু নায়ারদের সঙ্গে 'সম্বন্ধম্' নামক বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তামিলনাড়ুর তামিলভাষাভাষী জাতিসমূহও দীর্ঘশিরস্ক, কিন্তু তাদের নাক ঠিক মালয়ালীভাষাভাষীদের মত দীর্ঘ নয়। তামিল ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বিশেষভাবে ঘোর বাদামী, এবং চেট্টি ও কাল্লা-দের যথাক্রমে পিঙ্গলযুক্ত বাদামী থেকে গভীর পিঙ্গলযুক্ত বাদামী।

চোখ ও চুলের রঙ সকলেরই কালো। তবে তামিলভাষাভাষীদের যে পরিমাপ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন পর্যায় বর্তমান—একটি দীর্ঘশিরস্ক ও আরেকটি বিস্তৃতশিরস্ক। এ দুটি পর্যায় যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চবর্ণের তামিলভাষাভাষীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ বলেন যে, যদিও তামিলভাষাভাষী জাতি-সমূহের মধ্যে একটি দীর্ঘশিরস্ক অন্তস্তর খুব প্রবলভাবে বর্তমান, তবুও বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায়ের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটেছে। নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক দিয়ে তাদের স্থান কানাড়াভাষাভাষী জাতিসমূহের ঠিক মাঝামাঝি এবং এ-বিষয়ে দ্রাবিড়ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে তেলেগু-ভাষাভাষীদের সঙ্গে মালয়ালীভাষাভাষীদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধ আছে। পশ্চিম ও প্রাচ্যভারতে আমরা যে বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায় দেখি, সেই একই পর্যায়ের সংমিশ্রণে দ্রাবিড় জাতিসমূহের মধ্যে যে বিস্তৃত-শিরস্কতার উদ্ভব হয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাচ্যভারত তিন ভাগে বিভক্ত—বিহার, বাঙলা, ও ওড়িশা। এই তিন প্রদেশের অধিবাসীদের প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বিস্তৃতশিরস্কতা (brachycephaly)। পশ্চিমে এই পর্যায়ের অস্তিত্ব আমরা বারাণসীর পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করি। বিহারপ্রদেশে এই পর্যায় বেশ ব্যাপকভাবে বর্তমান; কিন্তু বাঙলা-দেশেই এই পর্যায় বিশেষভাবে ঘনীভূত হয়েছে। ওড়িশার অধিবাসি-গণ এই পর্যায়ের দক্ষিণতম প্রান্তের নিদর্শন।

এই পর্যায়ের উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট রিজলি বাঙলার অধিবাসীদের মংগোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাই-গুড়ি ও রঙ্গপুরের কোচ জাতিকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিস্তৃতশিরস্কতা ও বিস্তৃতনাসিকা যথাক্রমে

মংগোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য, এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত পূর্ব-বর্ণিত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেইহেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মংগোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু রিজলি বাঙলার যে-সব জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের ওপর ভিত্তি করে উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেইসব জাতি যদিও বাঙলার রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তথাপি তারা সকলে বাঙালী বলতে যা বোঝায় তা নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙলার উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি-সমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগেরা (যাদের পরিমাপ রিজলি নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতির পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন) মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধি-বাসী নয়। তারা ইন্দোচীন নামক মংগোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েকশত বর্ষ পূর্বে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিচিত্র সামাজিক সংগঠন ও আহং, সেপোটাং, পাংডুং, থাফাস্নু, থিয়াংগা ইত্যাদি অবাঙালী নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচরা ঐতিহাসিক কালে উত্তরবঙ্গ-বিজেতা মংগোলীয় পর্যায়-সম্ভূত কোচ জাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেথরু, লবু, অলিঙ্গ, এন্না, তানডু, লোবাই প্রভৃতি নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মাল জাতি রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙলাদেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সাঁওতাল পরগনার মালপাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাঙলার সীমান্তাংশবাসী এইসব অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ-

গুলির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলাদেশের জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসমীচীন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে, বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রিজলির মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে মাত্র, তা নয়, বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর নূতন আলোকপাত করে।

ডঃ গুহ বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশ পরগনার পোদ জাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে, বাঙালী ব্রাহ্মণদের মাথা গোলাকার (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৭৮·৯৩), নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহদৈর্ঘ্যের গড় উচ্চতা ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের মাথার চেয়ে কিছু বেশি গোল (শিরাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৮০·৮৪), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহদৈর্ঘ্যের গড় উচ্চতা সামান্য কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ)। পোদদের দেহদৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা কম (১৬২৮ মিঃ মিঃ), মাথা কম গোল (শিরাকারজ্ঞাপক সূচকসংখ্যা ৭৭·১৩), মুখ ছোট ও অপ্রসারিত, এবং নাক ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকের চোখ ঘোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কালো। চুলের রঙ সকলেরই কালো।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শির ও প্রসারিত-নাসিকা দেখে, তারা দ্রাবিড়-মংগোলীয় জাতিসম্ভূত বলে রিজলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু রিজলির এই মতবাদের সপক্ষে যে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই, তা উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা

যাবে। মংগোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক মাত্র। সুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃতশিরস্কতা যদি মংগোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মংগোলীয় জাতি কর্তৃক বাঙলাদেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু এরূপ কোন আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোনও সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালী জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোন জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, যা দ্বারা তাদের মংগোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এরূপ অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এসব দেশের অধিবাসিগণ মংগোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

তা ছাড়া, শাস্ত্রীয় প্রমাণও রিজলির মতবাদের বিরোধী। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যে অসুর-রাজ বলির পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তান থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র—এই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। তাছাড়া বিস্তৃতশিরস্কতা মংগোলীয় জাতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বিস্তৃতশিরস্কতা ছাড়া মংগোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন—তাদের ঋজু সরল চুল, চোখের খাঁজ (epicanthic fold), গণ্ডাস্থির প্রাধান্য, পীতাভ গায়ের রঙ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসকল মংগোলীয় লক্ষণ বাঙালীদের মধ্যে নেই।

এ সম্পর্কে একটা বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তপ্রদেশের ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরস্ক, তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, যদিও বাঙলার পূর্ব-সীমান্তের মংগোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক, পূর্ববাঙলার বাঙালীরা কিন্তু বিস্তৃতশিরস্ক। যদি পরস্পর সান্নিধ্যহেতু বাঙলার অধিবাসীদের সঙ্গে সীমান্তবাসী মংগোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তাহলে

আমরা এর বিপরীত পরিস্থিতিই দেখতে পেতাম।

উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা যে আলপীয় পর্যায়ভুক্ত এবং সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ, তামিলনাড়ু, বিহার ও ওড়িশার বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহের সঙ্গে একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্রঃ)

ভাষার যাত্নঘর

ভারতের সংবিধানে মাত্র ১৫টি ভাষার নাম থাকলেও, ভারতের লোক মোট ১০৫৮টি মাতৃভাষায় কথা বলে। সুতরাং সংখ্যা-গরিমার দিক দিয়ে ভারতকে এক 'ভাষার যাত্নঘর' বলা যেতে পারে। ভারতের এই ১০৫৮টি মাতৃভাষাকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়; যথা: (১) ইন্দো-ইওরোপীয় বা আর্য ভাষা, (২) দ্রাবিড় ভাষা, (৩) অস্ট্রিক ভাষা, ও (৪) ভোট-বর্মী ভাষা। এদের মধ্যে আবার অস্ট্রিক ভাষাকে ত্ন'ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) মুণ্ডারী, ও (খ) মোন্-খ্মের। আর ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীকে সাতটি উপশাখায় ভাগ করা হয়। তার মধ্যে তিনটি হিমালয়-মণ্ডলে কথিত হয়—(ক) ভোটিয়া বা তিব্বতী, (খ) হিমালয়ী, ও (গ) নেফা (Nefa) অঞ্চলে; আর চারটি আসাম-বর্মী অঞ্চলে কথিত হয়; যথা—(ক) বোরো, (খ) নাগা, (গ) কুকিচিন, ও (ঘ) কাচিন।

১. অস্ট্রিক ভাষা: প্রথমেই আমরা অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর কথা বলব। তার কারণ, অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা-গোষ্ঠী। এক কথায়, এটাই ভারতের আদিম দেশজ ভাষা। ভারতে অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যে-সব ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলিকে অস্ট্রিক ভাষার অস্ট্রো-এসিয়াটিক শাখার ভাষা বলা হয়। এর অপর শাখাকে বলা হয় 'অস্ট্রোনেসিয়ান'। অস্ট্রোনেসিয়ান শাখার ভাষা-সমূহ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক ভাষাসমূহকে তুই শাখায় বিভক্ত করা হয়; প্রথম, 'মোন্-খ্মের'। আসামের 'খাসিয়া' উপজাতির লোকেরা এই ভাষায় কথা বলে। দ্বিতীয়, 'মুণ্ডারী' গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—খারওয়ারি, কুরকু, খরিয়া, জুয়াঙ, শবর ও গডাবা। খারওয়ারি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত

হচ্ছে—সাঁওতালি বা হর, মুনারি, ভূমিজ, বিরহর, কোডা, হো, তুরিম, আসুরি, আগারিয়া ও কোরওয়া। সাঁওতালি প্রধানত সাঁওতাল পরগনার ভাষা, হো সিংহভূমের লরকাদের ভাষা, আর বাকীগুলি ছোট-নাগপুর সংলগ্ন ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের ভাষা। তবে ওরাওঁরা দ্রাবিড়ভাষায় কথা বলে। 'কুরকু' মহাদেও পাহাড়ের আদিবাসীদের ভাষা। 'খরিয়া' ভাষায় কথা বলে রাঁচী এবং সংলগ্ন যশপুর ও গাঙপুর জেলার আদিবাসীরা। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবণতা দেখা যায় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 'কুরুখ' ভাষায় বা কোন অপভ্রংশ 'আর্য' ভাষায় কথা বলার। এক কথায়, খরিয়া ভাষা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এবং আদিম বিশুদ্ধ খরিয়া ভাষায় এখন আর কেউই কথা বলে না। খরিয়ার সঙ্গে 'জুয়াঙ' ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চলের মাত্র একটি আদিম উপজাতির লোকেরাই এই ভাষায় কথা বলে। এরা জুয়াঙ। একসময় জুয়াঙরা পর্ণ-বসন পরত, তাই তাদের 'পাতুয়া' বলা হয়। ওড়িশার সংলগ্ন অন্ধ্রপ্রদেশের লোকরা 'শবর' ও 'গডাবা' ভাষায় কথা বলে। তবে 'গডাবা' ভাষার সঙ্গে প্রতিবেশীদের তেলেগু ভাষা অনেকক্ষেত্রেই মিশ্রিত হয়ে গেছে। শবররা খুব প্রাচীন জাতি এবং তারা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বৈদিক যুগের আর্যরাও শবরদের সঙ্গে পরিচিত ছিল। প্লিনি ও টলেমির গ্রন্থেও শবরদের উল্লেখ আছে। যদিও প্রতিবেশীদের ভাষাসমূহ থেকে তারা অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে, তা হলেও মোটামুটিভাবে শবরদের ভাষা অবিকৃত থেকে গিয়েছে।

'মুণ্ডারী' ভাষাভাষীদের নিজস্ব কোন লিপি নেই। তাদের ভাষার যে পরিচয় দেওয়া হয়, তা অধিকাংশ স্থলেই 'রোমান' হরফে মুদ্রিত। তাদের ভাষার যে সাহিত্য পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাদের মধ্যে অনেক রূপকথা, উপকথা ও লোকগাথা প্রচলিত আছে। আরও জানতে পারা যায় যে, তাদের ভাষাসমূহ যৌগিক-শব্দ

(agglutinative) দ্বারা গঠিত। এ-সব ভাষাসমূহের আরও যে-সব বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি হচ্ছে—(ক) অবরুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি। (খ) তিনটি বচন—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। (গ) উত্তমপুরুষের দ্বিবচন ও বহুবচনের ত্বটি করে রূপ, যথা 'আমি ও তুমি', 'আমি ও তোমরা', 'আমি ও তাহারা' বোঝাতে ভিন্ন ভিন্ন সর্বনাম পদের ব্যবহার। (ঘ) ক্রিয়াপদের রূপে কর্তা ও কর্মের নির্দেশক সর্বনামস্থানীয় বা সর্বনাম পদের ব্যবহার। (ঙ) কখনও কখনও ধাতুকে দ্বিত্ব করে ক্রিয়া-প্রতিপাদক গঠন। (চ) নঙর্থক ধাতুরূপের অভাব। (ছ) ক্রিয়াপদের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করে প্রত্যয় বিভক্তি সংযোজন। (জ) দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়াজাতির ন্যায় 'কুড়ি' সংখ্যাকে ভিত্তি করে উচ্চতর সংখ্যার গণনা। অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে বাংলা ভাষা ও বাঙলার জীবনচর্যাকে।

২. আর্যভাষা : ভারতে আর্যভাষার প্রবর্তন করেছিল তুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী। এরা হচ্ছে (১) নর্ডিক, ও (২) আলপীয়। এই তুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল মাথার খুলির আকারে (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ)। এরা বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছিল। নর্ডিকরা খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বৎসর সময়কালের মধ্যে কোন সময় ভারতে এসে পঞ্চনদের উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারাই করেছিল ঋগ্বেদ রচনা। ঋগ্বেদের ভাষাই আর্যভাষার সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন। আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকা থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে 'মধ্যদেশ'কেই আর্য-সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্রে পরিণত করেছিল, তখন 'বৈদিক' ভাষা রূপান্তরিত হয়েছিল 'সংস্কৃত' ভাষায়। অনুমান করা হয় যে, বৈয়াকরণরাই এই রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। বৈয়াকরণদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন পাণিনি। অনেকে মনে করেন যে পাণিনির সময়ে মধ্যদেশে যে দেশজ ভাষা প্রচলিত ছিল সেটাই নাকি সংস্কৃত ভাষার রূপ নিয়েছিল। সে যাই হোক, মধ্যদেশে প্রচলিত এই

সংস্কৃত ভাষাই আর্যদের কাছে আদর্শ বা দেবভাষারূপে পরিগণিত হত। গ্রিয়ারসন এই ভাষাকেই 'অন্তর্বর্তী' আর্যমণ্ডলের ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। আর এর বাহিরের ভাষাকে 'বহির্বর্তী' আর্য-মণ্ডলের ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। এটা স্বাভাবিক যে লোকমুখে এ-সব ভাষা বিকৃত বা দুষ্টরূপ ধারণ করত। সে-সব বিকৃত ভাষাকে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বলা হত। প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষা থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে 'দেশজ' (vernaculars) ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। 'অন্তর্বর্তী' মণ্ডলের ভাষার প্রাকৃত রূপ থেকে আঞ্চলিক বা দেশজ ভাষা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল প্রতীচ্য-হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, ভিলি, খান্দেশি ও রাজস্থানী। আর 'বহির্বর্তী' মণ্ডলে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা-সমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল লহণ্ডা, সিন্ধি, মারাঠি, ওড়িয়া, বিহারী, বাংলা ও অসমীয়া। এছাড়া আছে পাহাড়ী ভাষাসমূহ, তবে সেগুলিকে 'অন্তর্বর্তী' মণ্ডলের মধ্যেই শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

'প্রতীচ্য-হিন্দি'কেই 'অন্তর্বর্তী' আর্যমণ্ডলের ভাষার বর্তমান 'আঞ্চলিক' রূপ বলে ধরা হয়। এ ভাষাই আদি-মধ্যদেশে কথিত হয়। তবে আদি-মধ্যদেশের উত্তরের লোকেরাও এ-ভাষাতেই কথা বলে। এটাই হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। মুসলমান আমলে ফারসি ও আরবি শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে, এ 'হিন্দুস্থানী' ভাষার রূপ নিয়েছে। হিন্দুস্থানী ভাষাই এখন এই অঞ্চলের সচল ভাষা। এ ভাষাতেই কোর্ট-কাছারি ও বাজার-হাটের সব কাজ চলে। এক কথায় এটাকে উত্তর ভারতের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা সর্বজনীন ভাষা বলা চলে। বলা হয় যে, এ ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল উত্তরে মীরাট ও দক্ষিণে দিল্লির মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং মুঘল আমলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের কাছে, এ ভাষা সাহিত্যিক সম্মান পেয়েছে। এ ভাষা লেখবার জন্য ফারসি ও দেব-নাগরী উভয় লিপিই ব্যবহৃত হয়।

হিন্দুস্থানীরই ফারসি সংস্করণকে উর্দু বলা হয়। এ ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল দিল্লির মুঘল প্রাসাদের বাহিরে অবস্থিত 'উর্দু-এ-মুয়াল্লা' নামক এক ফৌজী বাজার থেকে। সেজন্যই এর নাম উর্দু। যখন কবিতা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন উর্দুকে 'রেখত্' বলা হয়। যদিও উৎপত্তির দিক দিয়ে বিচার করলে উর্দু সাহিত্য মুসলমানী সাহিত্যই, তা হলেও এ সাহিত্যে ফারসী শব্দ অতিমাত্রায় ব্যবহার করত মুঘল প্রশাসনে নিযুক্ত হিন্দু কায়স্থ ও খট্রিরা। দাক্ষিণাত্যেও উর্দু সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এ-সাহিত্য 'দক্ষিণী হিন্দুস্থানী'তে রচিত হত। দিল্লি ও লক্ষ্ণৌয়ে প্রচলিত হিন্দুস্থানীর সঙ্গে 'দক্ষিণী হিন্দুস্থানী'র সামান্য প্রভেদ ছিল। 'দক্ষিণী হিন্দুস্থানী'তে কিছু প্রাচীন রীতি অবলম্বিত হত, যা দিল্লী ও লখনউ অঞ্চলে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে, বাংলা সাহিত্যের ন্যায় উর্দু সাহিত্যও পদ্যে রচিত হত। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই উর্দু ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্মস্থান ছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ওই কলেজের শিক্ষকরা ফারসি ও আরবি শব্দ বর্জন করে হিন্দি গদ্য রচনারীতি প্রবর্তন করেন। হিন্দুদের মধ্যে এই ভাষা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইহাই পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, উত্তর ভারতের নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে উর্দুর ব্যবহার এখনও বেশ প্রচলিত আছে। এক কথায়, উর্দু ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে প্রভেদ এই যে উর্দুতে বেশি পরিমাণে ফারসি ও আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়; হিন্দুস্থানীতে তা হয় না। তা ছাড়া, উর্দুর নিজস্ব কিছু বাক্‌বিধি বা 'ইডিয়ম্' আছে। তবে ব্যাকরণ দুইয়েরই এক।

উর্দু ও হিন্দুস্থানী ছাড়া, প্রতীচ্য-হিন্দির আর যে-সব উপভাষা উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে বাঙ্গরু, ব্রজভাষা, কনৌজি ও বুন্দেলি। বাঙ্গরু হচ্ছে গঙ্গানদীর অব্যবহিত পশ্চিমে পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্বে

অবস্থিত বাঙ্গর অঞ্চলের ভাষা। কখনও কখনও এ-ভাষাকে 'হরিয়ানি' ভাষাও বলা হয় এবং এ-ভাষার সঙ্গে পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী ভাষার যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। 'ব্রজভাষা'র সঙ্গে 'শৌরসেনী' ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মথুরা অঞ্চলের লোকেরাই এই ভাষায় কথা বলে। এক-সময় প্রচুর কাব্য-সাহিত্য এ ভাষায় রচিত হয়েছিল। 'কনৌজি' ভাষার সঙ্গে 'ব্রজভাষা'র বিশেষ কিছু তফাত নেই। তবে এই ভাষায় কানপুর পর্যন্ত গঙ্গা উপত্যকার নিম্নভাগের লোকেরা কথা বলে। বুন্দেলি ভাষায় বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর উপত্যকার কিছু অংশের লোকেরা কথা বলে।

রাজস্থানী ভাষায় রাজস্থানের লোকরা কথা বলে। এ ভাষাও 'প্রতীচ্য-হিন্দী' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এর অনেক আঞ্চলিক রূপ আছে। এই আঞ্চলিক রূপবিশিষ্ট ভাষাগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা। উত্তর অঞ্চলের প্রতীক ভাষা হচ্ছে মেওয়াটি বা বিঘোটা। তবে এর উত্তর-পশ্চিমের লোকেরা বাঙ্গরু ও উত্তর-পূর্বের লোকেরা ব্রজভাষায় কথা বলে। দক্ষিণ রাজপুতানার প্রতীক ভাষা হচ্ছে মালবী, যা মালবের লোকদের ভাষা। পূর্ব রাজপুতানার প্রতীক ভাষা হচ্ছে জয়পুরী; আর পশ্চিম রাজ-পুতানার মারবাড়ী। মারবাড়, মেবার, বিকানীর ও জয়সলমিরের অধি-বাসীরা এই ভাষা ব্যবহার করে। এটাই হচ্ছে রাজস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এবং এ-ভাষায় রচিত প্রচুর সাহিত্য আছে। এ ভাষা ব্যবহারের জন্য এক বিশেষ লিপি ব্যবহৃত হয়। এ লিপিকে মারবাড়ী লিপি বলা হয়। রাজস্থানের লোকদের মধ্যে মারবাড়ীরাই বিশেষ উদ্যমশীল, এবং শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে এদের নানা অবদান আছে।

এককালে রাজস্থানের লোকরা হিমালয়ের চম্বা থেকে নেপাল পর্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বহু উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারা সেখানে গিয়ে

স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করেছিল। তাদের সন্তানসন্ততিরা যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষাকে 'পাহাড়ী' ভাষা বলা হয়। এটা 'প্রতীচ্য-হিন্দি' গোষ্ঠীর ভাষা। তবে এই অঞ্চলে 'বহির্বর্তী' আর্যমণ্ডলের 'বিহারী' ভাষা ও 'ভোট-বর্মী' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'খস্' ভাষারও ব্যাপক প্রচলন আছে। 'খস্' ভাষা খস্‌জাতির ভাষা। আর এই অঞ্চলে অবস্থিত গুজর জাতির লোকেরা 'গুজারী' ভাষায়, লাভানা ও বঞ্জারা জাতির লোকেরা 'লভানী' ভাষায় কথা বলে। এই দুটি ভাষা 'রাজস্থানী' ভাষারই উপশাখা-বিশেষ।

গুজরাটের লোকরা গুজরাটি ভাষায় কথা বলে। পশ্চিমদিকে 'প্রতীচ্য-হিন্দি'র এটাই প্রত্যন্ত ভাষা। এ ভাষাটা 'বহির্বর্তী' আর্য-মণ্ডলের 'সৌরাষ্ট্রী প্রাকৃত' ভাষা থেকে উদ্ভূত। দেবনাগরী লিপির ভিত্তিতে গুজরাটিরা একটা নিজস্ব লিপি তৈরি করে নিয়েছে। গুজরাটি ভাষাতেও এক বিরাট সাহিত্য আছে। গুজরাটের ভীল জাতির লোকেরা ও খান্দেশ-এর অধিবাসীরা গুজরাটি ভাষারই এক আঞ্চলিক রূপবিশিষ্ট ভাষায় কথা বলে।

পাঞ্জাবে দু'রকম ভাষা প্রচলিত আছে—'পাঞ্জাবী' ও 'ডোগরী'। প্রায় তিনশ' বছর আগে 'পাঞ্জাবী' ভাষা 'লণ্ডা' ('লহণ্ডা' থেকে স্বতন্ত্র) ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে 'গুরমুখী' ভাষার রূপ নেয়। এটা শিখ সম্প্রদায়ের ভাষা। শিখ সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মগ্রন্থই এই ভাষায় রচিত। গুরমুখী ভাষার স্বতন্ত্র লিপি আছে। তবে ফারসি ও দেবনাগরী লিপিও ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাবে 'ডোগরী' ভাষারও প্রচলন আছে। পাঞ্জাবের কোন কোন অঞ্চলে 'ডোগরী'ই প্রকৃত কথ্যভাষা। এটা জম্মু রাজ্যের 'দেশজ' ভাষা। কাশ্মীরের 'পণ্ডিত' জাতি এক অতি প্রাচীন ভাষার ধারক। এ ভাষার নাম 'কষ্টওয়ারী'। মাত্র দু-তিন শতাব্দী পূর্বে এ-ভাষায় রচিত সাহিত্য এখনকার লোকদের কাছে দুর্বোধ্য। তার কারণ, বর্তমানে প্রচলিত ভাষার মধ্যে প্রচুর ফারসি ও আরবি শব্দের

অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রচলিত 'লহণ্ডা' ভাষা নানা নামে পরিচিত। যথা 'পথওয়ারি', 'চিভালি', 'জটকি', 'মুলতানী', 'হিন্দকো' ইত্যাদি। সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে হিন্দুরা 'লহণ্ডা' ভাষায় কথা বলে ; আর মুসলমানরা কথা বলে 'পাস্তো' ভাষায়। যদিও পূর্বদিকে ৭৪ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বরাবর অঞ্চলের লোকরা লহণ্ডা ভাষাতেই কথা বলে, তবে অনুমান করা হয়েছে যে, একসময় আরও পূর্বতর অঞ্চলের লোকরা লহণ্ডা ভাষাই ব্যবহার করত। লহণ্ডা ভাষার নিজস্ব কোন সাহিত্য নেই।

সিন্ধু প্রদেশের লোকরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে। সিন্ধি ভাষার চারটি আঞ্চলিক রূপ আছে। উত্তরের লোকরা 'সিরৈকি' ভাষায় কথা বলে ; দক্ষিণের লোকরা 'লারি' বা 'লারু' ভাষায় ; থর মরু অঞ্চলের লোকেরা 'থরেলি' ভাষায়, এবং কচ্ছের লোকরা 'কচ্ছি' ভাষায়। সিরৈকির সঙ্গে লহণ্ডা ভাষা, থরেলির সঙ্গে মারবাড়ী ভাষা, ও কচ্ছি ভাষার সঙ্গে গুজরাটি ভাষা মিশ্রিত।

মহারাষ্ট্রের লোকরা মারাঠি ভাষায় কথা বলে। গুজরাটের ভাষা প্রসঙ্গে আমরা সৌরাষ্ট্রী প্রাকৃতের কথা বলেছিলাম। মারাঠির মধ্যেও আমরা সৌরাষ্ট্রী প্রাকৃতের কিছু কিছু সন্ধান পাই। উত্তরে মহারাষ্ট্রের প্রতিবেশী ভাষাসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে গুজরাটি, রাজস্থানী, প্রতীচ্য-হিন্দি ও প্রাচ্য-হিন্দি। মহারাষ্ট্রের পূর্ব-দিকে মারাঠি ক্রমশ অগ্রসর হয়ে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে আরব সাগর। আর দক্ষিণে এর প্রতিবেশী ভাষা-সমূহ হচ্ছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। মারাঠি ভাষায় এক বিরাট জনপ্রিয় সাহিত্য আছে। মারাঠি লিপি দেবনাগরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিহারের লোকরা মোটামুটি তিনরকম ভাষায় কথা বলে—'মৈথিলী' 'মগহি' ও 'ভোজপুরী'। মৈথিলী ভাষা ত্রিহুত অঞ্চলে কথিত হয়।

রাজস্থানীগণ কর্তৃক নেপাল আক্রান্ত হবার পুর্বে, মৈথিলী ভাষাই নেপালে প্রচলিত ছিল। মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ বেশ জটিল, এবং এতে প্রাচীন আর্যভাষার কিছু কিছু রীতি লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষার সঙ্গেও মৈথিলী ভাষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এবং এর লিখনপ্রণালীতে বাংলা লিপিই ব্যবহৃত হত। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এ-ভাষায় কিছু সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। 'মগহি' ভাষা হচ্ছে প্রাচীন মগধের ভাষা। দক্ষিণ বিহারের সর্বত্রই (হাজারিবাগের মালভূমি ও ছোটনাগ-পুরের অধিত্যকা পর্যন্ত) এ-ভাষা কথিত হয়। 'মৈথিলী' ভাষার ন্যায় এ-ভাষার ব্যাকরণও বেশ জটিল। কথিত আছে যে ভগবান বুদ্ধ এ-ভাষাতেই তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পশ্চিম বিহারে উত্তর প্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চলে 'ভোজপুরী' ভাষা ব্যবহৃত হয়। অল্পবিস্তর প্রভেদের সঙ্গে ভোজপুরী ভাষা ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যান্য বিহারী ভাষার মত এর ব্যাকরণ জটিল নয়, এবং এ-ভাষা অতি সহজেই শেখা যায়। বিহারের ভাষাসমূহ দেবনাগরীতেই ('কায়েথী') লেখা হয়।

বাঙলাদেশের ভাষার নাম 'বাংলা'। সংলগ্ন বাংলাদেশেও এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। যদিও সাহিত্যের ভাষা সর্বত্রই এক, তাহলেও কথ্যভাষা হিসাবে এর নানা 'আঞ্চলিক' রূপ আছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'গবেষণা পরিষদ' এরূপ আঞ্চলিক ভাষার একখানি অভিধান সংকলন করেছেন। তাঁরা যে হাজার হাজার আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেছেন, তার একটাও কলকাতার লেখকরা যখন বিভিন্ন জেলার পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করেন তখন তা ব্যবহার করেন না। বাংলা ভাষার ভিত্তি অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মাগধী প্রাকৃত। এগুলিকে আমরা 'দেশজ' শব্দ বলি। তবে দেশজ শব্দ ছেড়ে দিলে, বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কিছু প্রভেদ আছে। এছাড়া,

বাংলা ভাষার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র। উচ্চারণের দিক দিয়েও বাংলার 'অ' সংস্কৃতের 'অ' থেকে পৃথক। সংস্কৃতে 'আ' দীর্ঘধ্বনি, বাংলায় হ্রস্বধ্বনি। 'এ', 'ও', 'ঐ' ও 'ঔ' ধ্বনিও বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারিত হয় না। 'শ', 'ষ' ও 'স' এই তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বাংলায় প্রায় এক; সংস্কৃতে বিভিন্ন। 'ণ' ধ্বনি এখন বাংলায় লুপ্ত। এর উচ্চারণ 'ন'-এর মত। উচ্চারণের প্রভেদ ছাড়া, বাংলায় মাত্র দুটি লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ নেই। বাংলায় বিশেষণে কারক বিভক্তি যোগ হয় না। তাছাড়া, আরও অনেক প্রভেদ আছে। বাংলায় সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দসমূহ তিন শ্রেণীতে পড়ে: (১) তদ্ভব, (২) তৎসম ও (৩) অর্ধ-তৎসম। সংস্কৃত ও 'দেশজ' শব্দ ছাড়া বাংলায় বহু আগন্তুক শব্দ আছে। এগুলি আরবি, ফারসি, পর্তুগীজ, ইংরেজি ভাষাসমূহ থেকে গৃহীত। বর্তমানে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ইংরেজি শব্দ নির্বিবাদে ঢুকে পড়েছে। বাংলায় এক সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য আছে। এ সাহিত্যের বয়স হাজার বছরেরও ওপর। বাংলায় যে লিপি ব্যবহৃত হয়, তা ব্রাহ্মী লিপিরই এক বিবর্তিত রূপ।

ওড়িশায় ব্যবহৃত 'ওড়িয়া' ভাষার ব্যাকরণ খুব সহজ ও সরল। বাংলা ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ওড়িশায় এক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তবে ওড়িয়া লিপি বাংলা লিপির মত নয়। বাংলা লিপির সরল রেখাগুলি ওড়িয়া লিপিতে বক্রাকার ধারণ করেছে, এবং লিপি লৌহ-নির্মিত 'স্টাইলাস' লেখনী সাহায্যে লিখিত হয়।

আসামের লোকেরা অসমীয়া ও বাংলা, এই উভয় ভাষাতেই কথা বলে। অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষারই মত, এবং এ-ভাষা লেখবার জন্য বাংলা লিপিই ব্যবহৃত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ খুবই নগণ্য। তবে আসামে অনেক উপজাতি বাস করে। খাসিয়ারা মোন্-খ্মের ভাষা ব্যবহার করে। অন্যেরা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর কোন-না-কোন ভাষায়

কথা বলে।

৩. দ্রাবিড় ভাষা : দ্রাবিড় ভাষাসমূহ প্রধানত দক্ষিণ ভারতে ব্যবহৃত হয়। এ গোষ্ঠীর ভাষাগুলির নাম হচ্ছে—তামিল, মালয়ালম, কানাড়ী, কোডগু, তুলু, তোডা, কোটা, গোণ্ড, কুরুখ, মালতো, তেলেগু, কণ্ট, কোলামি ইত্যাদি। ভারতের বাহিরে বেলুচিস্তানে কথিত 'ব্রাহুই' ভাষাও দ্রাবিড় ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশেও দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহৃত হয়, কেননা সেখানকার অধিবাসীরা প্রধানত তামিলনাড়ুর লোক। এছাড়া, উপরে যে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কোটা, বডগ, গোণ্ডি, মধ্যভারতে কুই বা কণ্ট ওড়িশায়, কুরুখ বা ওরাঁও বিহার-ওড়িশায়, মালতো রাজমহল পর্বতে, পারজি ও ওল্লার ওড়িশায়, কোলামি মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত। কিন্তু প্রতীক ভাষা হচ্ছে তামিল। সংস্কৃতের তুলনায় তামিল ভাষার বর্ণসংখ্যা অনেক কম। স্বরবর্ণের মধ্যে তামিল ভাষায় ঋ, ৠ, ও ঌ নেই। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পাঁচটি বর্গে কেবল প্রথম ও পঞ্চম বর্ণই ব্যবহৃত হয়—যথা ক ও ঙ, চ ও ঞ, ট ও ণ, ত ও ন, প ও ম। তার মানে, অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলি নেই। তামিল-এ শ, ষ, স, ও হ নেই। মূর্ধন্য 'ল' আছে। তাছাড়া, ঘোষবৎ উষ্মধ্বনি 'ড়' বা 'ঝ' এবং দন্ত্যমূলীয় 'ন' ও 'ল' আছে। বর্ণমালার প্রভেদ ছাড়া, দ্রাবিড়ভাষায় কিছু ব্যাকরণগত পার্থক্যও আছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে অপ্রাণীবাচক ও ইতরপ্রাণীবাচক শব্দসমূহ ক্লীবলিঙ্গ; নামপুরুষের সর্বনামের এক বচনে তিন লিঙ্গ, কিন্তু বহুবচনে দুই লিঙ্গ; উত্তমপুরুষের বহুবচনে ভিন্নার্থক দুটি রূপ (একরূপে শ্রোতার অন্তর্ভুক্তি ও অন্যরূপে বহির্ভুক্তি বোঝায়); শব্দরূপের উভয় বচনে একই বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োগ; উপসর্গ ও কর্মবাচ্যের অভাব; নেতিবাচক ধাতুরূপের ব্যবহার; দশের ঊর্ধ্বে সংখ্যাবাচক শব্দের গঠনে সংস্কৃতের বিপরীত রীতি; নিত্যসম্বন্ধ-বাচক শব্দের অভাবে জটিল বাক্যগঠনে অসুবিধা; কৃদন্ত বিশেষণ ও

বিশেষ্য পদের বহুল ব্যবহার; এবং এক বাক্যে অজস্র অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মাত্র একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ। বলা প্রয়োজন যে, দ্রাবিড় ভাষাসমূহ সংযোগমূলক বা **agglutinative**।

'দ্রাবিড়' ও 'তামিল', এই দুই শব্দের আদিম প্রতিরূপ হচ্ছে 'দ্রামিড়'। তার মানে 'দ্রামিড়' শব্দ থেকেই 'দ্রাবিড়' ও 'তামিল' শব্দ-দ্বয় উদ্ভূত হয়েছে। উত্তরে মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিমঘাটের পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ বিভাগের অধি-বাসীরা তামিল ভাষাতেই কথা বলে। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা। প্রাচীন তামিল ভাষার এক সাহিত্যও আছে। শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশেও এ-ভাষা প্রচলিত। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য আগের অনুচ্ছেদেই বিবৃত হয়েছে।

তামিল ছাড়া, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর আর তিনটি বহুল প্রচলিত ভাষা হচ্ছে 'মালয়ালম', 'কানাড়ী' ও 'তেলেগু'। 'মালয়ালম' তামিল ভাষারই এক শাখা। আনুমানিক খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে এর উদ্ভব ঘটে। মালাবার উপকূলের লোকেরা (বিশেষ করে কেরল ও প্রাচীন চের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে) এই ভাষায় কথা বলে। এ ভাষার এক আঞ্চলিক উপশাখা য়েরব (**Yerava**) কুর্গে প্রচলিত আছে। তামিল ভাষার সঙ্গে মালয়ালম ভাষার পার্থক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: মালয়ালম ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য। মালয়ালম ভাষাতেও এক বিরাট সাহিত্য আছে। লিখনের জন্য প্রাচীন 'গ্রন্থ' লিপি ব্যবহৃত হয়। এই লিপিতেই দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ লিখিত হয়।

মহীশূর, পশ্চিমঘাট অঞ্চল ও মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে 'কানাড়ী' ভাষা প্রচলিত। নীলগিরি অঞ্চলে প্রচলিত 'বডগ' ও 'কুরুম্ব' ভাষাদ্বয় 'কানাড়ী' ভাষারই উপশাখা। কুর্গের লোকেরা কোডগ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষাটিও কানাড়ী ভাষার উপশাখা। দক্ষিণ মহীশূরের কানাড়া জেলার লোকেরা তুলু ভাষায় কথা বলে। নীলগিরি অঞ্চলের উপজাতিরা

'টোডা' ও 'কোটা' ভাষায় কথা বলে। এগুলিও কানাড়ী ভাষারই উপশাখা। কানাড়ী ভাষাতেও এক ভাল সাহিত্য আছে। এ ভাষা লেখবার জন্য যে লিপি ব্যবহৃত হয়, তা অনেকটা তেলেগু লিপির মত।

অন্ধ্রদেশের লোকরা তেলেগু ভাষায় কথা বলে। সমৃদ্ধ ও প্রাচীনা ভাষা হিসাবে তামিলের পরই তেলেগুর স্থান। তবে তামিল অপেক্ষা তেলেগুভাষাভাষীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তেলেগু ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (১) এতে নামপুরুষের একবচনে স্ত্রীলিঙ্গবোধক কোন আলাদা শব্দ নেই, ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করেই কাজ চালানো হয় ; (২) ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, যা তামিলে বড়-একটা দেখা যায় না ; (৩) নামপুরুষের ক্রিয়াপদে কখনও কখনও কাল, পুরুষ, সংখ্যা ও লিঙ্গবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না ; (৪) ধ্বনির দিক দিয়ে তেলেগু ভাষার শব্দসমূহ স্বরান্ত, হসন্তবিশিষ্ট বিদেশী শব্দগুলিকে স্বরান্ত করে নেওয়া হয় ; (৫) সংখ্যাবাচক 'হাজার' শব্দটি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় সংস্কৃত 'সহস্র' থেকে উদ্ভূত ; কিন্তু তেলেগুতে আদিম দ্রাবিড় শব্দ 'বেলু' দেখা যায়। তেলেগুতেও এক বিশাল সাহিত্য আছে। লিপিপদ্ধতিতে ওড়িয়ার ন্যায় দেবনাগরী হরফের সরলরেখার পরিবর্তে বক্ররেখা দেখা যায়।

অন্যান্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের মধ্যে 'কন্ট' বা 'কুই' ওড়িশার পাহাড় অঞ্চলের খন্দজাতির মধ্যে প্রচলিত, কোলামি বেরারে প্রচলিত, গোণ্ডি মধ্যভারতের পর্বত অঞ্চলে গোণ্ড উপজাতির মধ্যে, কুরুখ ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতির মধ্যে ও মালতো রাজমহল পর্বতের মালের উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই ভাষাগুলির মধ্যে কুরুখ প্রাচীন তামিল ও কানাড়ী ভাষার সঙ্গে, ও মৌলিক গোণ্ডি অন্ধ্রদেশের ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বর্তমান গোণ্ডিতে প্রচুর পরিমাণে আর্যভাষার শব্দ আছে।

৪. ভোট-বর্মী ভাষা : তিব্বতের ভাষাকেই 'ভোট' ভাষা বলা

হয়। লাডাক, সিকিম ও ভুটানের লোকেরাও এই ভাষায় কথা বলে। হিমালয় অঞ্চলের অনেকগুলি ভাষাই এই ভাষা থেকে উদ্ভূত। তার মধ্যে আছে নেপালে প্রচলিত নেওয়ারি ও গুরুঙ, মঙ্গর, মুরমি ও সুনওয়ার, পূর্ব নেপাল, দার্জিলিং ও সিকিমে ব্যবহৃত রোঙ বা লেপচা, এবং মঙ্গর ও মুরমি। এছাড়া, হিমালয় অঞ্চলে আরও কতকগুলি (pronominalised) ভাষা ব্যবহৃত হয় : কনাওয়ারি, লিম্বু, কিরান্তি, ধীমাল প্রভৃতি ভাষাসমূহ। শেষের এই ভাষাগুলির ওপর অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মুণ্ডারী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেজন্য কেউ কেউ অনুমান করেন যে সুদূর প্রাচীনকালে কোন এক সময় হিমালয় পর্বত অঞ্চলেও অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকদের বিস্তার ছিল এবং এ-অঞ্চলের ভাষাসমূহের মধ্যে তারা এই বিস্তারের নিদর্শন রেখে গিয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বা নেফা মণ্ডলের ভাষাগুলি ভোট-বর্মী। প্রধান ভাষা আকা, আবর, আবর-মিরি, দফলা ও মিশমী।

আসামের পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে যে-সকল উপজাতি বাস করে, তাদের অধিকাংশই ভোট-বর্মী ভাষায় কথা বলে। তাদের মধ্যে খাসিয়া জাতির লোকরা অবশ্য অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মোন্-খ্মের শাখার ভাষায় কথা বলে। অন্যত্র যে-সকল ভোট-বর্মী ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলিকে চারটি বর্গে ভাগ করা হয়। প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বোডো বা বোড়ো, কাছাড়ী, রাভা, কোচ, মেচ, গারো, ত্রিপুরী, লালুঙ, হোজাই ও মিকির। বোডো ভাষাভাষীরা পশ্চিম আসামে বাস করে। সম্ভবত একসময় তারা পূর্ববঙ্গেও বাস করত। কাছাড়ী কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত, রাভা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ বাঁকের পূর্বে, কোচ ও মেচ উত্তরবঙ্গ ও আসামের সমতলভূমিতে, গারো গারো-পার্বত্য অঞ্চলে, ত্রিপুরী ত্রিপুরা রাজ্যে, লালুঙ জৈন্তিয়া পাহাড়ের পূর্বে, গৌহাটি ও নওগাঁর মধ্যে, ও হোজাই গৌহাটি জেলায়। দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নাগাভাষা। নাগাভাষার মধ্যে প্রধানগুলি হচ্ছে আও, অঙ্গামী,

সেমা, তঙগ্‌খুল, লোথা ও রেঙ্গমা। এ ভাষাগুলি প্রধানত নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে প্রচলিত। তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কুকি-চিন গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। এর উপশাখা হচ্ছে মেইতেই, চিন, লুশাই ও কুকি। এ ভাষাগুলি প্রচলিত আছে আসামের লুশাই পার্বত্যাঞ্চল, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে। চতুর্থ বর্গের ভাষা হচ্ছে কাচিন। আসাম ও উত্তর-ব্রহ্ম-সীমান্তে এ-ভাষা কথিত হয়।

৫. আন্দামানী : উল্লেখ্য যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ১২টি। ভাষাগুলি সবই অবর্গীভূত। তবে তার মধ্যে 'জারোয়া' উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্টির বৈষম্য ও বৈচিত্র্য

ভারত বিভেদের দেশ। আগের দুই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ভারতের মানুষের নৃতাত্ত্বিক আবয়বিক রূপ ও ভাষা এক নয়। ভারতে পাঁচটি ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক বাস করে এবং তারা ১০৫৮টি মাতৃভাষায় কথা বলে। এক কথায়, ভারত আবয়বিক নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক দিয়ে বৈষম্যের দেশ। এই বৈষম্য আমরা কৃষ্টির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি। অশন-বসন, বসবাসের জন্য গৃহ-নির্মাণের রীতি, মন্দির-নির্মাণ, দেবতাকে খাদ্য-নিবেদন, বিবাহপ্রথা, আদর্শ নারীর কল্পনা, পাল-পরবের বিচিত্রতা, কৃষিকর্মের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, পরিবহণ ব্যবস্থা, রন্ধন-প্রক্রিয়া, রন্ধনের নিমিত্ত তৈল-উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারতে আমরা এক বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্য ভারতের লোকের জীবনচর্যাকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে।

ভারতীয় কৃষ্টির এই বৈচিত্র্য অনেকটা অঞ্চলগত। প্রথমেই অশন-বসনের কথা ধরা যাক। ভারতীয়দের প্রধান খাদ্য তণ্ডুলজাতীয় ফসল। যথা—চাউল, গম, যব, বজরা, রাগি, ভুট্টা, ইত্যাদি। কিন্তু এসকল ফসল থেকে খাদ্য-উৎপাদন বিভিন্ন উপায়ে করা হয়। বিহার, বাঙলা, আসাম, ওড়িশা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ ভূভাগে অবস্থিত রাজ্য-সমূহের প্রধান ফসল ধান্য। ধান্য থেকেই চাউল উৎপন্ন হয়। সেজন্য এ-সব অঞ্চলের লোকদের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউল সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। তার মধ্যেও আবার প্রভেদ আছে। বিহার ও ওড়িশার কোন কোন আদিবাসী জাতির লোকেরা ভাতের ফেন ফেলে দেয় না। কিন্তু বাঙালী ফেন-গালা ভাত খায়। বাঙালীরা গরম ভাত খায়। ওড়িশায় জলে-ভেজানো পান্তা-ভাত খাওয়ার রীতি বেশি প্রচলিত।

চাউল থেকে মুড়ি, ধান্য থেকে খই ও চিঁড়া তৈরি করা হয়। তবে

এগুলি প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। এগুলি আনুষঙ্গিক খাদ্য মাত্র।

উত্তর ভারতের প্রধান ফসল গম। গম চূর্ণ করে আটা তৈরি করা হয়। আটা সিদ্ধ করে খাওয়া হয় না। আটাকে জল দিয়ে মেখে, তা থেকে রুটি তৈরি করে সেঁকে খাওয়া হয়। সুতরাং অশনের দিক দিয়ে, প্রথমেই আমরা উত্তর ভারতের সঙ্গে প্রাচ্যভারতের এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করি। এক অঞ্চলের লোক সিদ্ধ খায়, আর অপর অঞ্চলের লোক সেঁকা খাদ্য খায়। মাত্র মূল-খাদ্য প্রস্তুতেই যে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা নয়। রন্ধন-প্রক্রিয়াও বিভিন্ন পদ্ধতির। প্রাচ্যভারতের লোকরা রন্ধন-প্রক্রিয়ায় সরিষার তৈল ব্যবহার করে। উত্তর ভারতের লোকরা তৈলের পরিবর্তে ঘৃতেরই বেশি ভক্ত। আবার পশ্চিম ভারতের লোকরা রন্ধন-প্রক্রিয়ায় তিলতৈল ব্যবহার করে। দক্ষিণ ভারতে রন্ধন-প্রক্রিয়ায় নারিকেল তৈলের ব্যবহারই বেশি পরিমাণে প্রচলিত। তাছাড়া, প্রাচ্যভারতের লোকেরা, বিশেষ করে বাঙালীরা যত রকমের ব্যঞ্জন তৈরি করতে জানে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকরা তা জানে না। উদাহরণস্বরূপ বাঙলায় 'সুক্ত' প্রস্তুতের উল্লেখ করা যেতে পারে। মাত্র 'সুক্ত' প্রস্তুত নয়। বাঙালী মেয়েরা ৬৪ রকম ব্যঞ্জন তৈরি করতে জানে। তাছাড়া, বাঙলা ও প্রাচ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা মৎস্যভক্ষণ করে। মৎস্য ছাড়া তাদের খাওয়াই হয় না। উত্তর ভারতের লোকেরা মৎস্যভক্ষণ করে না। তারা নিরামিষ আহারই করে এবং এজন্য খাদ্যকে সুষম করবার জন্য বেশি পরিমাণে ঘিয়ের ব্যবহার করে। আবার বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের নিম্নকোটির লোকরা রন্ধন-করা খাদ্যের পরিবর্তে ছাতু (ছোলা বা যবচূর্ণ) ব্যবহার করে। এটাই তাদের প্রধান খাদ্য। কোথাও কোথাও আবার চিঁড়া-দহিই প্রধান খাদ্য।

মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও আমরা উত্তর ভারতের সঙ্গে প্রাচ্যভারতের

বিভেদ লক্ষ্য করি। আঞ্চলিক বৈষম্য বোঝাবার জন্য আমি এখানে একশ' বছর আগেকার পরিস্থিতিটারই বর্ণনা দিচ্ছি। যোগাযোগের ফলে, বর্তমানে এ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উত্তর ভারতের মিষ্টান্নসমূহ ক্ষীর দিয়েই তৈরি করা হত। বাঙলাদেশের মিষ্টান্নসমূহ ছানা দিয়ে তৈরি করা হত। ক্ষীরের পেঁড়া ও লাড্ডু উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল। বাঙলায় ছানা দিয়ে তৈরি সন্দেশই শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। ঘিয়ে-ভাজা নোন্‌তা খাবার, যথা—নিমকি, সিঙ্গাড়া, কচুরি ও মিষ্টি-খাবার, যথা—জিলাপি, অমৃতি, বালুসাই, মুগের লাড্ডু ইত্যাদি উত্তর ভারতের অবদান। বাঙলার অবদান রসে-সিদ্ধ-করা রসগোল্লা, রসমালাই ইত্যাদি। নারিকেল সহকারে মিষ্টান্ন প্রস্তুত বাঙলারই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া, পিঠেপুলি তৈরি করাও বাঙলার বৈশিষ্ট্য। আবার দক্ষিণ ভারতের লোক তাদের প্রিয় খাদ্য হিসাবে যে 'ইডলি' তৈরি করে, তা উত্তর ভারতের লোক তৈরি করতে জানে না।

মানুষ তার দেবতাকে বরাবরই নিজ প্রতিরূপেই কল্পনা করে এসেছে। সেজন্য সে তার নিজের প্রধান ও প্রিয় খাদ্যসমূহ, তার দেবতার জন্যও ব্যবস্থা করে এসেছে। সেজন্য আমরা, দেখি, বাঙালী তার দেবতাকে চাউলের নৈবেদ্য নিবেদন করে। উত্তর ভারতের লোকরা তা করে না। বিহারের লোকরাও তা করে না। তারা দেবতাকে ছাতু বা চিনির তৈরি এলাচদানা নিবেদন করে। যাঁরা গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দেবার জন্য চাউল ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় ছাতু। বাঙালী তার দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যে সন্দেশ, নারিকেল-নাড়ু, কলা ইত্যাদি ব্যবহার করে। উত্তর ভারতের লোকরা এরূপ করে না।

তাছাড়া, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেকরকম নিষেধও আছে। আগেই বলেছি, উত্তর ভারতের লোকরা মাছ খায় না। কিন্তু ছাগমাংস খায়। মনে হয়, তাদের মাংস-আহার বৈদিক আর্যসমাজে প্রচলিত গোমাংস-

ভক্ষণের উত্তরাধিকার। বাঙলাদেশের লোকরা মাছ খায়। সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে তারা তাদের দেবতাকেও মাছ নিবেদন করে। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে (এখন অবশ্য এগুলি অপ্রচলিত হয়ে গেছে) যে এককালে বাঙালী বিভিন্ন তিথিতে কতকগুলো তরিতরকারী খেত না। এ-সব নিষিদ্ধ খাদ্যের মধ্যে ছিল প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমীশাক, একাদশীতে সিম, দ্বাদশীতে পুঁই-শাক, ত্রয়োদশীতে মাষকলাই ইত্যাদি। যদিও আজকাল এ-সব বিধি-নিষেধ মানা হয় না, তা হলেও এ-সব বিধিনিষেধ থেকে বুঝতে পারা যায় যে অতীতে বাঙালীর আহারে কোন্ কোন্ তিথিতে কি কি তরিতরকারী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। লক্ষণীয় এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ এগুলো বিদেশী তরিতরকারী, মাত্র দু-তিনশো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে। এ ছাড়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্যাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল।

যদিও মাছ না হলে বাঙালীর খাওয়া হয় না, তবে বছরের কতক-গুলো দিনে তারা মাছ খায় না, বিশেষ করে মেয়েরা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার তারা জয়মঙ্গলবার পালন করে। সেদিন তারা মাছ খায় না। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার তারা ইতুপূজা করে। ইতুপূজার দিনও তারা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকদের কাছে ওইদিন ইলিশ মাছ খাওয়া বাধ্যতামূলক। বাপ-মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আগের দিন শ্রাদ্ধকারী মাছ খায় না। এক সময় দশহরার দিন বাঙালী মাত্র ফলাহার করত। এখন সে নিয়ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আষাঢ় মাসে বিধবা স্ত্রীলোকেরা অম্বুবাচী পালন করে। অম্বুবাচীর তিনদিন তারা রন্ধন করে না। ওই তিনদিন তারা সত্তপক্ব কোন খাদ্যই গ্রহণ করে না। কেউ কেউ অম্বুবাচী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রস্তুত রুটি, লুচি, খই, চিঁড়া, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ওই তিনদিন আহার করে। আবার কেউ কেউ পক্ব জিনিসই খায় না। গুড়, চিনি খাওয়াও তারা নিষিদ্ধ বলে মনে করে। সে-সব বিধবারা ওই তিনদিন মাত্র ফলমূল ও কাঁচা দুধই একমাত্র খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

আবার কোন কোন দিন ঠাণ্ডা খাদ্য খাওয়ার নিয়মও আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। ওইদিন তপ্ত খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী 'শীতল ষষ্ঠী' নামে আখ্যাত। ওইদিন ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। আগের দিন রাত্রে আলু, বেগুন, সিম, রাঙালু ইত্যাদি সমেত মাষকলাই সিদ্ধ করা হয়। শীতল ষষ্ঠীর দিন দধি দিয়ে সেই কলাই-সিদ্ধ খাওয়া হয়।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এখানে মাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিধিনিষেধের কথা বলা হল। সমগ্র ভারতেই অঞ্চলভেদে এ-রকম বিধিনিষেধ আছে। সে-সব বিধিনিষেধ এই স্বল্পপরিসর বইয়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

শুধু খাদ্যের দিক দিয়ে নয়। বসন-ভূষণের দিক দিয়েও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। পশ্চিম বাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া) পাড়বিশিষ্ট শাড়ি পরে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মেয়েরাও তাই। তার মানে, তারা সেলাইবিহীন বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু রাজস্থান ও পাঞ্জাবের মেয়েরা সেলাই-করা বসন পরে। পশ্চিম ভারতের মেয়েরা শাড়ি পরবার সময় কাছা দেয়। অন্য জায়গার মেয়েরা কাছা দেয় না। পুরুষের ধুতিও নানা কায়দায় পরা হয়। বাঙলায় চটিজুতার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা গোড়ালি-বিশিষ্ট জুতা পরত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতের লোকদের অশন-বসনের কোন

ঐক্য নেই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি-পদ্ধতিরও প্রভেদ আছে। আসামের মিজো জেলায়, ওড়িশার কেওনঝরে ও মধ্য-প্রদেশের অবুঝমাড় উপত্যকায় 'জুম' পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। 'জুম' চাষে পাহাড়ের গায়ে গাছ ও ঝোপ-ঝাড় কেটে তাতে আগুন ধরানো হয়। জমি সামান্য পুড়ে গেলে ও ছাই ছড়িয়ে পড়লে বর্ষার সময় কিছু বীজ বুনে লাঙ্গলের সাহায্য ব্যতিরেকে চাষ করা হয়। অন্যত্র যথা বাঙলা, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি ধাপ কেটে সরু সমতল ক্ষেত্র তৈরির পর লাঙ্গল ও যথেষ্ট সারের সাহায্যে চাষ করা হয়।

বসবাসের জন্য গৃহনির্মাণেও আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। বাঙলাদেশে ছ্যাঁচা-বেড়া দিয়ে কাঠামো তৈরি করে, তার গায়ে কাদামাটি লেপে কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়। বিহারে বা উত্তরপ্রদেশে তা করা হয় না। সেখানে কাদামাটি দিয়ে প্রথম এক হাত পরিমাণ এক থাক্ দেওয়াল তৈরি করা হয়। তারপর সে-থাক্ শুকিয়ে গেলে তার ওপর কাদামাটির দ্বিতীয় আর এক থাক্ তৈরি করা হয়। এইভাবে কুঁড়েঘরের উচ্চতা-প্রমাণ দেওয়াল তৈরি করা হয়। ঘরের ছাদ কোথাও খড়, আবার কোথাও বা গোলপাতা দিয়ে ঢাকা হয়। কোথাও কোথাও 'খোলা' দিয়েও ছাদ ঢাকা হয়। যেখানে ঘরের ছাদ একদিকেই নেমে আসে, তাকে একচালা ঘর বলা হয়। যেখানে ঘরের মধ্যবর্তী উচ্চস্থান থেকে ঘরের চাল দু'দিকে নেমে আসে, তাকে দোচালা কুঁড়েঘর বলা হয়। দক্ষিণভারতে টোডারা গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুড়ঙ্গের মত কুটির নির্মাণ করে। আবার আসামের উপজাতিরা শাঙ্কবাকারে (conical) কুটির নির্মাণ করে। এভাবে দেখতে পাওয়া যাবে যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের বাসস্থান নির্মাণ করে। তবে সর্বত্রই সঙ্গতিপন্ন লোকরা ইট দিয়ে গাঁথা

পাকা দেওয়াল ও ছাদবিশিষ্ট গৃহনির্মাণ করে।

আগেই বলেছি যে ভারতের লোকরা রন্ধন-ক্রিয়ায় নানারূপ তৈল ব্যবহার করে। তৈলবীজ থেকে তৈল-নিষ্কাশন ভারতের নানা অঞ্চলে নানা পদ্ধতিতে করা হয়। এর জন্য নানারকম কৌশল ও যন্ত্রাদি অবলম্বিত হয়। কোলজাতির লোকেরা দুইখণ্ড কাঠের পাটার মধ্যে তৈলবীজ রেখে তার ওপর চাপ দিয়ে তেল বের করে। তাদের মধ্যে ঘানির ব্যবহারও প্রচলিত আছে। তবে সে-সব ঘানি তারা বলদের পরিবর্তে নিজেরাই ঘোরায়। ওড়িশার উত্তরভাগে সরাইকেলাতে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য তিনপ্রকার ঘানির প্রচলন আছে; যথা—(১) দুটি বলদ-টানা নালিবিহীন একখণ্ড কাষ্ঠ-নির্মিত ঘানি, (২) এক-বলদ-টানা নালিযুক্ত একখণ্ড কাঠের তৈরি ঘানি, ও (৩) এক-বলদ-টানা নালিযুক্ত, কিন্তু দুইখণ্ড কাঠের তৈরি পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানি। গ্রিয়ারসন তাঁর 'বিহার পেজেণ্ট লাইফ' বইয়ে ওই প্রদেশের ঘানির যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে সরাইকেলার এক-কাঠের তৈরি ও নালি-যুক্ত ঘানির বেশ মিল আছে। এক-কাঠের তৈরি ঘানি পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি ও আসামের শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত আছে। দুই-বলদ-টানা নালিবিহীন ঘানি ওড়িশার পুরী জেলার গ্রামাঞ্চলে, গঞ্জাম জেলায় ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে। এরূপ দু-একটি ঘানি একসময় হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে ও মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের দক্ষিণে ও গুজরাটেও প্রচলিত ছিল। বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, যথা নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, হুগলি, বর্ধমান ও বীরভূমে পিঁড়ি-বিশিষ্ট ঘানির প্রচলনই বেশি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বলেন : 'কলুদের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কেহ উড়িষ্যাবাসী, কেহ বিহারের সহিত সম্পর্কিত, কেহ বা বাঙলাদেশ হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেকে শিল্পকলার সম্বন্ধে স্বীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে এবং পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। নিজের শাখার মধ্যেই

সর্ববিধ বৈবাহিক সম্পর্ক সঙ্কুচিত করিয়া রাখা, প্রতি জাতি বা উপ-জাতির সাধারণ লক্ষণ।'

দেবতার জন্য মন্দির-নির্মাণ ভারতীয় কৃষ্টির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-বিষয়েও আঞ্চলিক শিল্পকলার রীতি অনুসৃত হয়। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে মন্দির-নির্মাণ রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্য স্বতন্ত্র রূপ ও ধারা লাভ করেছিল। উত্তর ভারতে নির্মিত মন্দিরগুলিকে 'নগর' রীতিতে গঠিত মন্দির বলা হয় এবং দক্ষিণ ভারতে অনুসৃত রীতিকে 'দ্রাবিড়' রীতি বলা হয়। উত্তর ভারতের রীতিতে নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন মেলে ওড়িশা, খাজুরাহো, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। ভুবনেশ্বর, কোনারক ও পুরীর মন্দিরগুলি এই স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। এই রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলিকে অনেক সময় 'ভদ্র' বা 'রেখ' শৈলরীতিতে গঠিত মন্দিরও বলা হয়। 'দ্রাবিড়' রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতি। এ রীতিতে গঠিত মন্দিরগুলিকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(১) পল্লব, (২) চোল, (৩) পাণ্ড্য, (৪) বিজয়নগর, ও (৫) মাদুরাই বা নায়ক। এগুলি সবই নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে।

আবার বাঙলাদেশের মন্দিরগুলি অন্য রীতিতে তৈরি। এর দুটি ধারা আছে—(১) চালা মন্দির, ও (২) রত্ন মন্দির। বাঙলাদেশের অধিকাংশ শিবমন্দিরই 'চালা' রীতিতে গঠিত। কালীঘাটের মন্দির এই রীতিতে গঠিত মন্দিরের নিদর্শন। আর দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির 'রত্ন' রীতিতে গঠিত মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতের সামাজিক বিচিত্রতাও অদ্ভুত। সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পরিবার ও পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিবাহ দ্বারা। ভারতে যত জাতি ও উপজাতি আছে, তার চেয়ে বেশি বিবাহপ্রথা প্রচলিত

আছে। সর্বত্রই এবং সকল জাতি ও উপজাতির মধ্যেই বিবাহ সুনির্দিষ্ট বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু একের বিধির সঙ্গে অপরের মিল নেই। উত্তর ভারতে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হয় না। এটা বিধি-বিগর্হিত ব্যাপার। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় এরূপ বিবাহই বাঞ্ছনীয় বিবাহ। সেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহও বিধিসম্মত বিবাহ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই বধূর সিঁথিতে সিন্দূর-দানই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা রমণীর চিহ্ন। কিন্তু দক্ষিণভারতে সিন্দূর-দান প্রথা নেই। সেখানে সধবা মেয়েরাও সিঁথিতে সিন্দূর পরে না। সেখানে কণ্ঠে তালিবন্ধনই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান, এবং এটাই সধবা স্ত্রীলোকের চিহ্ন। রাজস্থানের শাহাপুর গ্রামে কোনও লোক যদি কোনও অনূঢ়া মেয়ের কাছ থেকে জল (পানি) চায়, এবং সেই মেয়ে যদি তাকে জল দেয়, তাহলে তাকে সেই মেয়েকে বিবাহ (পাণিগ্রহণ) করতে হয়। আবার আদিবাসীদের মধ্যেও নানারকম বিবাহ প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রেও উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন সাদৃশ্য নেই। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে কোন কোন উপজাতির মধ্যে বিধবা শাশুড়ী ও বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করার রীতি আছে। কেরলের নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বহুপতিক বিবাহ দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলসমূহে দৃষ্ট হয়। অন্যত্র কিন্তু তা দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও জায়গায় আছে 'দেবরণ' প্রথা। এ-ছাড়া, বিবাহে মাঙ্গলিক আচার (যাকে আমরা স্ত্রী-আচার বলি) তা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের। এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

আদর্শ সাধ্বী রমণী সম্বন্ধেও আমরা উত্তর ভারতের সঙ্গে প্রাচ্য-ভারতের প্রভেদ লক্ষ্য করি। উত্তর ভারতের আদর্শ সাধ্বী রমণী হচ্ছে সীতা, সাবিত্রী ও শৈব্যা। এদের তিনজনের কারোরই চরিত্রে কোন-

রূপ কালিমা নেই। কিন্তু প্রাচ্যভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের মেয়েদের কাছে নিত্যস্মরণীয়া হচ্ছে পঞ্চকন্যা। এই পঞ্চকন্যা হচ্ছে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী। কিন্তু এদের সকলের চরিত্রই কোন-না-কোন রূপে দুষ্ট।

উত্তরাধিকার সম্পর্কেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিধান আছে। উত্তর ভারতে উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় মিতাক্ষরা বিধান দ্বারা। বাঙলাদেশে এটা নিয়ন্ত্রিত হয় দায়ভাগ বিধান দ্বারা। দক্ষিণ ভারতে মরুমক্কতয়ম বিধান প্রচলিত আছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আমরা নানারূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। দুর্গাপূজা, দশেরা, দীপাবলী, দেওয়ালী, হোলি, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলিকে আমরা জাতীয় উৎসব বলি। কিন্তু এগুলির অনুষ্ঠানের রূপ ও সময়-কাল দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। যদিও বাঙালীরা আজ যেখানেই গেছে, সেখানেই দুর্গাপূজা করছে, তা হলেও মূলগত-ভাবে এটা বাঙলাদেশেরই উৎসব। দশেরা উৎসবকে দুর্গাপূজার সম-গোত্রে ফেলা হয়, কিন্তু যাঁরা এই উৎসব দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মূলগতভাবে এটা স্বতন্ত্র উৎসব, যদিও দুই উৎসবই সমকালে অনুষ্ঠিত হয়। আবার দেখা যাবে যে, উত্তর ভারতের দশেরা উৎসবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে পালিত দশেরা উৎসবের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বস্তুত হিন্দুর এসব উৎসবের রূপ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। আবার উৎসব-পালনের সময়কালও ভিন্ন। যেমন বাঙলাদেশে হোলি বা দোলযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমার সূচনায় অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনই বাঙলার জনগণ পরস্পরের গায়ে রঙ দেয়। কিন্তু বিহার থেকে আরম্ভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে পূর্ণিমা ছাড়বার সময় বা পরদিনই রঙ দেওয়া হয়। উৎসবের মর্যাদার দিক থেকেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে দুর্গোৎসব। কিন্তু সংলগ্ন বিহারপ্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্তিকী ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত

'ছট্' পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উত্তর ভারতে দশেরার তুলনায় 'হোলি'ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ উৎসব। পশ্চিম ভারতে 'দীপাবলী'ই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ তো গেল 'সমষ্টি'র ব্যাপার। 'ব্যষ্টি'র দিক থেকেও ধর্মীয় বিভেদ অসাধারণ। কেউ বৈষ্ণব, কেউ সৌর, কেউ গাণপত্য, কেউ শৈব, কেউ শাক্ত, কেউ লিঙ্গায়েত, কেউ তান্ত্রিক ইত্যাদি। আবার এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও অসংখ্য সম্প্রদায় আছে।

এক কথায়, ভারত সর্ববিষয়েই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দেশ। কিন্তু এই বিভেদ ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে দেখি এক সাধারণ ধারা, যে ধারা রূপ দিয়েছে হিন্দুসভ্যতাকে। হিন্দুসভ্যতাকে 'হিন্দুধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' বলা হয়। এই সনাতন ধর্মের ধ্যানই হিন্দুসভ্যতাকে তার সংহতি দান করেছে। সেজন্যই এত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি হিন্দুসভ্যতার এক ঐক্য-রূপ। নানা খাতে প্রবাহিত হয়ে, আমাদের কৃষ্টি হিন্দুসভ্যতার মহাসমুদ্রে পড়ে ঐক্যলাভ করেছে। এটাই ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ভারতবর্ষের চিরদিনই এক-মাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।'

পরিবার গঠন ও বিবাহ প্রথা

সমাজের সবচেয়ে ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে 'পরিবার'। পরিবার বলতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা স্থায়ী যৌন-সম্পর্ক বুঝি। মানুষ তার আবির্ভাবের দিন থেকেই 'পরিবার' গঠন করে বাস করছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্, যথা বাখোফেন, মরগ্যান প্রমুখেরা এ-কথা স্বীকার করতেন না। তাঁরা বলতেন যে, বিবাহপ্রথা উদ্ভব হবার পূর্বে মানুষের মধ্যে কোনরূপ স্থায়ী যৌনসম্পর্ক ছিল না। তাঁরা বলতেন যে, বিবাহপ্রথা উদ্ভবের পূর্বে, অন্যান্য পশুর মত মানুষও অবাধ যৌনমিলনে (promiscuity) প্রবৃত্ত হত। তাঁদের মতে আদিম অবস্থায় মানুষের মধ্যে যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অনুশাসন ছিল না। তাঁরা বলতেন যে অনুশাসনের উদ্ভব হয়েছিল অতি মন্থরগতিতে, ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে। কিন্তু সন্তানকে লালন-পালন ও স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য মানুষের যে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীবজনিত কারণই এ-কথা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক যে মনুষ্যসমাজে গোড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনমিলন ছিল না এবং তারা একত্রেই বসবাস করত। এর বিরোধী মতবাদ বস্তুত পূর্বোক্ত নৃতত্ত্ববিদ্গণের এক নিছক কল্পনামূলক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অবাধ যৌনমিলন ও স্ত্রী-পুরুষের বিচ্ছিন্ন বসবাস মনুষ্যসমাজে কোনদিনই প্রচলিত ছিল না। এমনকি বর্তমান সময়েও অত্যন্ত আদিম অবস্থায় অবস্থিত অরণ্যবাসী জাতি-সমূহের মধ্যেও নেই। এ-সকল জাতির মধ্যে যে-সকল বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তা অতি কঠোর অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা এর সমর্থন পাই। বনমানুষ, গেরিলা প্রভৃতি যেসকল নরাকার জীব আছে, তারাও দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে বাস করে। কখনও অবাধরমণে প্রবৃত্ত হয় না। এইসকল কারণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'বিবাহ' আখ্যা দিয়ে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, স্ত্রী-পুরুষ একত্রে মিলিত হয়ে 'পরিবার' গঠন করে একসঙ্গে বাস করার রীতি মনুষ্যসমাজে গোড়া থেকেই ছিল। এ সম্পর্কে মহাভারতে বিবৃত শ্বেতকেতু কাহিনী বিশেষ আলোকপাত করে। (লেখকের 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', তৃতীয় আনন্দ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২-১৩ দ্রঃ)।

আদিম মানবের 'পরিবার' ছিল অনেকটা পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল যেরকম পরিবার (family units) দেখতে পাওয়া যায়, তারই মত। পিতা-মাতা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়েই এই পরিবার গঠিত হত। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবার ছিল অন্যরকমের। এ পরিবার ছিল অধিকতর বিস্তৃত (extended or joint family)। এ-ছাড়া, পাশ্চাত্য দেশের পরিবারের সঙ্গে ভারতের পরিবারের এক মূলগত পার্থক্য ছিল। ভারতের পরিবার ছিল অবিচ্ছেদ্য (inalienable)। একমাত্র যমরাজা বিচ্ছেদ না ঘটালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হত না। তার কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce) প্রথা ছিল না। ভারতের পরিবার ছিল স্থায়ী পরিবার। এর পরিধি ছিল অতিবিস্তৃত। এজন্য একে 'যৌথ' বা 'একান্নবর্তী' পরিবার বলা হত। এই পরিবারের মধ্যে বাস করত কোনও ব্যক্তি স্বয়ং ও তার স্ত্রী, তার বাবা-মা, খুড়ো-খুড়ী, জেঠা-জেঠী, তাদের সকলের ছেলে-মেয়েরা, তার ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা ও ছেলে-মেয়েরা ও নিজের ছেলেমেয়েরা। অনেকসময় এই পরিবারভুক্ত হয়ে আরও থাকত কোন বিধবা পিসি বা বোন বা অন্য কোন দুঃস্থ আত্মীয় ও আত্মীয়া। যোগাযোগ ও পরিবহণের সুবিধা হবার পর মানুষ যখন কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস শুরু করল, তখন থেকেই ভারতের এই সনাতন পরিবারের ভাঙন ঘটল। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩)। এখন

ছেলেরা মা-বাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এক ছেলে থাকে চন্দননগরে, আর এক ছেলে থাকে চেতলায়, আর এক ছেলে সিঁথিতে ও আরও এক ছেলে দিল্লিতে। আবার অনেক সময় বাপ-মা থাকে কলকাতায়, আর তাদের ছেলেমেয়েরা থাকে বিদেশে, আমেরিকা বা বিলাতে। এক কথায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের সনাতন পদ্ধতিতে গঠিত যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়েছে, এবং পরিবার এখন তার আদিম রূপ পেয়েছে। বর্তমানে সরকার যে-সব 'হাউসিং এস্টেট' তৈরি করছেন, সে-সব হাউসিং এস্টেটের ফ্লাটগুলিও এ-রকম পরিবারের বাসোপযোগী করেই তৈরি করা হচ্ছে।

একই রকমের পরিবার ভারতের সর্বত্র দেখা যায় না। উপরে যে পরিবারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই এই বর্গের পরিবার দেখা যায়। পিতৃ-কেন্দ্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরূপ পরিবারে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় পিতা, পুত্র ও পৌত্রের মাধ্যমে। এক কথায়, এরূপ পরিবার বংশপরম্পরায় নেমে আসে পুরুষের দিক দিয়ে। সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে যে পরিবার গঠিত হয়, তাকে মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার বলা হয়। এরূপ পরিবার আসাম ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন জায়গায় পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ পরিবারে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় মেয়েদের দিক দিয়ে—মাতা, কন্যা, দৌহিত্রী ইত্যাদির মাধ্যমে। মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার গঠিত হয় স্ত্রীলোক স্বয়ং, তার ভ্রাতা ও ভগিনী এবং ভগিনীদের সন্তান-সন্ততি-দের নিয়ে। পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিবাহের পর স্ত্রী এসে বাস করে তার স্বামীর গৃহে। কিন্তু মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে এরূপ ঘটে না। এরূপ পরিবারের কোন স্ত্রীলোক বিবাহের পর স্বামী-গৃহে গিয়ে বাস করে না। স্ত্রীলোকদিগের স্বামীরা অন্য পরিবারে বাস করে। স্ত্রীলোকদের স্বামীরা মাত্র সময় সময় (বিশেষ করে রাত্রিকালে) স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আসা-যাওয়া করে। তার মানে, পিতৃ-

কেন্দ্রিক পরিবারে স্ত্রী স্বামীর ও সন্তানরা পিতার সাহচর্য পায়, কিন্তু মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে তা পায় না। সেখানে স্ত্রীলোকের সন্তানরা মাতুলের সাহচর্য পায়।

আসামে গারো, খাসি, সিনটেঙ ও অন্যান্য কয়েকটি উপজাতির মধ্যে মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দলপতি পুরুষ হয় বটে, কিন্তু তার উত্তরাধিকারী তার নিজ সন্তান হয় না। উত্তরাধিকারী হয় তার ভগিনীর সন্তান। আগেই বলেছি, এরূপ পরিবারে পুরুষের স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে বাস করতে আসে না। সে তার মায়ের পরিবারে মায়ের সঙ্গেই বাস করে। তার স্বামী মাত্র রাত্রিকালে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আসে। তবে দু-একটি সন্তান জন্মাবার পর, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে স্বতন্ত্র গৃহস্থালি স্থাপন করতে পারে, কিন্তু নিজ পরিবার থেকে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে তার অর্জিত সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা-স্বত্ব তার মায়ের উত্তরাধিকারিণীতেই বর্তায়। মাত্র স্বতন্ত্র গৃহস্থালি স্থাপনের পর যে সম্পত্তি সে অর্জন করে, সে সম্পত্তিই তার স্ত্রী ও তার মেয়েরা পায়। কনিষ্ঠা মেয়েই সবচেয়ে বেশি অংশ পায়। যদি তার নিজের কোন মেয়ে না থাকে, তা হলে অপর কোন পরিবার থেকে সে কোন মেয়েকে দত্তক নেয় এবং সেই দত্তক মেয়েই তার সম্পত্তি পায়। এক কথায়, আসামের এইসকল উপজাতির মধ্যে বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার মেয়েদের ধরেই নেমে আসে। তবে কতকগুলি উপজাতির মধ্যে পিতৃকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক প্রথার সমন্বয় বা সংক্রমণ (transition) দেখতে পাওয়া যায়; যেমন রাভাদের মধ্যে বংশপরিচয় মাতৃগত, কিন্তু উত্তরাধিকার পিতৃগত। আবার উত্তর কাছাড় পাহাড়ের কাছাড়ীদের মধ্যে বংশপরিচয় ছেলে-দের বেলায় পিতৃগত, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মাতৃগত।

দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জাতির মধ্যে মাতৃগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে। কানাড়ীদের মধ্যে এই প্রথাকে 'অলিয়সান্তন' বলা

হয়। মালয়ালীদের মধ্যে একে বলা হয় 'মরুমক্কথয়ম'। যে-সকল জাতির মধ্যে এই প্রথার প্রচলন আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অগস, বানট, বেল্লর, বসবি, দেবদিগ, গট্টি, গুরুক্কল, ইঝব, যোগিপুরুষ, কেলসি, কোয়েল তাম্পুরন, মালয়ালী ক্ষত্রিয়, কুডন, কুরুব, মালক্কর, মান্নন, মোগর, মুড়ুবর, নায়ার, পল্লন, পিশারোটি, সামন্তন, তিরুবল্লন, টিয়ান, উরলি, ওয়াইনড এবং আংশিকভাবে চালিয়ান, গুডিগারা, হোলেয়া, কৃষ্ণ বক্ককর, কুডুমি, কুরিচন, ইডিহব, মল অরয়ন, মপিল্ল, মুক্কুবন, নামপুরিরি ব্রাহ্মণ, পড়ুবল, উন্নি, বরাইয়ার ও ভেলুটেড্ডন। উভয় প্রথা মিশ্রিতভাবে প্রচলিত আছে নানচিনাভ, বেল্লল ও নট্ট কোট্টাই চেট্টিদের মধ্যে। উপরে যে-সকল জাতির নাম করা হল, এদের অধিকাংশই মালাবার উপকূলের অধিবাসী। কিন্তু মালাবার উপকূলের বহির্ভূত অঞ্চলেও উপরি-উক্ত মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, যেমন মাদুরার পল্লনদের মধ্যে ও ত্রিবাঙ্কুরের উরলিদের মধ্যে। যদিও দক্ষিণ কানাড়ায় এই প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কানাড়ার অন্যান্য জেলায় এই প্রথা খুব বিরল। এ প্রসঙ্গে সবসময় মনে রাখতে হবে যে উত্তরাধিকার যেখানে মাতৃগত, সেখানে মেয়েরা বিবাহের পর মায়ের বাড়িতেই থাকে, এবং তাদের সন্তানসন্ততি মায়ের বংশের নামেই পরিচিত হয়। এ সম্বন্ধে আরও বলবার কথা আছে, সে-সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব।

পরিবার সম্বন্ধে বলতে-বলতেই আমরা উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলাম। এখন আমাদের আবার পরিবার প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। ভারতে দু-রকমের সমাজব্যবস্থা দেখা যায়। আদিবাসীর সমাজব্যবস্থা ও হিন্দুর সমাজব্যবস্থা। উভয়প্রকার সমাজব্যবস্থাতেই পরিবার হচ্ছে ন্যূনতম সামাজিক সংস্থা। আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় একটি গোষ্ঠী বা দল। আবার কয়েকটি গোষ্ঠী বা দলের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় একটি উপজাতি বা 'ট্রাইব'। হিন্দুদের

মধ্যে ট্রাইবের পরিবর্তে আছে বর্ণ বা জাতি। এগুলির আবার অনেক শাখা ও উপশাখা আছে।

হিন্দুর জাতি-ই বলুন, আর আদিবাসীর ট্রাইব ই বলুন, এগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তর্বিবাহ (endogamy)। তার মানে, কেউ নিজ জাতি বা ট্রাইবের বাইরে বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ করতে হলে জাতি বা ট্রাইবের মধ্যেই বিবাহ করতে হবে। তবে জাতি বা ট্রাইবের মধ্যে যে-কোন পুরুষ যে-কোন মেয়েকে অবাধে বিয়ে করতে পারে না। এ-সম্বন্ধে উভয় সমাজেই খুব সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জাতি বা ট্রাইবগুলি কতকগুলি গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত। এইসকল গোষ্ঠী বা দলগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহি-র্বিবাহ (exogamy)। তার মানে কোন গোষ্ঠীর কোনও ছেলে যদি বিয়ে করতে চায় তবে তাকে বিয়ে করতে হবে অন্য কোন গোষ্ঠী বা দলের মেয়েকে, নিজের গোষ্ঠীতে বা দলে নয়। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে নিজের জাতির বা ট্রাইবের মধ্যেই বিবাহ করতে হবে, কিন্তু নিজের গোষ্ঠীতে বা দলের মধ্যে নয়। এ নিয়ম না মানলে কিছুকাল আগে পর্যন্ত সে-পরিবারকে 'একঘরে' হয়ে থাকতে হত এবং আগেকার দিনে 'একঘরে' হয়ে থাকাটা এক ভয়াবহ শাস্তি ছিল। কেননা, তার যে মাত্র ধোবা-নাপিত-পুরোহিত বন্ধ হয়ে যেত তা নয়, তার বাড়িতে আনুষ্ঠানিক কাজকর্মে কেউ খেত না এবং সে পরিবারে কেউ ছেলেমেয়ের বিবাহও দিত না, বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে ডাকাও হত না।

হিন্দুদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় গোত্র-প্রবর দ্বারা, আর আদিবাসী সমাজে এগুলি চিহ্নিত হয় সাধারণত 'টটেম' দ্বারা। 'টটেম' বলতে গোষ্ঠীর রক্ষকস্বরূপ কোন শুভসাধক পরমাত্মাকে বোঝায়। এই পরমাত্মা কোন বৃক্ষ, প্রাণী বা জড়পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। আদিবাসীদের বিশ্বাস যে গোষ্ঠীসমূহের উৎপত্তি হয়েছে এই-

সকল বিশেষ প্রাণী, বৃক্ষ বা জড়পদার্থ থেকে। যে প্রাণী বা বৃক্ষ, যে গোষ্ঠীর 'টটেম', তাকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করে। কখনও তাকে বিনাশ করে না। সেই প্রাণীর মাংস বা সেই বৃক্ষের ফল কখনও খায় না।

একই টটেমের ছেলেমেয়েরা কখনও পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে না। বিয়ে করতে হলে তাদের ভিন্ন টটেমে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু আদিবাসী সমাজে সব জায়গাতেই যে বহির্বিবাহের বিধি টটেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা নয়। কোনও কোনও জায়গায় এগুলি আরাধনা-পদ্ধতির ওপর স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডজাতির কোনও কোনও শাখার মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে 'বংশ' বলা হয়। যে বংশ যত-সংখ্যক দেবদেবীর পূজা করে, সেই সংখ্যার দ্বারাই সে-বংশ চিহ্নিত হয়। দুই বংশের দেবদেবীর সংখ্যা যদি সমান হয়, তা হলে তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। মনে করুন, যে বংশ সাতটি দেবদেবীর পূজা করে তাদের ছেলেমেয়েকে বিবাহ করতে হলে, সাত ছাড়া অন্যসংখ্যক দেবদেবীতে পূজারত বংশে বিয়ে করতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি গ্রাম বা অঞ্চল ভিত্তিতেও চিহ্নিত হয়। যেমন ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতির মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, নিজের গ্রামে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। ওড়িশার খণ্ডজাতির মধ্যেও অনুরূপ নিয়ম আছে। খণ্ডজাতিদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে 'গোচী' বলা হয়। গোষ্ঠীগুলি এক-একটা 'মুতা' বা গ্রামের নামানুসারে চিহ্নিত হয়। তাদের এই বিশ্বাস যে, এক গোষ্ঠীর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং এই কারণে তাদের মধ্যে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং তাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ হতে পারে না, হলে 'অজাচার' হবে। নাগাল্যাণ্ডের অনেক জাতির মধ্যেও এইরূপ গ্রাম-ভিত্তিক বহির্বিবাহ গোষ্ঠী আছে। সেগুলিকে সেখানে 'খেল' বলা হয়। বলা বাহুল্য, কেউ নিজের খেল-এর মধ্যে বিবাহ করতে পারে না। বরোদার কোলিজাতির মধ্যেও নিজ গ্রামে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এ-

সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা গ্রামক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে 'ক' গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয় 'খ' গ্রামের ছেলের সঙ্গে, আবার এরূপ ক্রমে 'খ' গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয় 'গ' গ্রামের ছেলের সঙ্গে। বরোদার হিন্দুদের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় গ্রাম অনুযায়ী বহির্বিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে রাজপুত ও লেওয়া কুর্মীরা কখনও নিজ গ্রামে বিয়ে করে না। আবার দক্ষিণ ভারতের তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর বিপরীত প্রথা দেখা যায়। সেখানে কিছুকাল আগে পর্যন্ত নিজ গ্রাম ছাড়া অপর গ্রামে কেহ বিবাহ করতে পারত না। সেজন্যই তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম নামটা গ্রামের নামে হয়। তাতে সহজেই বুঝতে পারা যায় সে কোন্ গ্রামের লোক।

আদিবাসী জীবনের ওপর যেখানে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারিত হয়েছে, সেখানে এগুলিকে 'গোত' বা 'গোত্র' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই গোত বা গোত্রগুলি টটেম-ভিত্তিক। মধ্যভারতের গোণ্ডসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত গোত্রগুলি হচ্ছে: 'মারকাম', 'টেকম', 'নৈতাম' ইত্যাদি। 'মারকাম' শব্দের অর্থ হচ্ছে আম, 'টেকম'-এর অর্থ হচ্ছে সেগুন (মালয়ালম শব্দ 'টেক্ক' থেকেই 'সেগুন' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'teak' উৎপন্ন হয়েছে) ও 'নৈতাম'-এর অর্থ হচ্ছে 'কুকুর'। গোত্রের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এসকল সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সগোত্রে বিবাহ করলে দণ্ড পেতে হয়। হিন্দুদের মত এ-সকল সমাজে বিবাহের পর পুরুষদের গোত্র অপরিবর্তিত থাকে, কেবল বিবাহের পর মেয়েদের গোত্রেরই পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুসমাজের সপিণ্ড বিধানের মত, আদিবাসীদের মধ্যেও অনেক স্থানে আবার পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে নির্দিষ্ট পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ আছে; যেমন উত্তর-প্রদেশের ভানটুদের মধ্যে বিবাহের জন্য মাতামহীর কুলে দুই পুরুষ বর্জন করার বিধি আছে। মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যেও মাতৃকুলে দুই পুরুষ বর্জন করার রীতি আছে। এ ছাড়া, তারা পিতামহীর ও

মাতামহীর কুলেও তিন পুরুষ বর্জন করে।

ভীলেরা ৪১টি বহির্বিবাহের দলে বিভক্ত এবং সেগুলি সবই টোটেম-ভিত্তিক। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও মাণ্ডালা অঞ্চলের বাইগা জাতির লোকেরা অনেকগুলি অন্তর্বিবাহের শাখায় বিভক্ত। প্রতিটি শাখা আবার অনেকগুলি বহির্বিবাহের দলে বিভক্ত। এখানে প্রত্যেক লোককেই নিজ শাখার মধ্যে বিবাহ করতে হয়। মাত্র তাই নয়, তাদের এমন দলে বিবাহ করতে হয়, যে-দল তাদের মত একই দেবদেবীর পূজা করে। অনেকস্থলে আবার কৌলীন্যপ্রথাও (পরে দেখুন) প্রচলিত আছে। যেমন মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডজাতির মধ্যে দুটি বিভাগ আছে— (১) রাজগোণ্ড ও (২) ধরগোণ্ড। ধরগোণ্ডের পিতারা রাজগোণ্ডে মেয়ে দান করে না।

বস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যে দলের যে-সমস্ত লোক পরস্পরের সহিত 'দাদাভাই' সূত্রে আবদ্ধ তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। কিন্তু অপর যে-দল তাদের সঙ্গে 'মামাভাই' সূত্রে আবদ্ধ মাত্র তাদের সঙ্গেই বিবাহ হয়।

মধ্যপ্রদেশের কোলজাতিরা অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত। এইসকল শাখাগুলিকে 'কুরি' বলা হয়। এদের মধ্যেও কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। কুরিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হচ্ছে রাউতিয়ারা। রাউতিয়ারা কখনও পরবর্তী ঠাকুরিয়া কুরিতে কন্যাদান করে না। কিন্তু ঠাকুরিয়া কুরি থেকে মেয়ে নিতে তাদের কোন আপত্তি নেই। রাউতিয়ারা রাউনতেল কুরি থেকেও মেয়ে নেয়। কিন্তু তাদের কখনও মেয়ে দেয় না। কাঠাওটিয়া নামে আর একটি কুরি ঠাকুরিয়াদের কুরি থেকে মেয়ে নেয়। কিন্তু কখনও মেয়ে দেয় না। তবে এক্ষেত্রে কাঠাওটিয়ারা মেয়েটিকে সাধারণত 'রক্ষিতা' হিসাবে রাখে, 'পরিণীতা' হিসাবে নয়। তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোলদের মধ্যে কুরিগুলি হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী, বহির্বিবাহের গোষ্ঠী নয়। মাত্র

কৌলীন্যপ্রথার জন্য এগুলি কোন কোন স্থলে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীর রূপ পেয়েছে। যেহেতু কুরিগুলির মধ্যে কোন গোত্রবিভাগ নেই সেহেতু অনুমান করা যেতে পারে যে, কোলদের মধ্যে বিবাহ সগোত্রেই হয়। তবে যেখানে কৌলীন্যপ্রথা অবলম্বিত হয়, মাত্র সেখানেই সগোত্রে বিবাহ বর্জিত হয়। তবে কোলদের মধ্যে এমন অনেক স্মারক-চিহ্ন আছে যা থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে, কোলদের মধ্যে বিবাহ একসময় গ্রামভিত্তিক ছিল।

সাঁওতালদের মধ্যে একসময় ১২টি বহির্বিবাহের গোষ্ঠী ছিল। এ ১২টি গোষ্ঠী হচ্ছে—কিসকু, মাণ্ডী, মুরমু, হেমব্রম, হাঁসদা, সরেন, বাস্‌কে, বেশরা, টুডু, চঁড়ে, পাউরিয়া ও বেডেয়া। এর মধ্যে একটি এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে মাত্র ১১টি গোষ্ঠী আছে। এগুলি সবই বহির্বিবাহের গোষ্ঠী। এইসকল গোষ্ঠী বা গোত্রগুলিকে 'পারিস্‌' (সাওতালী ভাষায় উচ্চারণ 'পাৗরিস') বলা হয়। তবে এদের মধ্যে কিসকু বা মুরমু গোষ্ঠীর মর্যাদা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক উচ্চ। এছাড়া মানভূমের কোন কোন জায়গায় ধর্মের ভিত্তিতে সাঁওতালরা দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। এ-দুটির নাম 'দেশওয়ালী' ও 'খোৗরা'। দেশওয়ালীরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। আর খোৗরারা জড়োপাসনার ওপর বিশ্বাস রাখে। দেশওয়ালীদের সঙ্গে খোৗরাদের কখনও বিবাহ হয় না।

সাঁওতাল সমাজে তিন রকমের বিবাহ চলিত আছে ; যথা,—(১) 'ঘটকালী' পদ্ধতির বিবাহ, (২) 'সিঁদুর-ঘষা' বিবাহ ও (৩) 'নিরবোলক' পদ্ধতির বিবাহ। সিঁদুর-ঘষা বিবাহে, যদি কোন পুরুষ বাজার-হাট বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দেয়, তাহলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয়। আর নিরবোলক পদ্ধতির বিবাহে মেয়ে তার পছন্দমত ছেলের বাড়িতে গিয়ে গায়ের জোরে থাকতে শুরু করে।

রাঁচী জেলার ওরাঁওদের মধ্যে বহির্বিবাহের জন্য যে গোত্রবিভাগ আছে সেগুলিকেও 'পারিস্' বলা হয়। পারিস্গুলি টোটেম-ভিত্তিক। এক পারিসের ছেলেকে অপর কোনও পারিসের মেয়েকে বিবাহ করতে হয়। নিজ পারিসে কখনও বিবাহ করতে পারে না। গডাবা উপজাতির মধ্যেও গোত্রবিভাগকে 'পারিস্' বলা হয়। একই পারিস্-মধ্যে তারা কখনও বিবাহ করতে পারে না। এমন-কি পারিসের মধ্যে ব্যভিচারও গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মানভূমের খরিয়ারাও দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত— (১) 'শবর খরিয়া' ও (২) 'পাহাড়িয়া খরিয়া'। এক শাখার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কখনও অপর শাখার ছেলেমেয়ের বিবাহ হয় না। তবে এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মর্যাদামূলক বিভেদ নেই। খরিয়াদের বিশ্বাস তারা রামায়ণ-বর্ণিত বানররাজ অঙ্গদ-এর বংশধর।

ওড়িশার কোরাপুট জেলার পরোজাদের মধ্যেও বহির্বিবাহের জন্য গোত্রবিভাগ দেখা যায়। ওড়িশার পারলাকিমেদির শবরদের মধ্যেও গোত্রবিভাগ আছে। তবে এসকল ক্ষেত্রে গোত্রগুলি টোটেম-ভিত্তিক নয়, গ্রামভিত্তিক। তার মানে, একই গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। এক গ্রামের মেয়েকে বিবাহ করতে হয় অপর গ্রামের ছেলেকে। তাদের বিশ্বাস এই যে একই গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পর ভাই-বোন। সেইহেতু তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। তবে কোন নবাগন্তক এসে যদি গ্রামের মধ্যে বাস করে—তার সঙ্গে তারা গ্রামের মেয়ের বিয়ে দেয়। তামিলনাড়ুর উপজাতিদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি হয় টোটেম-ভিত্তিক, আর তা নয়তো গ্রামভিত্তিক। কোচিনের কাদার উপজাতির মধ্যে যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীসমূহ আছে সেগুলি সবই গ্রামভিত্তিক। সেখানে তারা একই গ্রামের মধ্যে কখনও ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের উপজাতিসমূহের মধ্যেও বহির্বিবাহের গোষ্ঠী আছে।

এগুলি দলভিত্তিক (clans)। কিন্তু পাহাড়িয়া পাণ্ডারামদের মধ্যে কোন দলবিভাগ নেই। তাদের মধ্যে তিন-চারটি করে পরিবার নিয়ে এক একটি বহির্বিভাগের গোষ্ঠী গঠিত হয়। তবে এসকল গোষ্ঠীর কোন স্বতন্ত্র নাম নেই।

ত্রিবান্দ্রমের কানিকাররা চারটি দলে বিভক্ত। এই চারটি দলের নাম হচ্ছে— (১) মুট্র-ইলোম, (২) মেন্-ইলোম (৩) কায়-ইলোম এবং (৪) পাল্-ইলোম। 'ইলোম' শব্দের অর্থ হচ্ছে গোত্র। এদের মধ্যে মুট্র-ইলোম ও মেন্-ইলোম দল নিজেদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। এই দুটি দলের মধ্যে এক দলের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অপর দলের ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়, কিন্তু অপর দুটি দলের সঙ্গে এদের কোন বৈবাহিক আদান-প্রদান নেই, তবে এক্ষেত্রে চারটি দলেরই বহি-বিবাহের গোষ্ঠী আছে এবং বিবাহের সময় তারা নিজেদের গোষ্ঠী বর্জন করে। ত্রিবান্দ্রমের আর এক জায়গায় কানকাররা দুটি শাখায় বিভক্ত —(১) অন্নন্থাম্বি ও (২) মাচাম্বি। অন্নন্থাম্বিরা মেন্-ইল্লোম্, পেরিন্-ইল্লোম ও কায়-ইল্লোম দলে বিভক্ত। আর মাচাম্বিরা বিভক্ত মুট-ইল্লোম, বেলানট-ইল্লোম ও কুরু-ইল্লোম দলে। এদের মধ্যে এক দলের ছেলের সঙ্গে কখনও অপর দলের মেয়ের বিবাহ হয় না। একসময় এদের মধ্যে যে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের প্রচলন ছিল তা তাদের সন্তান-দের দলভুক্তি থেকে বোঝা যায়। যেমন কুরু-ইল্লোম দলের স্বামীর ঔরসে পেরিন-ইল্লোম দল থেকে আনীত স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হয়, সে মাতার দলভুক্ত হয়, কখনও পিতার দলের লোক বলে পরিচিত হয় না। ত্রিবাঙ্কুরের মল-আরায়নদের মধ্যেও সন্তান মাতার দলভুক্ত হয়, কখনও পিতার দলভুক্ত হয় না এবং সন্তান মাতারই কুল পায়। উরালীদের মধ্যেও সন্তান মায়েরই কুল পায়, পিতার নয়। মান্নানদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত।

আসামের উপজাতিসমূহ মঙ্গোলীয় মানবশাখার অন্তর্ভুক্ত। প্রধান

উপজাতিসমূহ হচ্ছে খাসি, মিরি, লালুঙ, মিকির, গারো, কাছাড়ি ও লাখের। এদের মধ্যে পিতৃকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক উভয় বর্গেরই সমাজ প্রচলিত আছে। খাসিয়ারা মাতৃকেন্দ্রিক। তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত। আবার প্রতি শাখার মধ্যে অসংখ্য বহির্বিবাহের দল ও উপদল আছে। আসামের মিকির জাতির সমাজব্যবস্থা পিতৃকেন্দ্রিক। এরা পাঁচটা দলে (clans) বিভক্ত; যথা—(১) টেরন, (২) এংগি, (৩) বি বা কোটেরাঙ, (৪) ইনঘি ও (৫) টিমুঙ। প্রতি দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল (sub-groups) আছে। মাত্র উপদলগুলিই বহির্বিবাহের দল হিসাবে ক্রিয়াশীল। দলের (clan) মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। কেননা, তাদের বিশ্বাস যে, দলের সকলেই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং সেই কারণে তারা পরস্পর ভাই-বোন। এই কারণে তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। লাখেরদের মধ্যে কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তারা ইচ্ছামত দলের বাইরে এবং ভেতরে বিবাহ করতে পারে। কাছাড়ের পাহাড়ী জাতিরা ২০টি দলে বিভক্ত। এদের ৭টি দলকে 'পুরুষ' দল বলা হয়, আর ১৩টিকে বলা হয় 'মেয়ে' দল। এদের মধ্যে ছেলেরা কখনও মায়ের দলে এবং মেয়েরা কখনও বাপের দলে বিয়ে করতে পারে না। উত্তর কাছাড়ের কুকীরা ৪টি দলে বিভক্ত। এখানে দলগুলি অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কার্যকর থাকলেও এক দলের ছেলের সঙ্গে অপর দলের মেয়ের বিবাহ বিরল নয়। যেখানে এরূপ দলের বাইরে বিবাহ হয়, সেখানে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর দলাখ্যা পায়। কিন্তু খেলমা কুকীদের মধ্যে স্বতন্ত্র নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এখানে দলগুলি অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে ক্রিয়া করে। অনেকসময় এক দলের সঙ্গে অপর দলের ছেলেমেয়েদের বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এরূপ বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয় এবং যেক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ হয় সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি করার অধিকার পায় না। এ-কারণে প্রতি পরিবারেরই লক্ষ্য থাকে যে পিতামাতার শ্রাদ্ধাদির জন্য পরিবারের

অন্তত একজন যেন নিজ দলে বিবাহ করে। তবে এদের মধ্যে দলবহির্ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী কখনও স্বামীর দলাখ্যা পায় না।

আদিবাসীদের সমাজ সংগঠনের যে সমীক্ষা এই অধ্যায়ে দেওয়া হল, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আদিবাসী সমাজে বহির্বিবাহ (exogamy) সাধারণভাবে প্রচলিত। আদিবাসীদের মধ্যে বহি-বিবাহের গোষ্ঠীগুলি টোটেম-ভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক অথবা যে ধরনেরই হোক না কেন, তাদের বিশ্বাস যে বহির্বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক হচ্ছে ভাইবোনের সম্পর্ক এবং সেই কারণে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহ হতে পারে না। আদিবাসীরা কেন নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে না, সে-সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন করলে তাদের কাছ থেকে নিয়ত এই উত্তরই পাওয়া যায়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, জগতের সর্বত্র পরিবার-ই বহির্বিবাহের ন্যূনতম সংস্থা হিসাবে ক্রিয়া করে। কেননা পারবার-মধ্যে যৌনমিলন অজাচারস্বরূপ গণ্য হয়। নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে পরিবারের মধ্যে যৌনাচার সম্পর্কে যে অলঙ্ঘনীয় বিধিনিষেধ আছে তা থেকেই দলগত বা গোষ্ঠীগত বহির্বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে বিবাহের জন্য যে সামাজিক সংগঠন আছে এতক্ষণ সে-সম্বন্ধেই বলা হল। এবার আদিবাসী সমাজে বিবাহের রকমফেরের কথা কিছু বলা যাক। উল্লেখনীয় যে, প্রাচীন ভারতে রাক্ষস, আসুর ইত্যাদি বিবাহপ্রথা আর্যগণ কর্তৃক আদিবাসী সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। রাক্ষসবিবাহ (marriage by capture) মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এরূপ বিবাহকে ভীলরা 'ঘিসকর্ লে জানা' বলে। তার মানে—মেয়েকে কেড়ে আনা হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত এরূপ বিবাহ সচরাচর ঘটত। এরূপ বিবাহের প্রশস্ত দিন ছিল 'ভাগোরিয়া' উৎসবের দিন। ভাগোরিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হত হোলিপর্ব উপলক্ষে 'মেড়া' পোড়ানোর

আগের দিন। সাধারণত বর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কোন গ্রামে প্রবেশ করে মেয়েটিকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসত। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকে নিয়মানুগত করে নেওয়া হত। মধ্য-প্রদেশের চান্ডা ও বস্তার জেলার গোণ্ডদের মধ্যেও পূর্বে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এরূপ বিবাহকে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য করে শাস্তি দেওয়ার ফলে আদিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে এ-সম্পর্কে এক বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেছে। এরা প্রথমে বর-কনের মধ্যে বিবাহ স্থির করে এবং পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবার সময় পূর্বকালের রীতি অনুযায়ী কনেকে কেড়ে নেবার একটা কপট অভিনয় করে মাত্র। দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুরের মুডুবনদের মধ্যেও মেয়ে কেড়ে নিয়ে এসে বিবাহের প্রচলন ছিল।

যেখানে মেয়েকে এভাবে কেড়ে নিয়ে আনা হত সেখানে এক দলের সঙ্গে অপর দলের যে দ্বন্দ্ব হত তা যে অনেকসময় চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বে পরিণত হত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ দ্বন্দ্ব পরিহারের জন্য উভয় দলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বভাবে কন্যা-বিনিময় (marriage by exchange) প্রথার উদ্ভব হয়। কন্যা-বিনিময় প্রথার পেছনে যে যুক্তি আছে তা হচ্ছে স্ত্রীলোক জননশক্তির উৎস। কোন স্ত্রীলোককে কেউ যদি দল থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তাহলে দলের জননশক্তির ভাণ্ডার হ্রাস পায়। সুতরাং কন্যা-বিনিময় দ্বারা ওই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এছাড়া উপজাতি সমাজে মেয়েরা যেহেতু নিজ শ্রম দ্বারা দলের অর্থনৈতিক উৎপাদনে সাহায্য করে সেইহেতু তারা দলের আর্থিক সম্পদস্বরূপ। বিবাহের পর কন্যা অপর দলে চলে গেলে আর্থিক সম্পদভাণ্ডারের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণ করাও কন্যা-বিনিময় প্রথার উদ্দেশ্য। কন্যা-বিনিময় প্রথা ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়িয়া পানতারাম ও উরালীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। বস্তুত উরালীদের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ বিনিময়-প্রথার ওপরই স্থাপিত। এদের সমাজে কন্যাপণ দিয়ে

স্ত্রী পাওয়া যায় না। যখন কোন যুবক বিবাহ করতে চায় তখন তাকে নিজের বোন বা অপর কোন আত্মীয়াকে অপর দলের হাতে সমর্পণ করে তবে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ বোন বা আত্মীয়াকে যে যুবতী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে-কোন বয়সের বোন বা আত্মীয়া হলেই চলে, কেবল তাকে স্ত্রীলোক হতে হবে। এই কারণে আগেকার দিনে উরালী সমাজে যে যুবকের যতগুলি বোন থাকত তার ততগুলি বিবাহ করবার সম্ভাবনা থাকত।

আর এক রকম রাক্ষসবিবাহ আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। একে বলা হয় 'সিঁদুর-ঘষা' বিবাহ। 'সিঁদুর-ঘষা' বিবাহ অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে। এটা বিশেষ করে প্রচলিত আছে আমাদের ঘরের কাছে সাঁওতাল সমাজে। এ বিবাহে পুরুষ হাটে বা বাজারে জোর করে কোন মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দেয়। সিঁদুর ঘষে দেবার পর উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে যায়। মেয়ে যদি বরকে পছন্দ না করে তাহলেও তার সঙ্গে তাকে ঘর করতে হয়। তার কারণ, 'সিঁদুর-ঘষা' মেয়েকে সাঁওতাল সমাজে আর কেউ বিবাহ করে না।

আসুরবিবাহ (marriage by purchase) রাক্ষসবিবাহেরই এক অনুকৌশল মাত্র। যে-স্থলে কোন কারণবশত কন্যা-বিনিময় করা সম্ভবপর হত না, সে-স্থলে কন্যার পরিবর্তে তার মূল্য (bride price) ধরে দেওয়া হত, যাতে অপর দল ওই পণের বিনিময়ে অপর কোন দল থেকে কন্যা ক্রয় করে দলের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে পারত। এইভাবে কন্যাপণ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। কন্যাপণ যে মাত্র টাকা-পয়সাতেই দেওয়া হয়, তা নয়। অনেকসময় কন্যাপণ অন্যরকম ভাবেও দেওয়া হয়। যেমন, শ্রমদান করে। এ-সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, পণ দিয়ে মেয়ে-কেনা ঠিক ক্রীতদাসী-কেনা বা অন্য পণ্য-কেনার মত নয়। কেননা, ক্রীতদাসী বা ক্রীত অন্য পণ্যদ্রব্য ক্রেতা আবার বেচতে পারে। কিন্তু যেখানে কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ করা হয়

সেখানে মেয়েকে আবার বেচা যায় না। বস্তুত যা কেনা হয় তা হচ্ছে কন্যার সন্তান-প্রসবিনী ক্ষমতা। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে যেখানে স্ত্রী অনুর্বরা হয়, সেখানে তাকে সহজে বিচ্ছেদ করা যায়।

আদিবাসী সমাজে কন্যাপণ প্রথা বহুবিস্তৃত। বস্তুত এমন কোন উপজাতি নেই, যাদের মধ্যে কোনও-না-কোনও ভাবে কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত নেই। কন্যাপণের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম। পূর্বে কন্যাপণ নামমাত্র পাঁচ টাকা মূল্য থেকে একশত টাকা বা তার বেশী ছিল। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ভানটুদের মধ্যে কন্যাপণের পরিমাণ ৬০ টাকা হত। মধ্যপ্রদেশে কোলজাতির মধ্যে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১২ টাকা আট আনা। বারওয়ানীর রথিয়া ভীলদের মধ্যে এর পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ টাকা। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে কন্যাপণ ছিল পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা। কোচিনের কাদারদের মধ্যে একসময় কন্যাপণ বনজ পণ্যসামগ্রী দিয়ে চুকানো হত, কিন্তু এখন তা টাকা-পয়সা দিয়ে মেটানো হয়।

অনেক উপজাতির মধ্যে বরকে কন্যাপণের পরিবর্তে শ্রমদান করতে হয়। এরূপ বিবাহে বরকে নির্দিষ্টকালের জন্য শ্বশুরবাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। এরূপ শ্রমদানের কাল সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বৎসর নির্দিষ্ট হয়। কোন কারণে যদি বিবাহ না হয়, তা হলে কন্যার পিতাকে, বর যে-সময়ের জন্য শ্রমদান করেছে সে-সময়ের নিমিত্ত প্রচলিত হারে পারিশ্রমিক অমনোনীত বরকে প্রদান করতে হয়। কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রমদান যে-সকল ক্ষেত্রে বলবৎ আছে সে-সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, কন্যার কোন ভাই থাকে না। এসকল ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, যেহেতু মেয়েটি তার বাবাকে কাজে সাহায্য করত, সেহেতু তার পিতাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বরকে শ্রমদান করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ভীলদের মধ্যে কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রমদানের প্রথা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে আগেকার দিনে

সাধারণত সাত বছর শ্রমদান করতে হত। কিন্তু বর্তমানে শ্রমদানের কাল বাড়িয়ে দিয়ে নয় বছর করা হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় যে দুই-তিন বছর শ্রমদানের পর যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। শ্রমদানের সময় যুবক-যুবতী সাধারণত স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করে। কিন্তু সাধারণত শ্রমদানের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হলে যুবক শ্বশুরালয় ত্যাগ করতে পারে না। ঝাবুয়ার পাতিয়ালদের মধ্যে শ্রমদানের নির্দিষ্ট সময় সাত বৎসর। এই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর যুবক-যুবতী স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপন করে এবং তারা যাতে স্বাধীনভাবে কৃষিকর্ম করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সাত বৎসর উত্তীর্ণ হবার আগেই যদি তারা পালিয়ে যায়, তা হলে বরকে অনুত্তীর্ণকালের জন্য আনুপাতিক হারে কন্যাপণ দিতে হয়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালা অঞ্চলের অধি-বাসী ভীল্লা উপজাতিদের মধ্যেও কন্যাপণের বিনিময়ে শ্রমদান প্রথা প্রচলিত আছে। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা কন্যাপণ দেবার প্রথা ছিল, এবং বর যদি অর্থাভাবের জন্য এই কন্যাপণ দিতে না পারত, তা হলে তাকে তিন বৎসরের জন্য শ্রমদান করতে হত। অনুরূপ প্রথা দক্ষিণ ভারতে উল্লা-টানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে সাধারণত কন্যাপণ দিয়েই কন্যা সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু বরের যদি কন্যাপণ দেবার ক্ষমতা না থাকে, তা হলে তাকে শ্রমদান করে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ শ্রমদান এড়াবার জন্য যুবক অনেক সময় যুবতীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কোন গোপন জায়গায় কিছুকাল বসবাস করে। এরূপ বসবাসের পর বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হয় এবং সমাজে তা স্বীকৃত হয়।

প্রেম করে বিবাহ করা (**love marriage**) কিংবা প্রণয়ীকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করা (**marriage by kid-napping**) উভয়ই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। তবে এরূপ বিবাহের প্রতি আদিবাসী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী খুব কটাক্ষপূর্ণ।

মধ্যপ্রদেশের ভীল্‌লা ও পাতলিয়া এই উভয় জাতির মধ্যেই প্রণয়ীকে গোপনে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করার রীতি আছে। বালাঘাট ও মাণ্ডালা অঞ্চলের বাইগাদের মধ্যে কখনও কখনও কন্যা নিজেই বর পছন্দ করে এবং পরে নিজ পিতামাতার কাছে নিজ পছন্দের কথা বলে। তা সত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বিয়ের পর মেয়েটি সাধারণত পালিয়ে আসে (elopement)। উদয়পুরের পাণ্ডোদের মধ্যে যুবক-যুবতী যদি গোপনে পালিয়ে যায় এবং ওই পুরুষের ঔরসে যদি যুবতী গর্ভবতী হয়, তা হলে সামাজিক রীতি অনুযায়ী যুবককে বাধ্য করা হয় মেয়েটিকে বিয়ে করতে। মাদুরার পালিয়ানদের মধ্যে যুবক-যুবতী যদি প্রেমে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়, তা হলে সমাজ সেটা মার্জনা করে নেয় এবং নিয়মানুগ অনুষ্ঠান দ্বারা তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়। মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির সমাজ কিন্তু এ-সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নেয়। তারা এরূপ দুর্নীতি মার্জনা করে না।

অজাচার সম্বন্ধে আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কঠোর। নিজ দল বা গোষ্ঠীর মেয়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গম অজাচার (promiscuity) বলে গণ্য হয়। মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন চার পুরুষের মধ্যে যৌনসঙ্গমও অজাচার বলে পরিগণিত হয়, এবং এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ হয় না। এটা হচ্ছে উত্তর ভারতের সাধারণ রীতি। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মাতৃকুলে বিবাহই বাঞ্ছনীয় বিবাহ (preferential marriage)। অন্ধ্রপ্রদেশের মহবুবনগরের চেন্‌চুদের মধ্যে মামাতো বোন কিংবা পিসতুতো বোনকে বিবাহ করাই প্রচলিত রীতি। তবে তারা খুড়তুতো কিংবা জ্যাঠতুতো বোনকে কখনও বিবাহ করে না। মাণ্ডালা ও বালাঘাট অঞ্চলের বাইগারা মাত্র পিসতুতো বোনকেই বিবাহ করে, মামাতো বোনকে নয়। মুরিয়াদের মধ্যে পিসতুতো ও মামাতো উভয় বোনকেই বিবাহ করার রীতি আছে। মাদুরার

পালিয়ানদের মধ্যে মামাতো বোন বা ভগিনীর সহিত বিবাহ হয়, পিসতুতো বোনের সঙ্গে কখনই নয়। কিন্তু কোচিনের কাদারদের মধ্যে পিসতুতো বোনের সঙ্গেও বিবাহের চলন আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মুডুবনদের মধ্যে এরূপ বিবাহই একমাত্র রীতি। ত্রিবাঙ্কুরের মল-পুলায়ন ও মল-বেদনদের মধ্যেও এরূপ বিবাহের রীতি আছে। ত্রিবাঙ্কুরের উলুড়নরা মাত্র পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে, কিন্তু মল-কুরুবনরা পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে না। তারা মাত্র মামাতো বোনকেই বিবাহ করে। নৃতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, মামাতো-পিসতুতো বোনের বিবাহের উৎপত্তি হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। এরূপ বিবাহের দ্বারা খরচপত্র এড়ানো যায় এবং সম্পত্তিও অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়। এই কারণে পিতার দিক থেকে তার বোনের মেয়ের সঙ্গে ও মাতার দিক থেকে তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয়। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, কন্যা-বিনিময় দ্বারা 'পালটি' বিবাহের রীতি থেকেই এরূপ বিবাহের উৎপত্তি হয়েছে।

একাধিক পতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার রীতি নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের টোডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মুডুবন, মল-পুলায়ন ও মল-আরয়নদের মধ্যে বহুপতিক বিবাহ একসময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তা বিরল। উল্লাটনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি-গ্রহণ কখনও-কখনও দেখা যায়, যদিও ওটা তাদের মধ্যে সাধারণ রীতি নয়। হিমালয়ের সীমান্তপ্রদেশের কয়েকটি উপজাতির মধ্যেও বহুপতিক বিবাহ প্রচলিত আছে।

টোডাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহমূলক দুটি বিভাগ আছে। এ-দুটি বিবাহের নাম হচ্ছে টারথার ও টিভালি। টারথারগণ নিজেদের টিভালি অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করে। দুটি বিভাগই হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী। তার মানে, টারথারদের সঙ্গে টিভালিদের কখনও বিবাহ হয় না। টারথারদের বিভাগে ১২টি এবং টিভালিদের

বিভাগে ৬টি গোত্র আছে। বিবাহ সবসময় নিজ গোত্রের বাইরে হয়। টোডাদের মধ্যে মামাতো ও পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহের রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু টোডাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক বৈবাহিক আচরণ হচ্ছে বহুপতিগ্রহণ। টোডাদের মধ্যে যে বহুপতিক বিবাহের চলন আছে, তা হচ্ছে ভ্রাতৃত্বমূলক। তার মানে, একাধিক ভ্রাতা একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। অনেকসময় ভ্রাতৃগণ সহোদর ভ্রাতা না হয়ে, দলভুক্ত ভ্রাতাও হয়। টোডাদের মধ্যে সন্তানের পিতৃত্ব 'পুরুস্থুৎ পুমি' নামে এক অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। স্ত্রীর সাতমাস-গর্ভকালে স্বামীদের মধ্যে একজন ধনুর্বাণ দিয়ে এই অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করে এবং সে-ই গর্ভস্থ সন্তানের পিতারূপে পরিচিত হয়। যতদিন না অপর কোন স্বামী অনুরূপ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করছে ততদিন অনুষ্ঠানকারী স্বামীই সমাজে সন্তানের পিতারূপে গণ্য হয়। যেক্ষেত্রে স্বামীরা সকলে একত্রে বাস করে না বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করে, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পালা করে প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে একমাস কাল করে এসে বাস করে।

কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লাডাক উপত্যকার অধিবাসী লাডাকিদের মেয়েরাও বহুপতিগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেরও স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। তবে যেখানে অনেক-গুলি ভাই থাকে সেক্ষেত্রে ওই সম্পর্ক মাত্র তিন-চার ভ্রাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী ভ্রাতারা কোন মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'লামা'র জীবন যাপন করে। তবে যেক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা এরূপ-ভাবে মঠে প্রবেশ করে না, সেক্ষেত্রে সে 'মাগপা' স্বামী হিসাবে কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। 'মাগপা' স্বামীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে সবসময় স্ত্রীর বশীভূত হয়ে থাকতে হয় এবং স্ত্রীর যখন খুশি তখনই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে আবার নতুন 'মাগপা' স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর অবস্থাও প্রথম স্বামীরই অনুরূপ।

তার সঙ্গেও স্ত্রী তার খুশিমত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে লেপচা জাতির মধ্যেও বহুপতিক বিবাহ সীমিতভাবে প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে এদের মধ্যে প্রথার কিছু বৈচিত্র্য আছে। সাধারণত কোন ব্যক্তি যখন চাষবাসের কাজ একা করতে অসমর্থ হয় বা তাকে অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় তখন সে প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে কোন অবিবাহিত যুবককে তার মাঠের কাজ করবার জন্য এবং তার দাম্পত্যশয্যার অংশীদার হতে আহ্বান করে নেয়। এক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এই দ্বিতীয় স্বামী কখনও নিজের বাবদে স্বতন্ত্র বিবাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই যে, স্ত্রী পর্যায়ানুক্রমে একান্তর রাত্রিতে প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করে। তবে যে স্বামীর দ্বারাই সন্তান উৎপন্ন হোক না কেন, সে-সন্তান প্রথম স্বামীর ঔরসজাত বলে পরিচিত হয়। কেবল প্রথম স্বামী যদি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যায় অথবা তার দ্বারা সন্তান-উৎপাদন অসম্ভব হয়, তা হলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীকেই সন্তানের পিতা বলে গণ্য করা হয়।

হিমালয়ের পাদদেশে জৌনসর বেওয়া অঞ্চলে খস্‌জাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে বহুপতিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতের জাঠ জাতির দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও কেরালার নায়ারদের মত বহুপতিক বিবাহ দেখা যায়। কেরালার স্বর্ণকার-বৃত্তিধারী আশরী জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিক বিবাহের চলন আছে। ভারতের বাইরে তিব্বতেও বহুপতিক বিবাহের প্রচলন আছে। একসময় এরূপ বিবাহ ইউরোপেও প্রচলিত ছিল।

যে-সমাজে স্ত্রীলোককে জননশক্তির আধার ও আর্থিক সম্পদ হিসাবে ধরা হয়, সে-সমাজ যে বাল্যবিবাহ বরদাস্ত করবে না, তা বলাই বাহুল্য। এ-কারণে আদিবাসী সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। মাত্র যারা হিন্দুসমাজের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়েছে তাদের

মধ্যেই কখনও কখনও বাল্যবিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত স্ত্রীপুরুষের যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে আদিবাসী সমাজে বিবাহ খুবই বিরল। মধ্যপ্রদেশের ভীলদের মধ্যে ১৫ থেকে ৪০ বছর হচ্ছে মেয়েদের বিবাহের প্রচলিত বয়স। ত্রিবাঙ্কুরের উপজাতিসমূহের মধ্যে ১৫ বৎসরের পূর্বে কখনও মেয়েদের বিবাহ হয় না। প্রায় সমস্ত আদিবাসী সমাজেই মেয়েদের বিবাহের বয়স পনেরোর বেশি।

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশের ভীলদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটে থাকে। তাদের মধ্যে যে-কোনও কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটতে পারে। তবে যেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের কারণস্বরূপ স্ত্রীর চরিত্রের ওপর দোষারোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে স্বামী গ্রামের পঞ্চায়েতকে ডেকে তার সামনে নিজের মাথার পাগড়ি থেকে একখণ্ড কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে স্ত্রীকে দেয় এবং বলে যে, যেহেতু তার চরিত্রে আর তার আস্থা নেই সেইহেতু তাকে পরিহার করছে এবং ভবিষ্যতে সে তাকে ভগিনীরূপে দেখবে। স্ত্রী ওই কাপড়ের টুকরোটা বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘরের চালের আড়ায় একমাসকাল ঝুলিয়ে রাখে। এর দ্বারা প্রচার করা হয় যে তার পূর্বস্বামী তাকে পরিহার করেছে এবং সে এখন দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণের অধিকারিণী। এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্বামী তার দেওয়া কন্যাপণ ফেরত নেয়।

মধ্যপ্রদেশের ভানটুদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদকে খুব আনুকূল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ওড়িশার পরোজা জাতির মধ্যে স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে বা তার সঙ্গে তার বনিবনা না হয়, তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। এদের মধ্যে স্ত্রী যদি স্বামীকে পরিহার করে তবে তাকে বাধ্য করা হয় পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড দিতে, আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বর্জন করে, তাকে মাত্র এক টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুরের

জাতিসমূহের মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লাডাক উপত্যকার অধিবাসীদের মেয়েরাও খুশিমত বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে। বিহারের দক্ষিণদিকে সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়া আদিবাসীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পাহাড়িয়া ও সাঁওতাল, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছেদের নিয়ম হল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তিনটি করে আমপাতা ছিঁড়ে নেয় এবং স্বামী তার স্ত্রীকে সাত টাকা দেয়।

বিধবা-বিবাহ আদিবাসী সমাজে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে সাধারণত যে নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে—কোনও বিশেষ আত্মীয়ের সঙ্গে বিধবার বিবাহ হওয়া চাই। তবে মধ্যপ্রদেশের ভীলজাতির মধ্যে এরূপ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ বাধ্যতামূলক নয়। তাদের মধ্যে বিধবার সম্মতি পেলে বিবাহপ্রার্থী ব্যক্তি ৪।৫ জন বন্ধুবান্ধব সহ কিছু উপহার সামগ্রী ও বস্ত্র নিয়ে বিধবার বাড়ি যায় ও বিধবার ভাইয়ের স্ত্রীকে বা তার পিসীকে সাত পয়সা দক্ষিণা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভাইয়ের স্ত্রী বা পিসী সধবা হওয়া চাই। তারপর ভোজ ও মদ্যপান করে বিবাহ নিষ্পন্ন করা হয়। এরূপ বিবাহ সাধারণত রাত্রিকালে হয় এবং নবপরিণীতা বিধবা কখনও দিবালোকে তার স্বামীর গৃহে যায় না। কেননা, তাদের বিশ্বাস যে দিবালোকে স্বামীগৃহে গেলে দুর্ভিক্ষ হয়। এরূপ বিবাহের পর বিধবার বা তার ছেলেদের প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোন উত্তরাধিকার থাকে না। যে-ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ দেবরের সঙ্গে হয় সেক্ষেত্রে যদি প্রথম স্বামীর ছেলে থাকে, তা হলে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান কখনও প্রথম স্বামীর সম্পত্তি পায় না। কিন্তু যদি প্রথম স্বামীর কোনও ছেলে না থাকে তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানেরাই প্রথম স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হয়। ভীলদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু এদের মধ্যে হিন্দুসমাজ কর্তৃক প্রভাবান্বিত উচ্চশ্রেণীর লোকরা এর অনুমোদন করে

না। বারওয়ানির পাতলি, রথিয়া ও তারভি জাতিসমূহের মধ্যেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। নীলগিরির কুরুম্বরাও বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে। ওড়িশার পরোজাদের মধ্যে বিধবাকে বাধ্যতামূলকভাবে দেবরকে বিবাহ করতে হয়। বিধবা যেক্ষেত্রে দেবরকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়, সেক্ষেত্রে বিধবা যাকে বিবাহ করতে চায়, তাকে পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড দেবরকে দিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুরের মুডুবনদের মধ্যেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, তবে এদের মধ্যে দেবর বা অন্য কোন স্বজনকে বিবাহ করা সম্বন্ধে কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মান্নানদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। আবার ত্রিবাঙ্কুরের কুরুম্ব পুলায়ানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও অধিকার আছে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করবার। কিন্তু উল্লাটনরা মাত্র দেবরকেই বিবাহ করার অনুমতি দেয়। আসামের গারোদের মধ্যে জামাতা কর্তৃক বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করার রীতি আছে। আসামের বাগনি, দাফলা ও লাখেরদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর সন্তানই বিধবা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। গঞ্জাম ও কোরাপুট জেলায় শবরদের মধ্যে নিজ বিধবা খুড়ী বা কাকীকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে দেবরকেও বিবাহ করতে পারা যায়। আসামের বাগনি, দাফলা ও লাখেরদের মধ্যে পুরুষ সাধারণত অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করে, যাতে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে কন্যাপণ এড়িয়ে যুবতী ও সমর্থা বিধবা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারে। মধ্যপ্রদেশের ভানটুদের মধ্যে বিধবার যদি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে সে বিবাহ না করে অপর পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছা যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে পারে।

বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান প্রজনন করা। এটা মেয়েদের প্রজননশক্তির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে। হিন্দুদের তুলনায় আদিবাসী সমাজের মেয়েদের উর্বরতা-শক্তি অনেক কম। তাদের

মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই এক থেকে তিনের বেশি সন্তান হয় না সুতরাং সেখানে পরিবারের আকার হিন্দুদের তুলনায় অনেক ছোট।

এতক্ষণ আমরা আদিবাসীদের কথাই বলছিলাম। এবার হিন্দুদের পরিবার ও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। আগেই বলেছি যে হিন্দুদের পরিবার ছিল স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য পরিবার। এ পরিবার ছিল অতি বিস্তৃত ও যৌথ পরিবার। উত্তর ভারতের হিন্দুসমাজে বিবাহ গোত্রপ্রবর বিধি-নিষেধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সগোত্রে কখনও বিবাহ হয় না। তার মানে, আদিবাসী সমাজের 'টোটেম'-এর ন্যায় 'গোত্র' বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাডুর ব্রাহ্মণরাও গোত্রপ্রবর বিধি অনুসরণ করে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মারাঠারা ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজভুক্ত কোন কোন জাতি গোত্রপ্রবর বিধি অনুসরণ করে না। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠী-গুলিকে 'দল' বলা হয় এবং সেগুলি 'টোটেম'-অনুকল্প কোন প্রাণী, বৃক্ষ বা জড় পদার্থ দ্বারা চিহ্নিত হয়।

হিন্দুসমাজে অবাধ বিবাহের ওপর এক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটা হচ্ছে রক্তের একমূলতা সম্পর্কিত দ্বিপার্শ্বিক বিধি। একে সপিণ্ড-বিধান বলা হয়। সপিণ্ডবিধি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে উত্তর ভারতে। এই বিধান অনুযায়ী সপিণ্ডদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। সপিণ্ড বলতে পিতা থেকে উর্ধ্বতন ছয়পুরুষ এবং স্বয়ং—এই সাত-পুরুষ কিংবা পুত্র থেকে অধস্তন ছয়পুরুষ এবং স্বয়ং, এই সাতপুরুষ বোঝায় (মনু ৫।৬০)। এই বিধান অনুযায়ী সপিণ্ডদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিবাহ ব্যাপারে সর্বত্রই সপিণ্ড বর্জন করে। যদিও সপিণ্ড বলতে পিতৃকুলেই উর্ধ্বতন সাতপুরুষ বোঝায়, বিবাহ ব্যাপারে সাধারণত মাতৃকুলেও পাঁচপুরুষ বর্জন করা হয়। অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে, এই নিয়ম অনুসরণ করতে গেলে অগণিত সম্ভাব্য জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাহ পরিহার করতে হয়। এজন্য

বর্তমানে-সপিণ্ড বিধিকে সংক্ষেপ করে তিনপুরুষে দাঁড় করানো হয়েছে। (এখানে বলা দরকার যে, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে 'সপিণ্ড'-র সংজ্ঞার হেরফের আছে)।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দুসমাজে গোত্রপ্রবর বিধি ছাড়া অবাধ বিবাহের আর এক বাধা ছিল। সেটা হচ্ছে কৌলীন্যপ্রথা। কৌলীন্য-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বাঙলাদেশে ও মিথিলায়। আদিবাসী সমাজেও কোন কোন জায়গায় কৌলীন্যপ্রথা যে দেখা যায়, তা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই প্রথায় বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথানুযায়ী কুলীনগোষ্ঠীভুক্ত মেয়ের বিবাহ কুলীনগোষ্ঠীতে দেওয়া একান্ত বাধ্যতামূলক ছিল। হীনতর মর্যাদাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে দিতে পারা যেত না। দিলে, তাকে 'পতিত' হতে হত। সেজন্য যে-সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকে, সে-সমাজে কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। অনেকসময় বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কুলীন কন্যার বিবাহ হত না। এই কারণে কোন কোন স্থানে কৌলীন্য-কলুষিত সমাজে শিশুকন্যা-হত্যার প্রচলন ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাইকারী হারে বহুবিবাহ দ্বারা কৌলীন্যের কঠোর বিধান এড়ানো হত। এরূপ শোনা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে গঙ্গাযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহ দিয়ে কৌলীন্য-মর্যাদা রক্ষা করা হত।

এ ছাড়া, বাঙলাদেশের উচ্চবর্ণের কোন কোন জাতির মধ্যে আরও কতকগুলি কঠিন প্রতিবন্ধক ছিল। এসকল জাতির মধ্যে বিবাহ কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা পর্যায়ের মধ্যে হওয়ার রীতি ছিল। যেমন—দক্ষিণ-রাঢ়ী কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে পুত্রের বিবাহের জন্য (এঁদের মধ্যে কৌলীন্য পুত্রগত, ব্রাহ্মণদের মত কন্যাগত নয়) পাত্রী নির্বাচন করতে হত সমপর্যায় অপর দুই কুলীন শাখা থেকে।

হিন্দুসমাজে সাধারণত পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স কম হয়। কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতে এই নিয়ম সবসময় পালিত হয় না। তার কারণ, সেখানে 'বাঞ্ছনীয়' বিবাহ প্রচলন থাকার দরুন প্রায়ই দেখা যায় যে 'বাঞ্ছনীয়া' পাত্রী পাত্র অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। এরূপ ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্যের দরুন অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের বয়সের যত বছরের তফাত, মেয়ের বিয়ের সময় তার কোমরে ততসংখ্যক নারিকেল বেঁধে দেওয়া হয়।

বিবাহে সপিণ্ড এড়ানোর নিয়ম দক্ষিণ ভারতে পূর্ণমাত্রায় পালন করা হয় না। কেননা দক্ষিণ ভারতে বহু জাতির মধ্যে পিসতুতো বোন বা মামাতো বোনকে বিয়ে করতে হয়। অনেক জায়গায় আবার মামা-ভাগ্নীর মধ্যেও বিবাহ হয়। বাধ্যতামূলক না হলেও এটাই হচ্ছে সেখানে 'বাঞ্ছনীয়' বিবাহ (preferential marriage)। মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতি অবশ্য মহাভারতের যুগেও ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার, শিশুপালের সঙ্গে ভদ্রার, পরীক্ষিতের সঙ্গে ইরাবতীর বিবাহ উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ মারাঠাদেশে ন্যূনপক্ষে ৩১টি জাতি আছে, যারা মামাতো বোনকে বিয়ে করে। আগেই বলেছি যে, আদিবাসীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও এরূপ বাঞ্ছনীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড, বাইগা ও আশারিয়াদের মধ্যে পিসতুতো বোনকে বিবাহ করার রীতি আছে। এখানে এরূপ বিবাহকে 'দুধ লৌটনা' বলা হয়। মারিয়া গোণ্ডদের মধ্যে পিসতুতো বোনকে যদি বিবাহের জন্য মামাতো ভাইয়ের হাতে না দেওয়া হয়, তা হলে সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত হস্তক্ষেপ করে এবং জোর করে দুজনের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দেয়। হো ও সাঁওতালদের মধ্যে পিসতুতো-মামাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের একটা বৈশিষ্ট্যমূলক নিয়ম আছে। এদের মধ্যে মামা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন মামার মেয়েকে বিবাহ করা চলে না। অনুরূপভাবে পিসী যতদিন জীবিত

থাকে ততদিন পিসীর মেয়েকেও বিবাহ করা যায় না। সিকিমের ভুটিয়ারা মাতৃকুলে বিবাহ করে, কিন্তু পিসীর কুলে কখনও বিবাহ করে না।

যদিও বর্তমানে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুসারে একপত্নীত্বই একমাত্র আইনসিদ্ধ বিবাহ বলে পরিগণিত হয়েছে, তা হলেও কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দুসমাজে বহুপত্নীগ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে বহুপতিগ্রহণও প্রচলিত ছিল। আদি-বাসী সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে নেই। তবে বলা দরকার যে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সংসদ বিবাহ সম্পর্কে যে সংশোধক আইন প্রণয়ন করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে হিন্দু-বিবাহ আইনের ১৬ ধারায় ও স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ২৮ ধারায় বিবৃত অসিদ্ধ ও বাতিলযোগ্য বিবাহকে আইনত সিদ্ধ বিবাহ বলে ধরে নিয়ে, তাদের সন্তানকে বৈধ সন্তান বলে গণ্য করা হবে। তার মানে, এ আইন দ্বারা সন্তানকেই বৈধ করা হয়েছে, তার পিতামাতার বিবাহকে বৈধ করা হয়নি।

ভারতে বিবাহপ্রথার বৈচিত্র্যের কারণ হচ্ছে নানা জাতি ও কৃষ্টির সমাবেশ। অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা জাতির লোক এসে ভারতের জনস্রোতে মিশেছে। তার ফলে ভারতে নানা নরগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে। এবং এই মিশ্রণের ফলেই পরস্পর পরস্পরের বিবাহ-প্রথা গ্রহণ করেছে। তার ফলে অনার্যসমাজের বিবাহপদ্ধতিসমূহ আর্যসমাজেও স্থান পেয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে একরকমের বিবাহই প্রচলিত ছিল। সে-বিবাহ নিষ্পন্ন হত মন্ত্র-উচ্চারণ ও যজ্ঞ-সম্পাদন দ্বারা। কিন্তু মহাভারতে চাররকম বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়—ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস। এর মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহেই মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ-সম্পাদনের প্রয়োজন হত। বাকী তিনরকম বিবাহে এসবের কোন বালাই ছিল না। আবার যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুস্মৃতিতে আমরা আটরকম

বিবাহের উল্লেখ পাই—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্মবিবাহ ছিল ব্রাহ্মণ্য আচার সম্পৃক্ত বিবাহ। এই বিবাহে মন্ত্র-উচ্চারণ ও যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করে সবস্ত্রা, সালঙ্কারা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করা হত। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তার নাম ছিল আর্যবিবাহ। এই বিবাহে যজ্ঞে ব্যবহৃত ঘৃত প্রস্তুতের জন্য মেয়ের বাবাকে বর একজোড়া গো-মিথুন উপহার দিত। যজ্ঞের ঋত্বিককে দক্ষিণা হিসাবে যেখানে কন্যাদান করা হত, তাকে বলা হত দৈববিবাহ। 'তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে ধর্মাচরণ কর'—এই উপদেশ দিয়ে যেখানে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়া হত, তাকে বলা হত প্রাজাপত্য বিবাহ। বলা বাহুল্য, এই চার-রকম বিবাহপদ্ধতিরই কৌলীন্য ছিল। বাকীগুলির কোন কৌলীন্য ছিল না, কেননা সেগুলি প্রাগ্‌বৈদিক আদিবাসী সমাজ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেগুলি আদিবাসী সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। আসুরবিবাহ ছিল পয়সা দিয়ে মেয়ে কেনা। তার মানে, সে-বিবাহে কন্যাপণ দেওয়া হয়। এরূপ বিবাহে মেয়ের বাবাকে কিংবা তার অভিভাবককে পণ বা মূল্য দিতে হত। আর, মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে এসে যে-বিবাহ করা হত, তার নাম ছিল রাক্ষসবিবাহ। আর যেখানে মেয়েকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে, প্রবঞ্চনা অথবা ছলনা দ্বারা বিবাহ করা হত, তাকে বলা হত পৈশাচবিবাহ। আর নির্জনে প্রেমালাপ করে যেখানে স্বেচ্ছায় মাল্যদান করা হত, তাকে বলা হত গান্ধর্ব-বিবাহ। মহাভারতের যুগে ক্ষত্রিয়বর্ণের পক্ষে গান্ধর্ববিবাহই ছিল প্রশস্ত। এইভাবেই বিবাহ হয়েছিল গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর, ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার, অর্জুনের সঙ্গে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার, দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সঙ্গে সুশোভনার। তবে মহাভারতের যুগে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের পক্ষে

স্বয়ম্বরপ্রথায় বিবাহই ছিল আদর্শ বিবাহ। স্বয়ম্বর-বিবাহ ছিল রাক্ষস-বিবাহেরই একটা সুষ্ঠু সংস্করণ। এটা কাশীরাজার তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরসভায় ভীষ্মের উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়। ওই সভায় ভীষ্ম বলেছিলেন—'স্মৃতিকারগণ বলেছেন যে, স্বয়ম্বর-সভায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাহত করে কন্যা জয় করাই ক্ষত্রিয়দের পক্ষে আদর্শ বিবাহ।'

বিবাহের ওপর যৌন-অনুপাতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যৌন-অনুপাত বলতে আমরা হাজার-পুরুষ-প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা বুঝি। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেখানে কম সেখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে পাত্রী সংগ্রহ করা। আর যেখানে পুরুষের সংখ্যা কম সেখানে পাত্র সংগ্রহ করাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

গত সত্তর বছর পুরুষের তুলনায় ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে হাজার-পুরুষ-প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯৭২ জন। এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ৯৬৪ জন, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ৯৫৫ জন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ৯৫০ জন, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৯৪৬ জন, ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ৯৪১ জন, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে ৯৩২ জন ও ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে ৯৩৩ জন। যে-দেশে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল এবং বহুপত্নীগ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল, সে-দেশে এককালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই যে অধিক ছিল, এরূপ অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। কি কারণে গত আশি বৎসর কাল ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে এ-সম্বন্ধে জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্যাদি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যদিও ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তথাপি কয়েকটি রাজ্যে, যেমন কেরালা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও ত্রিপুরায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদিবাসীদের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে

স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি। আবার শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এর কারণ অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আগন্তুক পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

যে-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নেই, সে-সমাজে স্ত্রীলোকের অনাধিক্য বিবাহ-সমস্যার ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঘটায়, বিশেষ করে পাত্রী সংগ্রহ সম্পর্কে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, বিয়ের বয়সের পরিবর্তন হেতু। বিয়ের বয়স আগেকার দিনে খুব কমই হত। মনুর বিধান ছিল যে, বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স আট হবে, আর ছেলের বয়স হবে চব্বিশ। বিয়ের বয়সের দিক থেকে স্মৃতিকারগণ মেয়েদের পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম 'নগ্নিকা' যখন সে নগ্ন হয়ে থাকে, দ্বিতীয় 'গৌরী' অর্থাৎ আটবছরের মেয়ে, তৃতীয় 'রোহিণী' অর্থাৎ নয়বছরের মেয়ে, চতুর্থ 'কন্যা' অর্থাৎ দশবছরের মেয়ে, এবং পঞ্চম 'রজস্বলা' অর্থাৎ দশবছরের উপর বয়সের মেয়ে। যদিও মনু মেয়েদের পক্ষে আটবছর ও পুরুষদের পক্ষে চব্বিশবছর বয়স বেঁধে দিয়েছিলেন, উত্তরকালে কার্যত এ বয়স পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক কমে গিয়েছিল। তার ফলে বাল্যবিবাহই প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি এর পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশায় বাল্যবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে উচ্চবর্ণের জাতিসমূহের মধ্যে এবং বিশেষ করে শিক্ষিতসমাজে আর অল্পবয়সে বিবাহ হয় না। আজকাল মেয়েদের বিবাহ আকচার কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে হচ্ছে। অনেকে আবার আজীবন কুমারীও থেকে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে পুরুষদের বিবাহও পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হচ্ছে এবং তাদের মধ্যেও অনেকে অবিবাহিত থাকছে। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে গড় বয়স ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে তেইশ থেকে চল্লিশ ও মেয়েদের আঠারো থেকে বত্রিশ। এখানে আরও উল্লেখনীয় যে, ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রজননশক্তি-বিশিষ্ট দম্পতির সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ১৬৯।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১৭০। এরূপ দম্পতির সংখ্যা গ্রামে ১৬১, আর শহরে ১৭১।

শেষ কথা। হিন্দুসমাজে অবাধ বিবাহ নেই। কোন পুরুষ বা মেয়েকে কোন্ গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ করতে হবে, সেটা স্থির হয়ে যেত তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। কেননা, সে যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে-পরিবার যে জাতিভুক্ত, তাকে সেই জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হবে। তার মানে, হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থায় জাতিই হচ্ছে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠীস্বরূপ। তথাপি নিজ জাতির মধ্যেও যে-কোন পুরুষ যে-কোন স্ত্রীলোককে অবাধে বিবাহ করতে পারে না। গোত্র-প্রবর ইত্যাদি বিধান ছাড়াও, আরও অন্তরায় আছে। জাতিসমূহ অনেকক্ষেত্রেই শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত, এবং এই শাখা-উপশাখাগুলিই বিবাহের গণ্ডী নির্বাচন করে দেয়। যেমন, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণগণ আটটি শাখায় বিভক্ত—পঞ্চগৌড়, পঞ্চদ্রাবিড়, সারস্বত, পুষ্করণ, শ্রীমালী, ছনাতি, শাকদ্বীপী ও উদীচ্য। এগুলি প্রত্যেকেই অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। অনেকক্ষেত্রে আবার বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে আরও সংকীর্ণ করা হয়েছে, শাখাগুলিকে উপশাখায় বিভক্ত করে। যেমন, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছনাতি শাখা ছয়টি উপশাখায় বিভক্ত—সারস্বত, গুর্জরগৌড়, খাণ্ডেলবাল, দাধীচ, শিকওয়াল ও পারিখ। এর প্রত্যেকটিই অন্তর্বিবাহকারী উপদল। অনুরূপভাবে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণরা প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এ ছাড়া, বাঙলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণও আছে। এগুলি সবই অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী। বাঙলাদেশের কায়স্থদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। রাঢ়ীরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। সদ্গোপদের মধ্যেও দুটি বিভাগ আছে—পূর্বকুল ও পশ্চিমকুল। দক্ষিণ ভারতেও শ্রেণীগত অনেক বাধা আছে।

তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণরা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত। আয়াররা শিবভক্ত এবং আয়াঙ্গাররা বিষ্ণুভক্ত। এর প্রত্যেকটিই সেখানে অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। আবার কোন কোন জায়গায় এই দুই বিভাগের মধ্যে আঞ্চলিক বাধা আছে।

তবে সবশেষে বলা দরকার যে, বর্তমানে বিবাহের এইসকল বাধানিষেধ অনেক পরিমাণে শ্লথ হচ্ছে। কিন্তু দুই-তিন পুরুষ আগে পর্যন্ত এসকল বিধিনিষেধ অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালিত হত। এখন অসবর্ণ-বিবাহও ঘটছে।

বিবাহের বিধিনিষেধগুলি শ্লথ হওয়ার ফলে, সাম্প্রতিককালে হিন্দুর যৌনজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য-দেশের চিন্তাধারার প্রভাবেই এটা ঘটেছে। পরিবর্তনের সূচনা হয়, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপূর্বক বা মাদকদ্রব্য প্রয়োগের প্রভাবে) স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আহুতি দেওয়া হত। এই নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথার উচ্ছেদের জন্য রাজা রামমোহন রায় খড়্গহস্ত হন। সনাতনী সমাজের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি বড়লাট লর্ড বেনটিঙ্ককে সম্মত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৮২৯ সালের ২৭ নম্বর আইন বিধিবদ্ধ করাতে। এই আইনের ফলে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সহমরণের হাত থেকে হিন্দু বিধবা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তার সামনে যে-পথ উন্মুক্ত রইল সেটা হচ্ছে সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করা। সে-যুগে তো মেয়েদের আট-দশ বছরেই বিবাহ হয়ে যেত। বিবাহের অব্যবহিত পরে খুব অল্পবয়সে যে-সব মেয়ে বিধবা হত, তাদেরও বাধ্য করা হত এই কঠোর সংযমের বশীভূত হতে। এর ফলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। বালবিধবার এই কঠোর জীবনের প্রতি সহমর্মী হয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হন এইসকল বাল-

বিধবার পুনরায় বিবাহ দেবার জন্য। সনাতনী সমাজ তাঁকে রেহাই দিল না। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজকে কশাঘাত করবার শক্তির অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। তিনি একাই রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তৎকালীন সরকারকে ১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বর আইন বিধিবদ্ধ করাতে প্রবুদ্ধ করলেন। এই আইন দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করা হল।

তারপর ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন দ্বারা সবর্ণে বিবাহের বাধাও দূর করা হল। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে, বিবাহেচ্ছু উভয়পক্ষকেই শপথ গ্রহণ করতে হত যে, তারা হিন্দু নয়। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হল যে অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যাবে। তবে এই আইন প্রণয়নের পূর্বেই এরূপ একটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সেটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ে অপর্ণা দেবীর বিবাহ। এ-সম্বন্ধে অপর্ণা দেবী নিজেই লিখেছেন—'১৯১৬ সালে আমার বিয়েই বাঙলাদেশে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিয়ে।' ১৮৯১ সালে ফুলমণির সেই শোকাবহ দুর্ঘটনার পর, বিবাহে সঙ্গমের বয়সও বেঁধে দেওয়া হল, 'এজ অভ্ কনসেণ্ট অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করে। এরপর রায়বাহাদুর হরবিলাস সরদা হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ১৯২৯ সালের ১৯ নম্বর আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, হিন্দু-বিবাহে ছেলের উপযুক্ত বয়স ন্যূনপক্ষে ১৮ ও মেয়ের বয়স ১৫ হওয়া চাই। (পরে সংশোধনী আইন দ্বারা ২১ ও ১৮ করা হয়েছে)। হিন্দুবিবাহ-সংস্কারের জন্য দুটি বড় রকমের আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ১৯৪৬ সালে। ওই বৎসর ১৯ নম্বর আইন দ্বারা স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হল অবস্থাবিশেষে স্বামীত্যাগের জন্য। স্বামী যদি কুৎসিত ব্যাধিতে ভোগে, বা স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যাতে স্ত্রীর নিরাপত্তার অভাব ঘটে, বা স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, বা আবার স্ত্রীগ্রহণ

করে, বা নিজ বাসগৃহে রক্ষিতা এনে রাখে, বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বা ধর্মান্তরগ্রহণ করে, তা হলে আইনের বলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে স্বামীত্যাগ করে স্বতন্ত্র বসবাস করতে পারবে। আর, ২৮ নম্বর আইনে নির্দেশ দেওয়া হল, সগোত্রে ও সমপ্রবরে বিবাহও বৈধ। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৯ সালের ২১ নম্বর আইন দ্বারা বিবাহক্ষেত্রে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যতরকম বাধা-বৈষম্য ছিল তা দূরীভূত করা হল। বিবাহ সম্পর্কে শেষ আইন বিধিবদ্ধ হল ১৯৫৫ সালে। এটাই হচ্ছে হিন্দুবিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটিকে 'হিন্দুবিবাহ বিধি' বা ১৯৫৫ সালের ২৫ নম্বর আইন বলা হয়। বৈধ বিবাহের যে-সকল শর্ত এই আইনে নির্দিষ্ট হল, সেগুলি হচ্ছে—

১. বিবাহকালে স্বামীর অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীর অন্য স্বামী জীবিত থাকবে না।

২. উভয়পক্ষের কেউই পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না।

৩. ন্যূনপক্ষে বরের ১৮ এবং কনের ১৫ বৎসর বয়স হওয়া চাই। (এখন বরের ২১ এবং কনের ১৮)

৪. উভয়পক্ষের কেউই নিষিদ্ধ নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে হবে না।

৫. উভয়ের কেউই সপিণ্ড হবে না।

৬. যে-স্থলে কনের বয়স ন্যূনতম বছরের কম, সে-স্থলে অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে, সম্পাদিত সিদ্ধবিবাহ অসিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হবে :

১. যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হয়।

২. যদি বিবাহের সময় কোন পক্ষ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

৩. যদি প্রতারণা বা বলপূর্বক অভিভাবক দ্বারা প্রতিবাদীর সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে।

৪. যদি বিবাহের পূর্বে স্ত্রী, স্বামী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হয়ে থাকে।

৫. যদি অন্য কোন স্ত্রী বা স্বামী বিদ্যমান থাকায় বিবাহ হয়ে থাকে। সেরূপ বিবাহ অসিদ্ধ। (কিন্তু ১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, ওরূপ বিবাহ অসিদ্ধ হলেও তাদের সন্তানের উত্তরাধিকার অসিদ্ধ নয়।)

৬. যদি নিষিদ্ধ নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে। এ ছাড়া, নিম্নলিখিত কারণগুলির মধ্যে যে-কোন একটি কারণ দেখাতে পারলে, আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদেরও আদেশ দিতে পারে :

১. যদি স্বামী বা স্ত্রী কেহ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

২. যদি ধর্মান্তরগ্রহণের ফলে আর হিন্দু না থাকে।

৩. যদি আদালতের কাছে বিবাহভঙ্গের জন্য আবেদন করবার পূর্বে স্ত্রী বা স্বামীর কেউ তিনবৎসর ক্রমান্বয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়।

৪. যদি ওইরকম তিনবৎসরকাল স্বামী বা স্ত্রী কেউ অনারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

৫. যদি ওইরকম তিনবৎসরকাল স্বামী বা স্ত্রী কেউ কোন সংক্রামক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

৬. যদি স্বামী বা স্ত্রীর কেউ কোন ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করে বা সংসার ত্যাগ করে।

৭. যদি স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ ক্রমান্বয়ে সাতবৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকে।

৮. যদি জুডিসিয়াল সেপারেশনের ডিক্রীর পর উভয়পক্ষ আর স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস না করে।

৯. যদি রেস্টিটিউশন অভ্ কনজুগাল রাইটস্-এর ডিক্রী হওয়ার পর কোনও পক্ষ সেই ডিক্রী অমান্য করে অপরপক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে দু'বৎসর পৃথক বসবাস করে থাকে।

এ ছাড়া, আরও দু'কারণে স্ত্রী আদালতের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এ-দুটি কারণের প্রথমটি হচ্ছে—যদি এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে স্বামী অন্য কোনও স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে এবং আদালতে প্রার্থনা করবার সময় সে-স্ত্রী জীবিত থাকে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—স্বামী যদি বলাৎকার, পুংমৈথুন বা কোনরূপ অস্বাভাবিক যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে।

১৯৫৫ সালের এই আইন সম্পর্কে তিনটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম, বিবাহ সিদ্ধ হবার সময় থেকে তিনবছরের পূর্বে কোন পক্ষ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন দরখাস্ত করতে পারবে না। দ্বিতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবার পর যদি তার বিপক্ষে কোন আপীল করা না হয়ে থাকে, তা হলে একবছর অপেক্ষা করে উভয়-পক্ষই পুনরায় বিবাহ করতে পারে। (যদি বিবাহ না করে, তা হলে আদালত খোরপোশ দেবার দাবী গ্রাহ্য করতে পারে)। তৃতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওই নির্দেশের পূর্বে স্ত্রী গর্ভে যে সন্তান ধারণ করেছে, সে-সন্তান বৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রক যে পরিসংখ্যান বের করেছে, তা থেকে প্রকাশ পায় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। ১৯৭৯-৮০ সালে বিভিন্ন রাজ্যের আদালতসমূহে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ছিল—উত্তরপ্রদেশ ৪,৭৮০, পশ্চিমবঙ্গ ৪,৩৫০, অন্ধ্রপ্রদেশ ৩,১৪৬, মহারাষ্ট্র ২,৪৮৭, মধ্যপ্রদেশ ২,২২৩, রাজস্থান ১,৬০৬, গুজরাট ৯৫৯, তামিলনাড়ু ১,০৩৪, জম্মু ও কাশ্মীর ৭৭১, আর ওড়িশা, কেরালা, কর্ণাটক, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা, হরিয়ানা এবং মেঘালয় ২৬ থেকে ৩০৩-এর মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রহীনতা ও নিষ্ঠুরতা—এসব মামলার প্রধান কারণ।

বলা বাহুল্য, গত দেড়শ' বৎসর যাবৎ সরকার চেষ্টা করেছেন আইন-

প্রণয়ন দ্বারা হিন্দুবিবাহকে নূতন মর্যাদা দিয়ে বিবাহিতা নারীর স্বার্থ-রক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহিতা হিন্দুনারী আজও সামাজিক বা পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারেনি। সংবাদপত্রে প্রত্যহ বধূ-নিধনের যে-সকল সংবাদ বেরুচ্ছে, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, সমাজ থেকে পণপ্রথাঘটিত পাপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এখনও দূরীভূত হয়নি। আজও মেয়েরা পণের বলি হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া, মধ্যযুগের বর্বর 'সতী'প্রথাকে আবার জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা আজ স্বীকার করতে হবে যে, অন্যান্য বিষয়ে নারীর অগ্রগতি ঘটেছে। আজ নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা পেয়েছে। আজ সে পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হবার সাহস ও সুযোগ পেয়েছে। আজ সে স্মৃতিকারদের নাগপাশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছে। আজ স্মৃতিকারদের স্থান গ্রহণ করেছেন বিধানসভার সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা স্মৃতিকারদের ভাষায় 'অন্ত্যজ'-জাতিভুক্ত। একমাত্র গণতান্ত্রিক আইন-কানুনের প্রভাবেই এই যুগান্ত-কারী বিপ্লব ঘটেছে।

বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান

হিন্দুদের মধ্যে বৎসরের সব মাসে বিবাহ হয় না। এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিয়ম আছে। বাঙলাদেশে বিবাহ হয় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে। বাকী পাঁচমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার নির্দিষ্ট মাসের সব দিন বিবাহ হয় না। মাত্র পঞ্জিকায় প্রদত্ত দিনে ও নির্দেশিত লগ্নে বিবাহ হয়। আবার কোনও কোনও প্রদেশে সব বৎসরে বিবাহ হয় না। নয়, দশ বা এগারো বৎসর অন্তর কোন্ বৎসরে বিবাহ হবে, তা ঠিক করে দেয় জ্যোতিষীরা। তা-ও সেইসব বৎসরের যে-কোনও মাসে বা যে-কোনও দিনে বিয়ে হয় না। মাত্র জ্যোতিষী কর্তৃক নির্দিষ্ট বৎসরের এক বিশেষ দিনে হয়। বরোদা ও মধ্যপ্রদেশের কাদয়া কুর্ম্বীদের মধ্যে বিবাহ মাত্র নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে হয়। এস্থলেও জ্যোতিষীরা নয়, দশ বা এগারো বৎসর অন্তর বিবাহের বৎসর ও দিন নির্দিষ্ট করে। এরূপভাবে দীর্ঘকাল অন্তর বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয় বলে, সকল পরিবারই মেয়ের বয়স-নির্বিশেষে পরিবারস্থ সকল অনূঢ়া মেয়েদের ওই নির্দিষ্ট দিনে পাত্রস্থ করে। এমন-কি গর্ভস্থ মেয়েরও বিবাহ দেওয়া হয়। যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রসূত হবার পর দেখা যায় যে, সেই সন্তান মেয়ে, তা হলে সে-মেয়ের বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হয়। আর যদি দেখা যায় যে, প্রসূত সন্তান মেয়ে নয়, তা হলে সে-বিবাহ নাকচ হয়ে যায়। আবার, বিবাহ-বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে যদি কোনও পাত্র পাওয়া না যায়, তা হলে সেই অনূঢ়া মেয়ের বিবাহ একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে দেওয়া হয় ; পরে পাত্র পাওয়া গেলে, ওই ফুলের গুচ্ছটিকে কোন কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, এবং তখন সেই পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পাত্র পাওয়া না গেলে, ওই মেয়ের বিবাহ অন্য কোন

বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হয় এবং বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওই বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। মেয়েটি তখন বিধবা বলে গণ্য হয় এবং পরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান দ্বারা পুনরায় তার বিবাহ দেওয়া হয়। আবার বরোদার বর্দভদের মধ্যে বিবাহের নির্দিষ্ট দিন ১২, ১৫ বা ২৪ বৎসরের ব্যবধানে স্থিরীকৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের আগারিয়াদের মধ্যে বিবাহের দিন পাঁচ-ছয় বৎসর অন্তর নির্দিষ্ট হয়, এবং ওই নির্দিষ্ট দিনে সকল পরিবারই পরিবারস্থ সকল ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। মাদ্রাজের চেট্টিদের মধ্যে বিবাহের দিন দশ বা পনেরো বৎসর অন্তর নির্দিষ্ট হয়। আবার গঙ্গা ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী ভূভাগে বারো বৎসর অন্তর সিংহ রাশিতে যখন বৃহস্পতির সংক্রমণ হয় তখন বিবাহ ও অন্যান্য ধর্মকর্ম রহিত থাকে।

উপরি-উক্ত বিবরণে যেন-তেন প্রকারে নির্দিষ্ট দিনে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেবার কারণ হচ্ছে হিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিশুদ্ধিকরণের জন্য হিন্দুদের যে দশবিধ সংস্কার আছে, বিবাহ তার মধ্যে শেষ সংস্কার। অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় আচরণ বলে বিবাহ ব্যাপারে হিন্দুদের নানা আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্তী হতে হয়। এসব আচার-অনুষ্ঠানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: (১) স্ত্রী-আচার, ও (২) পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত শাস্ত্রীয় আচার। স্ত্রী-আচার পরিবারস্থ মেয়েদের মধ্যে যারা সধবা, তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। মেয়েলি সমাজে পুরোহিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আচারের চেয়ে স্ত্রী-আচারের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এগুলির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে বর-কনে উভয়েরই অমঙ্গল ঘটবে। এগুলির ওপর যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রী-আচারগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের পূর্বে যতরকম বাধা-বিপত্তি ঘটতে পারে সেগুলিকে প্রতিহত করা। আর পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য

সম্পর্ককে পবিত্রীকৃত করা। এসময় মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি-কামনা করা হয় ও দেবতাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হয়।

হিন্দুর জীবনে বিবাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে পাপমুক্ত করে বিশুদ্ধিকরণ করবার জন্য হিন্দুর যে দশবিধ সংস্কার আছে, বিবাহ হচ্ছে তার শেষ বা চরম সংস্কার। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের কুলসম্পর্কের চ্যুতি ঘটে। গোত্র দ্বারাই হিন্দুদের মধ্যে কুলসম্পর্ক সূচিত হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোককে পিতৃকুলের গোত্র পরিহার করে স্বামিকুলের গোত্র গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য হিন্দুনারীর পক্ষে বিবাহজীবনের সূচনা চরম সন্ধিক্ষণ। এরূপ সন্ধিক্ষণে যাতে কোন বাধাবিপত্তি না ঘটে, তার উদ্দেশ্যেই আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালিত হয়।

আচার-অনুষ্ঠানগুলির একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। বর-কনের মধ্যে যে বিবাহ ঘটছে এবং সে-বিবাহ যে অবৈধ নয়, সাধারণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রকাশ করাও এইসকল আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সেজন্য জগতের সকল জাতির মধ্যেই বিবাহ উপলক্ষে আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিয়ম আছে, যদিও এসকল আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রকমের। আবার একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের রীতি বা প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কথাই ধরুন। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক অংশ হিসাবে পাঞ্জাবে 'ফেরে' বা যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। উত্তরপ্রদেশের বহুস্থানে কিন্তু যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করা হয় না। সে-সব স্থানে বিবাহের জন্য যে মণ্ডপ নির্মিত হয় বা দণ্ড স্থাপিত হয়, তাই প্রদক্ষিণ করা হয়। বাঙলা, বিহার ও ওড়িশায় কন্যার সিঁথিতে 'সিঁদুরদান'ই অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক প্রথা। আবার অনেক জায়গায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কাঁটার সাহায্যে আঙুল থেকে রক্ত বের

করে সেই রক্ত উভয়ে উভয়কে মাখিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্রে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা 'প্রদক্ষিণ' প্রথা অনুসরণ করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বর-কনের ওপর কেবলমাত্র চাউল, জল বা দুধ ছিটিয়ে দেয়। দক্ষিণ ভারতে প্রায় সর্বত্রই 'তালিবন্ধন' প্রথাই বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ।

উপরে যে-সমস্ত প্রথার কথা বলা হল সেগুলি হচ্ছে মাত্র অপরিহার্য অংশ। এ-ছাড়াও অনেক আড়ম্বরপূর্ণ ও বিশদ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ-সকল আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য একাধিক দিন লাগে এবং এগুলি পুরোহিত ও বাড়ির মেয়েদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সাধারণত পুরোহিত যে অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন সেগুলি ধর্মীয় আচরণ। আর মেয়েরা যেগুলি করে সেগুলি লোকাচার সম্পর্কিত। এই উভয়বর্গীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য হল নব-দম্পতির সুখ, শান্তি, আয়ু ও মঙ্গল কামনা করা।

বাঙালী হিন্দু-বিবাহের উৎসব তিনদিনের। বিবাহ উপলক্ষে পিঁড়িতে বিশেষ আলপনা দেওয়া হয় ও একটি 'শ্রী' তৈরি করা হয়, বিয়ের তিনদিন আবশ্যিকভাবে বরকে একটা জাঁতি ও কনেকে একটা কাজললতা বহন করতে হয়। তা ছাড়া, প্রথম দিন বিবাহ সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত বর ও তার মাকে উপবাসী থাকতে হয়। পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয় মঙ্গলাচরণ, অধিবাস, নিদ্রাকলস, দধিমঙ্গল ইত্যাদি দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় কলাতলায় ক্ষৌরকর্মের পর গাত্রহরিদ্রা দিয়ে। পাঁচ বা সাত জন সধবা স্ত্রীলোক বরের কপালে তেল-হলুদ ছুঁইয়ে সেই তেল-হলুদ নাপিত মারফত পাঠিয়ে দেয় কনের বাড়ি। সঙ্গে যায় গায়ে-হলুদের তত্ত্ব। ওই তেল-হলুদ কনের কপালে ঠেকানো হয়।

মধ্যাহ্নের পর বর ও কনের বাড়িতে এক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়। একে আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ বলা হয়। এর উদ্দেশ্য, পিতৃপুরুষদের প্রীতিসাধন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করা। বিকালে স্নানের পর

সাজগোজ করে, বর টোপর মাথায় দিয়ে কলাতলায় এসে দাঁড়ায়, মায়ের 'আশীর্বাদ' অনুষ্ঠানের জন্য। মা ছেলেকে তিনবার জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, কোথায় যাচ্ছ?' ছেলে উত্তর দেয়, 'মা, আমি তোমার জন্য দাসী (আজকাল বলে 'বৌ') আনতে যাচ্ছি।' ছেলে একখানা থালায় করে আতপ চাউল ও একটা টাকা মায়ের আচলে ঢেলে দেয়। একে বলা হয় 'কনকাঞ্জলি'। কনের বাড়ি থেকে যখন খবর আসে যে বিয়ে হয়ে গেছে, তখন মা ওই চাল ফুটিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। বরের সঙ্গে যায় নিতবর বা 'মিতবর', নাপিত, পুরোহিত ও বরকর্তা। যাবার সময় মেয়েরা উলুধ্বনি দেয় ও শাঁখ বাজায়। এদের অনুসরণ করে বরযাত্রীর দল।

এদিকে কনের বাড়িতে কলাতলার কাজের পর, কনেকে স্নান-প্রসাধন ও সাজগোজ করানো হয়। তারপর তাকে একখানা লালরঙের শাড়ি পরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা পিঁড়ির ওপর বসিয়ে রাখা হয়। ইতিমধ্যে কনের বাড়তে 'হাই-আমলা' বাটা হয়। একখানা বাটনা বাটবার শিলকে উল্টো করে পেতে তু'জন সধবা স্ত্রীলোক পরস্পরের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে বিপরীতমুখী হয়ে বসে হাই-আমলা (আমলকী ও অন্যান্য দ্রব্য বেনের দোকানে পাওয়া যায়) বাটে। এ-ছাড়া, ছাদনাতলায় ব্যবহারের জন্য তু'গাছা ছুঁড়ি সংগ্রহ করা হয়। একখানা কুলোর উল্টো পিঠে ধুতুরা ফলকে চিরে ২১টা প্রদীপ তৈরি করে সাজানো হয়। এ-ছাড়া, মোনামুনি-ভাসানো ইত্যাদি মেয়েলি আচারগুলি সম্পাদন করা হয়।

বরের গাড়ি কনের বাড়ি গিয়ে পৌঁছালে, মেয়েরা শাঁখ বাজায়, উলুধ্বনি দেয় ও বরের গাড়ির তলায় এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। তারপর বরকে হাত ধরে নিয়ে এসে আসরে বসানো হয়। বরপক্ষীয় লোকেরাও সেখানে বসে। আশীর্বাদ যদি আগে না হয়ে থাকে, বরকনের আশীর্বাদও তখন হয়।

বিবাহ-লগ্নের কিছু আগে বরকে বিবাহমণ্ডপ বা কক্ষে নিয়ে আসা হয়। সে বস্ত্রপরিবর্তন করে কন্যাপক্ষের দেওয়া কাপড় পরে। বিবাহকক্ষে কিছু মন্ত্রপাঠের পর বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। কনের বাড়ির কলাতলাই হল ছাদনাতলা। ছাদনাতলার অনুষ্ঠানের কর্ণধার হচ্ছে নাপিত। ছাদনাতলার কাজ শুরু হবার আগে জ্যেষ্ঠ জামাতাকে কিছু কাপড়-চোপড় ও উপহার দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'জামাইবরণ'। তারপর সধবারা বরণডালা, ধুতুরার প্রদীপ ইত্যাদি নিয়ে এসে সেখানে স্ত্রী-আচারসমূহ সম্পাদন করে। তাদের কার্য সম্পন্ন হলে পিঁড়ির ওপর উপবিষ্ট ও পান দিয়ে মুখ-ঢাকা অবস্থায় কনেকে বহন করে নিয়ে আসা হয়। বরকে বেষ্টন করে কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর ও কনের মাঝখানে একখানা লালপাড় কাপড় দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়। এবার ছড়ি দু'খানা নিয়ে নাপিত বলে, 'বর বড় না কনে বড়?' উত্তর আসে, 'বর বড়।' তারপর বর-কনের মাঝখানে যে লালপাড় কাপড়খানা আড়াল করা ছিল, সেখানা তুলে বর-কনের মাথার ওপর ঢাকা দেওয়া হয়। তখন বর-কনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে 'শুভদৃষ্টি' করে। আর নাপিত নানারকম কৌতুকপূর্ণ ও শ্রুতিরোচক ছড়া কাটে।

তারপর বর-কনেকে আবার বিবাহকক্ষে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সম্প্রদানের জন্য পুরোহিত কর্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ, হোমাদি ও 'বসুধারা' ক্রিয়া হয়। তারপর বর একটা (চাউল মাপার) রেকের সাহায্যে কনের সিঁথিতে 'সিঁদুর দান' করে। ওখানেই গাঁটছড়া বাঁধা হয়। বিবাহকার্য এখানেই সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে, বর-কনেকে বাসরঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জলযোগাদির পর শ্যালিকার দল বা ঠাকুরমা-দিদিমারা বরকে নিয়ে সমস্ত রাত্রি ঠাট্টা-তামাশা করে।

সকালে বর-কনে যাবার আগে শ্যালিকারা 'সেজ-তোলানি',

'ননদ-ভোলানি' ইত্যাদি বাবদ বরের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে নেয়। পল্লীগ্রামে 'গ্রামভাটি'র চাঁদাও দিতে হয়।

বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ি পৌঁছালে মেয়েরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেয়। বরের মা বা অন্য কেউ গাড়ির তলায় ঘড়া থেকে জল ঢেলে দেয়। আগেকার দিনে কনেকে কোলে করে গাড়ি থেকে নামানো হত। আজকাল কনে নিজেই নামে। বাড়ির প্রবেশপথে কনেকে একটা 'ল্যাটা' মাছ থালার ওপর ধরতে বলা হয়। একটা ভাঁড়ে দুধ ফোটানো হয়; দুধ ফুটে উঠলে সেটা শুভ বলে মনে করা হয়।

তারপর বরের ছোট ভাই বর-কনের পথ রোধ করে। ছোট ভাই বলে, 'দাদা বল, আমার বিয়ে দেবে তো?' বর বলে, 'হ্যাঁ দেব।' তখন ছোট ভাই পথ ছেড়ে দেয়। তারপর বর কনে ঘরে গিয়ে বসলে, মেয়েরা বর-কনেকে নিয়ে 'কড়ি-খেলা' খেলে।

সেদিন কালরাত্রি। সেদিন বর-কনে আর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে না। পরের দিন দুপুরে পাকস্পর্শ। কনে বরের আত্মীয়স্বজনের পাতে পরমান্ন দেয়। এটাই সামাজিক স্বীকৃতি যে তার স্পৃষ্ট অন্ন সকলে গ্রহণ করবে। রাতে ফুলশয্যা। কনের বাড়ি থেকে ফুলশয্যার তত্ত্ব আসে। প্রীতিভোজ হয়। রাত্রে ফুলশয্যা হয়, তার মানে সেদিনই বর-কনে একশয্যায় শোয়।

এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। তবে এরপর কয়েক দিনে হয় দ্বিরাগমন, সত্যনারায়ণ ও সুবচনীর পূজা, মুঙ্গলি হাঁড়ি ঢাকা ইত্যাদি।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এটা তামিলনাড়ুর আচার-অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যাবে। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান পাঁচদিন ধরে চলে। তবে এর মধ্যে দু'দিনের অনুষ্ঠানসমূহই হচ্ছে প্রধান। এ দু'দিন হচ্ছে বিবাহের দিন ও তার পূর্বদিন। বিয়ের আগের দিন বরের দল (এর মধ্যে থাকে বরের পিতামাতা ও ভাই-

বোনেরা) আসে কনের গ্রামে। সেখানে স্বতন্ত্র বাড়িতে তাদের থাকা, আদর-আপ্যায়ন ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে তারা নিকটস্থ কোন মন্দিরে গিয়ে দেবতার অর্চনা করে। তারপর তারা বরকে একটি সজ্জিত যানে করে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে যায়। একে বলা হয় 'যানবাসন' বা "মপ্পিপলই আঝাইপপু' বা বরানুগমন। বিবাহমণ্ডপে সমবেত লোকের সামনে ঘোষণা করা হয় যে, পরদিন ওই বরের সঙ্গে অমুকের মেয়ের বিয়ে হবে। একে বলা হয় 'নিচয় থারথম্' এবং এই অনুষ্ঠানের সময় বর-কনেকে একসঙ্গে বসানো হয়। এরপর ভোজ উৎসব হয়।

বাঙলাদেশে বিবাহ হয় রাত্রে, আর তামিলনাড়ুতে বিবাহ হয় দিনের বেলায় মধ্যাহ্নের পূর্বে। বিবাহের দিন প্রাতের প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে 'ব্রতম্'। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবদম্পতির সুখশান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা এবং সমস্ত বাধাবিপত্তি ও অমঙ্গল প্রতিহত করা। এইসময় কতকগুলি কপটভাবের ভান করা হয়। বর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দেয়, তার জন্য একটি যোগ্যা পাত্রীর অন্বেষণে; আর নিজে একটি পুঁটুলির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, একটি ছাতা ও লাঠি নিয়ে 'কাশীযাত্রা' করে। এই কপটভাবের দ্বারা সে দেখাতে চায় যে উপযুক্ত পাত্রী না পাওয়াব জন্য সে দেশত্যাগী হয়ে কাশী যাচ্ছে। এইসময় পথে মেয়ের বাপ তার গতি রোধ করে তাকে বলে যে, তার একটি উপযুক্ত মেয়ে আছে এবং মেয়েটিকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে।

তারপর বর-কনেকে একটি ঝোলায় বসানো হয় এবং মেয়েরা স্ত্রী-আচার ঘটিত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করে।

এরপর মূল অনুষ্ঠানসমূহ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই বিবাহ অনুষ্ঠানের মূল অংশ হচ্ছে 'তালিবন্ধন'। তালির অপর নাম হচ্ছে 'থিরুমঙ্গলম্'। বিবাহের শুভমুহূর্তে বর কর্তৃক কনের গলায়

থিরুমঙ্গলম্ বেঁধে দেওয়া হয়। এটা আমাদের বাঙলাদেশের 'সিঁদুর-দান'-এর পরিবর্ত মাত্র। থিরুমঙ্গলম্ জিনিসটা কী তা এখানে একটু বিশদভাবে বলা দরকার। থিরুমঙ্গলম্ হচ্ছে সোনার তৈরি 'লকেট'-এর মত একটা জিনিস যার ওপর শিবলিঙ্গ বা কোন ফুল খোদিত থাকে। বিশেষ আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সঙ্গে এই জিনিসটা স্বর্ণকারকে তৈরি করতে দেওয়া হয়। একখানা আলপনা-দেওয়া পিঁড়ির ওপর স্বর্ণকারকে পূর্বদিকে মুখ করিয়ে বসানো হয়, এবং তাকে থিরুমঙ্গলম্ তৈরি করবার জন্য সোনা ও একটি থালায় করে পান, সুপারি, আতপ চাউল ও কিছু দক্ষিণাসমেত একটি 'সিধে' দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতে সধবা স্ত্রীলোককে 'সুমঙ্গলী' বলা হয়। আমাদের বাঙলাদেশে সিঁথির সিঁদুর ও হাতের 'নোয়া' যেমন সধবা স্ত্রী-লোকের চিহ্ন, দক্ষিণ ভারতে তেমনি থিরুমঙ্গলম্ 'সুমঙ্গলী' স্ত্রী-লোকের চিহ্ন।

দক্ষিণ ভারতে বিবাহের শুভলগ্নের সময় বর ও কনেকে পিঁড়ির ওপর বসানো হয়। তারপর পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে হোম দেয়। এইসময় বর একখানা মূল্যবান শাড়ি সমেত থিরুমঙ্গলম্টি কনের হাতে দেয়। বরকেও ওইসময় একখানা মূল্যবান বস্ত্র দেওয়া হয়। ওই বস্ত্রকে 'অঙ্গবস্ত্র' বলা হয়। বর-কনে এইসময় বস্ত্র ও শাড়ি পরে। থিরুমঙ্গলম্টিকে হলুদসিক্ত সুতায় বেঁধে দেবতাদের কাছে উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়। উৎসর্গীকৃত হবার পর থিরুমঙ্গলম্টিকে একটি থালার ওপর রেখে সমবেত লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। তারপর একটা 'জোয়াল' পূজা করা হয় ও সেটা বর-কনের কাঁধের ওপর স্থাপন করা হয়। এর রূপকার্থ হচ্ছে, বর-কনে উভয়ে যেন জোয়াল-গ্রথিত বলদের ন্যায় যুক্তভাবে জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়।

তারপর কনেকে তার বাপের কোলে বসানো হয় এবং মন্ত্র-উচ্চারণ

ও ঢাকঢোলের বাজনার মধ্যে দিয়ে বর-কনের গলায় থিরুমঙ্গলম্‌টি বেঁধে দেয়। বর মাত্র একটা গেরো দেয়, বাকি গেরো দেয় বরের বোনেরা। এর পরই 'পাণিগ্রহণ' ও 'সপ্তপদীগমন' অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বর-কনেকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং কনের একটি পা পাথরের ওপর রাখতে বলা হয়, যাতে স্বামীর প্রতি তার ভক্তি ও অনুরাগ পাথরের মত দৃঢ় হয়।

রাত্রে 'শেষহোমম্‌' সম্পাদন করে বর-কনেকে আকাশে ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দুটির প্রতি তাকাতে বলা হয়। বর পরের দিন কনেকে নিয়ে তার নিজের বাড়ি চলে যায়। একে বলা হয় 'গৃহপ্রবেশম্‌'।

পশ্চিম ভারতে, যথা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বিবাহ একদিনেই শেষ হয়ে যায়। উত্তর ভারতে হরিয়ানায় কিন্তু দু'দিন লাগে। মহারাষ্ট্রে মেয়ে পছন্দ হবার পর সকলকে সাক্ষী রেখে যৌতুকের জন্য 'ইয়াদী-পত্র' নামে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে যা-কিছু যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হবে, তা সবই এই চুক্তিপত্রে লেখা থাকে। ইয়াদী-পত্র স্বাক্ষরিত হবার পর মেয়ের বাবা পাত্র সমেত পাত্রপক্ষের সকলকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে ও তার সমক্ষে মেয়ের বাবা ছেলেকে ও ছেলের বাবা মেয়েকে 'কুঙ্কুমতিলক' পরিয়ে দেয়। এরপর ছেলের বাবা একটা জরি দিয়ে তৈরি ঠোঙায় করে মেয়ের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দেয়। এই অনুষ্ঠানকে 'সাখরপুড়া' বলা হয়। এটাই বিবাহের 'পাকা দেখা'। বিয়ের আগের দিন সকালে মেয়ের বাড়িতে হয় 'বাঙনিশ্চয়' অনুষ্ঠান, আর সন্ধ্যেবেলা ছেলের বাড়িতে হয় 'সীমন্তপূজন' অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সকালে বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই হয় 'হল্‌দী' বা গায়ে-হলুদ। তারপর মেয়েরা দেওয়ালে চন্দ্র-সূর্য ও নানারকম মাঙ্গলিক চিহ্নের নকশা আঁকে ও তার সামনে উঁচু পিঁড়িতে একটি লক্ষ্মীমূর্তি স্থাপন করে। একে বলা হয় 'দেবক'। মেয়েকে এই লক্ষ্মীমূর্তির সামনে বসিয়ে রাখা হয়।

বর এলে, মেয়ের বাবা-মা জল ও দুধ দিয়ে বরের পা ধুইয়ে দেয়। তারপর যেখানে বিয়ে হবে সেখানে বরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সামনা-সামনি দু'খানা পিঁড়ি থাকে। বরকে একটা পিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। দুজন মহিলা একখানা কাপড়ের দু'কোণ ধরে বরের সামনেটা আড়াল করে দেয়। একে 'অন্তরপট' বলা হয়। তারপর কনের মামা কনেকে নিয়ে এসে তাকে অপর পিঁড়িতে দাঁড় করায়। এরপর আটবার 'মঙ্গলাষ্টক' মন্ত্র পাঠ করা হয়। 'মঙ্গলাষ্টক' শেষ হলে বর-কনের মধ্যবর্তী কাপড়টা সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন কনে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, আর বর সোনার পুঁতি দিয়ে তৈরি 'মঙ্গল-সূত্তম্' কণ্ঠী কনের গলায় পরিয়ে দেয়। তারপর বর-কনে পাশাপাশি বসে এবং মেয়ের বাবা কন্যাদান করে। মহারাষ্ট্রের কন্যাদান অনুষ্ঠানটি একটু বিচিত্র। বরের হাতের ওপর কনের হাত রেখে কনের বাবা মেয়ের হাতে একটু জল ঢেলে দেয়। মেয়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল বরের হাতে পড়লেই কন্যাদান অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর লাজ-হোম, অগ্নি-প্রদক্ষিণ, ঘৃতাহুতি ও সপ্তপদীগমন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর হয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপার। এরপরই বর-কনে বিদায় নেয়।

বরের বাড়িতে সদর দরজায় এক কুনকে চাল রাখা হয়। কনে এসে প্রবেশ করবার সময় পা দিয়ে সেই চালের কুনকে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বর এইসময় কনের নূতন নামকরণ করে। মহারাষ্ট্রে মেয়েদের বিয়ের পর বাপের বাড়িতে দেওয়া নাম পরিহার করতে হয়। বিয়ের পর স্বামী যে নূতন নাম দেয়, সেই নামেই সে পরিচিতা হয়। রাত্রেই বর-কনের ফুলশয্যা হয়।

গুজরাটে বরপক্ষ যখন প্রথম মেয়ে দেখতে আসে তখন সেইসঙ্গে ছেলে নিজেও আসে। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কথাবার্তা শেষ হলে এবং মেয়ে পছন্দ হলে, সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মাত্র

ছেলে ও মেয়ে সেই ঘরে থাকে ও তারা নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামত আলাপ করে। তারপর বরপক্ষকে নানারকম মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়। একে 'মিঠাজিভ' বলা হয়।

তার পরদিন যে অনুষ্ঠান হয়, তাকে 'সওয়া রূপিয়া লিয়া' বলা হয়। এই অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের সকলেই শ্রীনাথজী ঠাকুরের নামে সওয়া রূপিয়া নিবেদন করে। পরে ওই টাকা শ্রীনাথজীর মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর হয় 'চুনরি প্রসঙ্গ'। এই উপলক্ষে ছেলের মা একখানা সবুজরঙের জরির নকশাদার শাড়ি, অলঙ্কার, মিষ্টান্ন, নারিকেল প্রভৃতি নিয়ে মেয়ের বাড়ি যায় ও তাকে কুমকুমের তিলক পরিয়ে সেগুলি তার হাতে দেয়। এ-ছাড়া, মেয়ের নাকে একটি নাকছাবি ও পায়ে রূপার আংটি পরিয়ে দেয়। এরপর 'নারিকেল বদলি' অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েপক্ষের মহিলারা ছেলের বাড়ি যায় ও বরকে কুমকুমের তিলক পরিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে। তারপর মেয়ের ভাবী ননদ বা জা এসে মেয়েকে ছেলের বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে মেয়ের পায়ে কুমকুম লাগিয়ে একখানা সাদা কাপড়ের ওপরে ছু'পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। ছেলের মা তাকে একখানা নূতন শাড়ি দেয় ও আদর করে তাকে সরবত খাওয়ায়।

গুজরাটে বিয়ে সাধারণত ছুপুরবেলা হয়। সবুজ বা লাল রঙের শাড়ি পরে বিয়ে হয়। বর বিয়ে করতে এলে মহিলারা বরের প্রশংসায় গান করে এবং কনে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। বরও কনের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। তারপর কনের মা বরকে আরতি করে ও জলপূর্ণ কলসী নিয়ে বরণ করে। তারপর পুরোহিত যজ্ঞাগ্নি জেলে মন্ত্রপাঠ করেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে মেয়ের বোন বা 'ভাবী' (বউদি) মেয়েকে নিয়ে বিবাহমণ্ডপে আসে। একটুকরো হলুদ-ছোপানো কাপড় মেয়ের শাড়ির আঁচলের সঙ্গে বেঁধে বরের কাঁধের ওপরে স্থাপন করা

হয়। তারপর বর-কনে চারবার হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করে। একে 'ফেরা' বলা হয়। তারপর বর-কনেকে দেবতার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ভোজ হয়। ভোজ শেষ হলে সেই রাত্রেই বর-কনে বিদায় নেয়। বর-কনে বাড়ি পৌঁছালে বরের মা তাদের আরতি করে ঘরে তোলে। তারপর বর-কনেকে দিয়ে গণেশপূজা করানো হয়। সেই রাত্রেই ফুলশয্যা হয়।

হরিয়ানাতেও বিবাহে হিন্দুর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মাল্যদান, হবন বা হোম, গাঁঠবন্ধন, কন্যাদান, অগ্নিপ্রদক্ষিণ, লাজবর্ষণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। তবে অগ্নিপ্রদক্ষিণ শেষ হলে বরের বোনেরা কনেকে মালা পরায় ও মিষ্টিমুখ করায়। এই অনুষ্ঠানকে 'চৌকা' বলা হয়। এর জন্য মেয়ের মা বরের বোনেদের শাড়ি দেয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি প্রথা হরিয়ানায় দৃষ্ট হয়। যেমন, বিবাহমণ্ডপে কলাগাছ বসানো, রাত্রিকালে বিবাহ, বিয়ের পরের দিন বর-কনের বিদায় ইত্যাদি। কনে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছালে শাশুড়ী সদর দরজায় এসে বর-কনেকে দুধভরা ঘটি দিয়ে আশীর্বাদ করে। পশ্চিমবঙ্গের মত কনের কোলে একটি ছোট ছেলেকেও বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই রাত্রেই 'সোহাগ রাত' বা ফুলশয্যা হয়।

আদিবাসী-সমাজেও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাহবিষয়ক আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে হিন্দুদের তুলনায় আদিবাসী-সমাজের আচার-অনুষ্ঠান অনেক পরিমাণে সরল, সংক্ষিপ্ত ও আড়ম্বরহীন। বিবাহ সাধারণত একদিনেই সমাপ্ত হয়। তবে কোনও কোনও উপজাতি-সমাজে এর জন্য একাধিক দিনও লাগে। যেমন মধ্যপ্রদেশের বারগুণ্ডাদের মধ্যে বিবাহ তিনদিনে সমাপ্ত হয়। আদিবাসী-সমাজে বিবাহ সাধারণত কোনও জ্যেষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়া বা পঞ্চায়েত বা বাইগা (ওঝা) দ্বারা সম্পাদিত হয়। তবে যে-সকল উপজাতি হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়েছে (যেমন মধ্যপ্রদেশের পাতলিয়া ভীলজাতি বা যশপুরের

গোণ্ডজাতি), তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারাই বিবাহ সম্পাদন করায়। আবার উপজাতিদের মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় বিবাহ অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় রূপ দেবার জন্য দেবদেবীর পূজাও করা হয়। কোনও কোনও জায়গায় অনুষ্ঠানের কোনও বালাই নেই; মাত্র মালাবদল, বা তালিবন্ধন, বা কন্যার সিঁথিতে সিঁদুরঘর্ষণ, বা কন্যাকে লুণ্ঠন করবার নাটকীয় অনুকরণ করেই বিবাহ দেওয়া হয়। এ-সম্পর্কে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের যে বৈচিত্র্য আছে তা নিচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে।

প্রথমেই শুরু করছি আমাদের প্রতিবেশী সাঁওতালদের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে। সাঁওতালদের মধ্যে বরপণ নেই। মাত্র কন্যাপণই আছে। কন্যাপণের টাকা মেয়ের বাবা, মা, ঠাকুরমা ও দিদিমাকে দিতে হয়। এখন অনেক জায়গায় টাকার পরিবর্তে মেয়ের মা, ঠাকুরমা ও দিদিমাকে শাড়ি দেওয়া হয়। সাঁওতাল সমাজে বরের বাবাকেই মেয়ে খুঁজতে হয়, মেয়ের বাবাকে নয়। তার মানে সাঁওতাল-সমাজে কন্যাদায় নেই। মেয়ে খোঁজবার কাজটা সমাধা করে ঘটক (সাঁওতালী ভাষায় 'রায়বার')। রায়বার কনে খুঁজে বের করলে, বরপক্ষ গ্রামের জগমাঝির সাহায্যে মেয়ে দেখতে যায়। মেয়ে পছন্দ হলে কন্যাপক্ষ বরের গ্রামে গিয়ে তার ঘরবাড়ি দেখে যায়। তারপর শুভদিনে বরকে আশীর্বাদ করা হয় ও পণ দেওয়ার কাজ সারা হয়। বিয়ের দিন ধার্য হলে একটা বিবাহমণ্ডপ তৈরি করে পূর্বপুরুষদের নামে 'হাঁড়িয়া' উৎসর্গ করা হয়। তারপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে তিনটি মুরগি উৎসর্গ করা হয় ও মণ্ডপের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে তিনটুকরো কাঁচা হলুদ, কয়েকটি আতপ চাউল ও দূর্বাঘাস আমপাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে সেই গর্তে রাখা হয়। একটি মহুয়াগাছের ডালও সেখানে পোঁতা হয় এবং সেই ডালটিকে খড়ের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার গায়ে আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়।

সাঁওতাল-সমাজে ‘গায়ে-হলুদ’ দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এতে অংশগ্রহণ করে বরের বউদি ও তিনটি অনূঢ়া মেয়ে। এরা ছাড়া, আরও অংশগ্রহণ করে গ্রামের নায়কে, পুরোহিত ও অন্যান্য অনূঢ়া মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে নাচগান হয়। কনের বাড়িতেও ঠিক এইভাবে ‘গায়ে-হলুদ’ হয়। গায়ে-হলুদের তেল-হলুদ বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পাঠানো হয়।

গায়ে-হলুদ হয়ে গেলে আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে ‘আইবুড়োভাত’ খাওয়া হয়। আত্মীয়স্বজন সকলেই নূতন বস্ত্র উপহার দেয়।

তারপর গ্রামের ছেলেমেয়েরা নাচগান করে ‘বিবাহমণ্ডপ জাগান’ অনুষ্ঠান উপলক্ষে। আর জগমাঝি (সহকারী মাঝি) পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ‘জলবিবাহ’ অনুষ্ঠান সমাধা করে।

সাঁওতালদের বিবাহ (বাঙালী হিন্দুদের মত) মেয়ের বাড়িতে হয়। বরকে নিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা করবার পূর্বে বরের বাবা গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ‘হাঁড়িয়া’ উৎসর্গ করে বরের ও বরযাত্রীদের (সাঁওতাল-সমাজে এদের ‘বারিয়াত’ বলা হয়) মঙ্গল কামনা করে। তারপর কনের বাড়ির সীমানায় পৌঁছালে, সেখানকার ছেলেরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে যুদ্ধের মত অঙ্গভঙ্গী করে নাচগান করে। তারপর বরকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বরকে স্নান করানো হয়। স্নানের পর বরের ভগ্নীপতি বরকে কাঁধে করে নিয়ে আসে। অনুরূপ-ভাবে কনের ভাইকেও কাঁধে করে তুলে আনা হয়। বর কনের ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে ও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আলিঙ্গন করে।

তারপর কনেকে একটা বড় ডালায় করে আনা হয়। বর-কনে পরস্পরের গায়ে আতপ চাউল ছোঁড়ে ও আমডালের পাতা দিয়ে পরস্পরের গায়ে জলের ছিটে দেয়। বিবাহমণ্ডপ তিনবার প্রদক্ষিণ করবার পর বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেবার জন্য শালপাতায় মোড়া

সিঁদুর বের করে। বর বসুধারাকে স্মরণ করে ও সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে কনের সিঁথিতে তিনবার সিঁদুর লেপে দেয়। এইসময় কনের বড় বোন গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। তারপর কনের মা বর বরণ করে বরকে ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কনের মা বর-কনের মুখে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয় ও বরের কানের গোড়ায় সিঁদুরের ফোঁটা ও কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। বর-কনেও কনের মায়ের মুখে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয়। তারপর নানারকম স্ত্রী-আচার চলে।

বিদায়ের দিন কনের বাড়িতে নাচগান ও খাওয়া-দাওয়া চলে। শুভমুহূর্তে বাপ-মা মেয়েকে বিদায় দেয়। বিদায়ের পর বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সবাই একসঙ্গে বর-কনের সঙ্গে যায়। গ্রামের সীমানায় পৌঁছে তারা অপেক্ষা করে। সেখানে সকলকে আপ্যায়ন করবার জন্য বরের বাড়ি থেকে খাবার-দাবার আসে। একে 'ধুড়ি জলাউরি দাকা' বলা হয়।

কিছুক্ষণ পরেই বরের মা ও মাতৃস্থানীয়ারা এসে বর-কনের হাত মুখ ধুইয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে যায়। তারপর বরের বাড়ি থেকে খবর এলে বর-কনে গ্রামে প্রবেশ করে। যাবার পথে প্রতি বাড়ি থেকেই তাদের গুড়-জল খাওয়ানো হয়। তারপর আবার কিছু স্ত্রী-আচার হয়। তারপর বর-কনে স্নান করে। স্নান করার পর তারা গ্রামের নায়কে, মাঝি, পারানিক ও আত্মীয়স্বজন সকলের পা ধুইয়ে দেয় এবং তাদের প্রণাম করে। কনে ভাশুরেরও পা ধুইয়ে দেয় এবং ভাশুর কনের ডান হাতের কনুইতে জল ঢেলে দেয় এবং কনেও ভাশুরের ডান হাতের কনুইতে জল ঢেলে দেয়। তারপর থেকে নববধূ ভাশুরকে তার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে।

সেদিন সারাদিনই বাড়িতে নাচগান চলে। রাত্রে প্রীতিভোজ ও সুরাপান হয়। এখানেই বিবাহের সমাপ্তি ঘটে। তবে সাঁওতাল-সমাজে অন্য বর্গের বিয়েরও প্রচলন আছে। সে-কথা আগেই বলেছি।

ভীলদের মধ্যে বর তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়াদের নিয়ে কনের বাড়ি যায়। সেখানে বরের বাবা কনের পিতামাতাকে কিছু অর্থদান করে। তারপর বর-কনেকে একসঙ্গে বসানো হয় এবং দলের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ তাদের ঘিরে নাচগান করে। এরপর ভোজ ও মদ্যপান চলে এবং তার সঙ্গেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

গোণ্ডদের মধ্যে বরযাত্রা ও কন্যাপক্ষ উভয় দলই নিজ নিজ বাড়ি থেকে রওনা হয় এবং মাঝপথে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এখানে উভয় দলের মধ্যে দানসামগ্রীর আদানপ্রদান ঘটে। তারপর বর-কনে জলভর্তি একটি মঙ্গলঘট সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে দল বেঁধে নাচগান ও মদ্যপান করে উৎসব শেষ করা হয়।

মারিয়াদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বরের বাড়িতে। মেয়ের বাপ-মা কনেকে সেখানে নিয়ে যায়। কোনও দেবদেবীর পূজা হয় না, কিন্তু একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। তারপর সকলে মদ্যপান করে।

উদয়পুরের পাণ্ডা জাতির মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে একটি দণ্ড স্থাপন করা হয় এবং সাতবার সেই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে বিবাহকর্ম শেষ করা হয়।

উদয়পুরের সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান খুবই সরল এবং দু'জন কুমারী মেয়ে এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করে।

ওরাঁওদের মধ্যে যারা ক্রীশ্চান তারা প্রথমে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করার পর আবার উপজাতি-সমাজের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করে।

নীলগিরি পাহাড়ের পালিয়ানদের মধ্যে বরের বোন কনের গলায় 'তালি' বেঁধে দেয় এবং সেইসময় নিকটস্থ কোনও বাড়ি থেকে কোনও লোক চেঁচিয়ে ঘোষণা করে যে অমুকের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। তখন সংলগ্ন কোনও বাড়ি থেকে কোনও প্রবীণ ব্যক্তি তার উত্তর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, এ বিয়েতে আমাদের সকলের সম্মতি আছে।'

মাহুরার পালিয়ানদের মধ্যে অনুষ্ঠান আরও সরল। এদের মধ্যে রীতি হচ্ছে, বর-কনে পরস্পরের গলায় কালো রঙের পুঁতির মালা বেঁধে দেয় এবং কনেকে বর একখানা কাপড় দেয়।

ওড়িশার পরোজাদের মধ্যে লুণ্ঠনের নাটকীয় অনুকরণ করা হয়। তাদের মধ্যে বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে বর বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়ির কাছে লুকিয়ে থাকে এবং কনে যখন সেই পথে একা আসে তখন সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাকে লুণ্ঠন করে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর কনের বাবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করতে আসে। এরপর এক কপট যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করে যখন সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা বরের বাড়ি গিয়ে মদ্যপান করে ও ভোজে যোগ দেয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মুড়ুবানদের মধ্যেও এরূপ লুণ্ঠন করে বিয়ে করার রীতি আছে। মুড়ুবানদের মধ্যে বিয়ের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ হচ্ছে, বর কনেকে একটা চিরুনি দেয় এবং কনে সেই চিরুনিটা চিরদিন মাথার পিছনদিকে খোঁপায় রাখে।

মান্নানদের মধ্যে রীতি হচ্ছে বরের বোন কর্তৃক কনের গলায় 'তালি' বেঁধে দেওয়া।

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে তালিবন্ধন দ্বারাই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান সাধারণত কনের বাড়িতেই হয়। তবে কোথাও কোথাও বরের বাড়িতে হওয়ার প্রথাও আছে। মাণ্ডালা ও বালাঘাটের বাইগাদের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেলে বরের বাবা দু'বোতল মদ নিয়ে এসে কনের বাবাকে উপহার দেয়। এই মদের কিছু অংশ বুড়া দেওতার কাছে উৎসর্গ করা হয়; আর বাকিটা সমবেত সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'সাগাই' বলা হয়। একপক্ষকাল পরে বরের দল চার বোতল মদ নিয়ে আবার কনের বাড়ি আসে। কনের বাপ-মা তাদের ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করে এবং বিয়ের দিন স্থির করে। এই অনুষ্ঠানকে 'বরোখি' বলা হয়।

এরপর কনের বাবাকে দশদিন সময় দেওয়া হয় বিয়ের আয়োজন করবার জন্য। দশদিন পরে বরের দল কনের বাড়ি আসে। কনের বাবা তাদের ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করে এবং সমস্ত রাত্রি নাচগান চলতে থাকে। মদ্যপানও রীতিমত হয়। পরের দিন অপরাহ্নে 'ভানওয়ার' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয় এবং মাটিতে এক দণ্ড পোঁতা হয়। কনেকে নিয়ে বর তিনবার এই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে। তারপর বর-কনে ও কনের বাপ-মা বরের বাড়ির দিকে রওনা হয়। বরের বাড়িতেও একটা অনুরূপ মণ্ডপ তৈরি করা থাকে এবং সেখানেও একটি দণ্ড পোঁতা থাকে। কনেকে নিয়ে বর সাতবার ওই দণ্ড প্রদক্ষিণ করে। তারপর ভোজ ও মদ্যপান করে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়।

মধ্যপ্রদেশের অপরাপর উপজাতিদের মধ্যেও অনুরূপ অনুষ্ঠান-সমূহ প্রচলিত আছে। তবে ওরাঁও, কোরবা প্রভৃতি জাতিসমূহ মণ্ডপের পাশে একটি জাঁতা স্থাপন করে এবং তার ওপর পাঁচটি চাউলের স্তূপ রাখে। প্রতি স্তূপের ওপর যথাক্রমে একটি তামার পয়সা, হলুদ, সুপারি প্রভৃতি রাখা হয়। কনে একখানা কুলো হাতে নিয়ে বরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কনের ছোট ভাই কিছু খই ওই কুলোয় দেয়, আর বর পিছন দিক থেকে কনের হাত ধরে। তারপর তারা ওই কুলোর সমস্ত খই ছড়াতে ছড়াতে পাঁচবার মণ্ডপটি প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবার প্রদক্ষিণ করবার সময় কনের পা দিয়ে বর জাঁতার ওপর স্থাপিত চালের স্তূপগুলি মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। তারপর সিঁদুরদান অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামে এ-সম্পর্কে একটা অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেটা হচ্ছে, কনের বসা অবস্থায় তার ডান পায়ের ওপর বর বাঁ পায়ে দাঁড়ায় এবং একটা পাতা থেকে তেল নিয়ে কনের মাথায় মাখিয়ে দেয়।

মহবুবনগরের চেংচুদের মধ্যে বরের দল কিছু মহুয়া ফুল, মদ ও

একজন ঢুলিকে নিয়ে কনের বাড়ির দিকে রওনা হয়। কনের বাড়ির কাছাকাছি এলে ঢাকী ঢাক বাজাতে আরম্ভ করে। তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা বরের দলকে অভ্যর্থনা করে। অভ্যর্থনা করে আহ্বান করে তাদের নিয়ে যাবার পর নাচ-গান, ভোজ ও মদ্যপান চলে। পরদিন সকালে সকলে একত্রিত হয়ে আবার ভোজ ও মদ্যপান করে। বর তারপর কনেকে একখানা শাড়ি, একখানা চেলি ও একটা পুঁতির মালা দেয়। কনে পুঁতির মালাটি নিজের গলায় পরে। এরপর সমাগত অতিথিরা ও কনের বাবা বরকে বলে, সে যেন স্ত্রীকে সুখে রাখে ও তার প্রতি যত্নবান হয়। এখানেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিবাহ উপলক্ষে উদয়পুরের নাগাসিয়াদের মধ্যে এক বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। বর আনুষ্ঠানিকভাবে নদীতে স্নান করবার পর তীরধনুক নিয়ে এক কল্পিত মৃগের দিকে সাতবার ধাবমান হয়। সাতবারের পর তার ভগ্নীপতি এসে তীরটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বর তাকে ধরবার জন্য পিছনে পিছনে ছোটে। যদি তাকে ধরতে না পারে, তা হলে এক আনা অর্থদণ্ড দিতে হয়। এখানেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তবে আনুষ্ঠানিক স্নানের পূর্বে যে-সকল আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলি উপজাতি ও হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণে রচিত।

যশপুরের রাউতিয়াদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে 'তুলহা দেও'-এর পূজা করা হয়। কনেকে একটা ডুলি করে নিয়ে আসা হয়। কালোরঙের ছোপবিশিষ্ট লালরঙের একটা ছাগল আনা হয় এবং এক জায়গায় রাশীকৃত চাউল রেখে তাকে খেতে দেওয়া হয়। তারপর সেই ছাগলটিকে বাড়ির বাইরে এক কোণে কাটা হয়। ছাগলের রক্ত বাড়ির ভেতরে এনে চাউলের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় ও তিনবার 'তুলহা-দেও'-এর কাছে প্রার্থনা দ্বারা নবদম্পতির সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়। তারপর রক্ত-ছিটানো চাউলগুলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এবং ছাগমাংস রান্না করে পরিবারের সকলে ও অতিথিরা খায়। এদের মধ্যে

অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি প্রতিবেশী অন্য উপজাতিদের মতই, কেবল দ্বিতীয় দিন বরকে একটি আমগাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে বরকে ওই আগুনের ওপর আটা, ঘি, গুড় ইত্যাদি ছিটিয়ে দিতে বলা হয়। পরে গাছটির চারদিকে সুতো জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ওর একটা ডাল এনে কনের বাড়ির বিবাহমণ্ডপে পুঁতে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে বিবাহের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নাপিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। বর-কনের মুখে ও গলায় সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করা হয়। তারপর আম-ডালের সাহায্যে বর-কনের ওপর শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়ার পর তাদের উভয়ের কাপড় নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। রাউতিয়ারা বলে যে তাদের মধ্যে এ-সকল আচার-অনুষ্ঠান আদিমকাল থেকে অনুসৃত হয়ে আসছে।

মধ্যভারতের কোল জাতির মধ্যে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান উপজাতি ও হিন্দু—এই উভয় সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে বাগ্‌দান ও বিবাহের লগ্ন স্থির হয়ে যাবার পর, বর-কনে উভয়ের বাড়িতে 'মঙ্গর-মাটি' অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়। বিবাহ উপলক্ষে যে-সমস্ত চুলা (উনুন) তৈরি করা হয় তার জন্য মাটি সংগ্রহ করাই 'মঙ্গর-মাটি' অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'মঙ্গর-মাটি' অনুষ্ঠান বর ও কনের বাড়িতে একই রাত্রে সম্পাদিত হয়। মাত্র মেয়েরাই এই পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে। পাঁচ-সাতটি চুলা তৈরি করা যেতে পারে এরূপ পরিমাণ মাটি সংগ্রহ করা হয় এবং সেই রাত্রেই চুলাগুলি তৈরি করা হয়। পরের দিন চুলাসমূহে 'লাওয়া' তৈরি করা হয়। 'লাওয়া' হচ্ছে খই ও জোয়ার-এর মিশ্রণে প্রস্তুত একটা পদার্থ যা কোল জাতির মধ্যে বিবাহের এক অত্যাবশ্যক উপকরণ। 'লাওয়া' তৈরি করবার পর, তা একটা নূতন হাঁড়িতে রাখা হয়। এই হাঁড়ির গায়ে মেয়েছেলের চিত্র অঙ্কিত থাকে। অনেকসময় ওই হাঁড়ির মধ্যে আতপ চাউল, হলুদ এবং দুটি পয়সা রাখা

হয়। বরের বাড়ি যে 'লাওয়া' তৈরি করা হয়, তা বরযাত্রীরা সঙ্গে করে কনের বাড়ি নিয়ে আসে এবং সেখানে কনের বাড়িতে তৈরি 'লাওয়া'র সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়।

বিবাহ উপলক্ষে কনের বাড়ির উঠানে একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এবং বিশেষ গাছের কাঠ দিয়ে এই মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। মণ্ডপটিকে 'মাড়ওয়া' বলা হয়। এই 'মাড়ওয়া'র মধ্যেই বিবাহ সম্পাদিত হয়। এদের মধ্যে বিবাহ তিন অংশে তিন দিনে নিষ্পন্ন হয়। প্রথম দিনের সন্ধ্যায় 'বরাত' বা বরযাত্রীর দল কনের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। কনের বাড়ির সমস্ত মেয়েরা মশাল হাতে করে গ্রামের সীমান্তে গিয়ে বরযাত্রীদের স্বাগত জানায়। যারা স্বাগত জানাতে যায় তাদের নেত্রী হয়ে যায় কনের সহোদরা বা অন্য কোনও বোন। বিবাহ হয় তার পরের দিন রাত্রে। বিবাহ সম্পাদিত হয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা। কিন্তু আগে থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে পুরোহিতের সাহায্য নেওয়া হবে না, তা হলে বিবাহ সম্পাদন করে কনের পিসে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মণ্ডপের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তারপর কনের বোন বর-কনের কাপড়ের কোণ দিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। এরপর বর-কনে পবিত্র দণ্ডের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। কনের বয়স যদি খুব কম হয়, তা হলে মাত্র পাঁচবার প্রদক্ষিণ করা হয়; আর কনে যদি 'সেয়ানা' হয়, তা হলে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণের পর বর কনেকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলে এবং কনের মা বরকে ফুঁ দিয়ে সেই প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে বলে। কিন্তু কনের মায়ের কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা না পাওয়া পর্যন্ত বর এককথায় এ-কাজ করে না। তারপর তাদের গাঁটছড়া খুলে দেওয়া হয় এবং কনের শাড়ির এক অংশ তার মুখের সামনে ধরে বরকে শুভদৃষ্টি করতে বলা হয়। পরের দিন 'বিদা'

বা বরের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা। কন্যাপক্ষ বরপক্ষের সঙ্গে গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় দেয়। কোলদের মধ্যে কনে কিন্তু বরের সঙ্গে যায় না। সে তার বাপের বাড়িতেই থেকে যায়। যখন যৌবনপ্রাপ্তি ঘটে তখন 'গৌনা' অনুষ্ঠান সম্পাদন করে বর কনেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। যেক্ষেত্রে বিবাহের সময় মাত্র পাঁচবার দণ্ড প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে বাকি দু'বার এই সময় দণ্ড প্রদক্ষিণ করতে হয়। কোলদের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে 'রওনা' অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। রওনা আর কিছুই নয়, বর কর্তৃক কনেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়া।

কোলদের মধ্যে আর একরকম বিবাহেরও প্রচলন আছে। একে বলা হয় 'ভাগল' বা কনেকে গোপনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। এক্ষেত্রে তারা প্রথমে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। বর সেখানে কনের হাতে দশগাছা কালো রঙের চুড়ি পরিয়ে দেয় ও তার সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দেয়। তারপর থেকে তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অর্সায়। অনেকসময় এর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য পঞ্চায়েতকে ভোজ দেওয়া হয়।

এতক্ষণ হিন্দুসমাজের ও উপজাতি-সমাজের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলা হল। কিন্তু ভারতীয় সমাজ তো মাত্র হিন্দু ও উপজাতি-সমাজ নিয়ে গঠিত নয়। ভারতীয় সমাজের মধ্যে আরও অনেক সমাজ আছে; যথা ব্রাহ্ম সমাজ, ক্রীশ্চান সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, মুসলিম সমাজ ইত্যাদি। এইবার এইসব সমাজের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবরণ দিয়ে এ-আলোচনা শেষ করব।

ব্রাহ্মসমাজের বিয়ে খুব সাদাসিধে। হিন্দুদের মত আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য নেই। শুভদিনের বালাই নেই। যে কোনও মাসে যে কোনও দিনে বিবাহ হতে পারে। গোত্র-প্রবর বিচারেরও কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। পণপ্রথার কলুষও নেই। বিবাহ হয় 'স্পেশাল ম্যারেজ

অ্যাক্ট' অনুযায়ী রেজেস্ট্রি করে। বর-কনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলে একটা আশীর্বাদের দিন স্থির করা হয়। আশীর্বাদটা হয় পাত্রীর বাড়িতে। ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারক বা আচার্য আশীর্বাদ-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজন সকলেই পাত্রপাত্রীকে আশীর্বাদ করেন। তারপর উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হয়। অনুষ্ঠানের পরই আইন মোতাবেক ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে তিনমাসের নোটিশ দেওয়া হয়। এই তিনমাসের মধ্যে বর-কনে পরস্পরের বাড়ি গিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। বিবাহের দিন বরকে কনের বাড়ি আসতে হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কোন প্রচারক বা আচার্য। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হয়। তারপর পাত্রপাত্রী পরস্পরের দায়িত্বগ্রহণের জন্য শপথগ্রহণ করে। উভয়কে সকলে আশীর্বাদ করে। তারপর বর-কনের অভিভাবকরা পাত্রপাত্রীকে সম্প্রদান করে। এরপর মালা বিনিময় ও অঙ্গুরী বিনিময় হয়। তারপর অভ্যাগতদের খাওয়ানো হয়। এখানেই বিবাহ সমাপ্ত হয়। তবে 'নববিধান' সমাজে সিঁদুর, শাঁখা, নোয়া বা পলা প্রভৃতির ব্যবহার আছে। কিছু স্ত্রী-আচারও পালিত হয়।

ক্রীশ্চানসমাজে কন্যাদায় নেই। বরকর্তাকেই মেয়ের বাপ বা অভিভাবকের দ্বারস্থ হতে হয়। কন্যাপক্ষের দাবি অনুযায়ী তত্ত্বসামগ্রী স্থিরীকৃত হয়। তারপর গির্জার অধ্যক্ষ-পুরোহিতের কাছে বর-কনে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, রেজিস্ট্রার রেজিস্টারে তাদের নাম ও পরিচয় লিখে নেন। এরপর গির্জার অধ্যক্ষ-পুরোহিত পর পর তিনটা রবিবার উপাসনার সময় প্রস্তাবিত বিবাহ ঘোষণা করেন। যুক্তিযুক্ত আপত্তি এলে বিবাহপ্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তা না হলে বিবাহের প্রস্তুতি কাজ চলতে থাকে। চৈত্র ও কার্তিক মাসে ক্রীশ্চানদের বিবাহ হয় না। তবে প্রশস্ত কাল হচ্ছে বড়দিনের পর থেকে ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির পূর্বদিন পর্যন্ত। বিবাহ হয় ক্রীশ্চান বিধান অনুযায়ী গির্জাঘরে। সেখানে দুজন সাক্ষীর সামনে বর-কনেকে পরস্পরের ইচ্ছা

প্রকাশ করতে হয়, এবং পরস্পরের প্রতি আনুগত্য, ভরণপোষণ ও স্নেহ-সেবাদান অঙ্গীকার করতে হয়। তারপর পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বর-কনেকে আশীর্বাদ করেন। এরপর গির্জার খাতায় বিবাহ রেজেস্ট্রিকৃত হয়। তাতে বর-কনে ও দুজন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকে। এরপর নির্দিষ্ট দক্ষিণা দিয়ে গির্জার পুরোহিতের কাছ থেকে 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করতে হয়।

তবে ধর্মান্তরিত হলেও বাঙালী ক্রীশ্চানদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোশাক-আশাক, সংস্কার, অপদেবতায় বিশ্বাস ইত্যাদি তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দুদের মতই মজ্জাগত থেকে গিয়েছে। বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে। সেজন্য বিবাহ বিবাহমণ্ডপ ও ছাদনা-তলায় অনুষ্ঠিত না হয়ে গির্জাঘরে সম্পাদিত হলেও, অনেক ক্রীশ্চান পরিবারে পূর্বসংস্কারের লোকাচারসমূহ পালিত হয়। যেমন কনে-দেখা, পাকাদেখা, অশুভ নজর থেকে রেহাই পাবার জন্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, লোকসঙ্গীত গাওয়া, গুয়ামেল, আইবুড়োভাত, জলভরা, ক্ষৌরকর্ম, গায়ে-হলুদ, কনে-তোলা, কনকাঞ্জলি, বরযাত্রা, ঘরে ফেরা, মালা-বদল, এবং অনেকস্থলে সিঁদুর-পরানো, প্রীতিভোজ ইত্যাদি অনুসৃত হয়। অবশ্য এসব অনুষ্ঠান গির্জার বাইরে নিজ নিজ গৃহে পালিত হয়—যেমন আদিবাসী-সমাজে হয়।

বাঙালী বৌদ্ধবিবাহে আনুষ্ঠানিক সমারোহের আধিক্য হিন্দুদেরই মত। বাঙালী বৌদ্ধসমাজে দু'রকম বিবাহ প্রচলিত আছে : (১) 'চলন্ত' ও (২) 'নামন্ত'। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে 'নামন্ত' বিবাহ প্রচলিত। এসব অঞ্চলের বৌদ্ধদের বিবাহ হয় বরের বাড়িতে। তার মানে, কনে বরের বাড়ি বিয়ে করতে যায়। আর যে-সব বৌদ্ধ পরিবার কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে এসে বাস করছে, তারা হিন্দুসমাজের দেখাদেখি কনের বাড়ি বিয়ে করতে যায়। এরূপ বিবাহকেই 'চলন্ত' বিবাহ বলা হয়। বাঙালী বৌদ্ধরা বিবাহে গোত্র-প্রবর মানে না।

তবে পিসী, মাসী, পিসতুতো-মাসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহ হয় না। কেবল কোথাও কোথাও মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৌদ্ধদের বিবাহে কোন পণপ্রথা নেই। তবে ব্রাহ্মদের মত যে-কোন মাসে বিবাহ হয় না। মাত্র বর্ষাবাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত), জন্মমাস, অশৌচবর্ষ, পৌষ ও চৈত্র মাস এবং জ্যেষ্ঠপুত্র হলে জ্যৈষ্ঠ মাস বর্জন করা হয়। এ-ছাড়া, বৌদ্ধরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে হিন্দুদের মত কোষ্ঠী-ঠিকুজি বিচার করে।

বিবাহ স্থির হয়ে গেলে বরপক্ষ কনের বাড়ি এসে কনেকে আশীর্বাদ করে যায়। একে 'অলঙ্কার চড়ানি' বলা হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য বরপক্ষ যখন কনের বাড়ি আসে, তখন উলুধ্বনি দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয় এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কী কারণে এসেছে। বরপক্ষ উত্তরে বলে যে তারা অমুকের পুত্রের সঙ্গে অমুকের কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে। কন্যাপক্ষ তখন তিনবার সাধুবাদ দিয়ে তাদের সম্মতি জানায়। বরপক্ষ তখন কনের উদ্দেশ্যে আনীত বস্ত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জাদির উপকরণ ইত্যাদি দেয়। সেগুলো অন্তঃপুরে পাঠানো হয়। তারপর বরপক্ষের লোকদের ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। ভোজের পর কনেকে বরপক্ষের সামনে নিয়ে আসা হয়। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনের আঙুলে একটি আংটি পরিয়ে দেয়। এর দ্বারাই বিয়ে পাকা হয়ে যায়। তখন বিয়ের শুভদিন স্থির করা হয়।

'নামন্ত' বিবাহে যে-সকল বিধান পালিত হয়, সেগুলি হচ্ছে—(১) আমানি বা বরযাত্রীদের কনের বাড়ি গিয়ে কনেকে নিয়ে আসা, (২) গৃহদেবতার পূজা, (৩) গণক, নাপিত, পুরোহিত, ধোপা প্রভৃতিকে 'সিধে' দেওয়া, (৪) বুদ্ধমন্দিরে গমন, (৫) সান্ধ্যভোজ, (৬) সম্প্রদান সম্পর্কিত বিয়ের অনুষ্ঠানসমূহ পালন, (৭) সহমেলা বা বিয়ের পর বর-কনের একপাত্রে ভোজন, (৮) 'শিকলি' বা আনন্দ অনুষ্ঠান, (৯) 'কাক-স্নান', (১০) নবদম্পতিকে আশীর্বাদ, (১১) ভিক্ষুদের অন্নদান ও (১২)

কনেকে নিয়ে বরের সবান্ধবে শ্বশুরবাড়ি গমন। দু'-একদিন শ্বশুরবাড়ি থাকার পর বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসে। তখন ফুল-শয্যার ব্যবস্থা করা হয়। এর কয়েকদিন পরে বর কনেকে নিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি যায়। একে 'নবাদন' বা 'ন-দিন্না' বলা হয়। ফিরে এসে বরকে আর একবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়; কেননা, এরূপভাবে তিন-বার শ্বশুরবাড়ি না গেলে পরে বর স্বেচ্ছায় কখনও শ্বশুরবাড়ি যায় না।

মুসলিম-সমাজে বিবাহ সম্পর্কে বাধানিষেধ হিন্দুসমাজের তুলনায় অনেক কম। তবে প্রথম বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে হওয়া চাই। পরবর্তী বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নেই। শরিয়ত অনুযায়ী চারটি পর্যন্ত বিবাহ প্রশস্ত। মুসলিম-সমাজে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না, তবে বাঞ্ছনীয় বিবাহ হিসাবে খুড়তুতো, জাঠতুতো, মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এরূপ ভাই-বোন থাকলে তাদের মধ্যে বিবাহই অগ্রাধিকার পায়। তবে কোনও কোনও জায়গায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের বিরোধিতাও লক্ষিত হয়।

হিন্দুসমাজের মত মুসলিম-সমাজেও বিবাহ সর্বজনীন ব্যাপার। মুসলিম-সমাজে ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে-কোন পুরুষ বিবাহ করতে পারে। ১৫ বৎসরের কম হলে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হয়। মুসলিম-সমাজে বর-কনে উভয়ের সম্মতিরও প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সামনে বিবাহের প্রস্তাব ও স্বীকৃতি একই সময়ে করতে হয়। মুসলিম-সমাজে কোন স্ত্রীলোক মুসলমান ব্যতীত অপর কোন লোককে বিবাহ করতে পারে না। ইসলামধর্মাবলম্বী কোনও কোনও শাখার মধ্যে 'মোতা' নামে একরকম বিবাহ প্রচলিত আছে। 'মোতা' হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (এমনকি একদিনের জন্যও) সাময়িক বিবাহ। এরূপ বিবাহে স্ত্রীধনও দেওয়া হয়; কিন্তু এরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান হয়, তার কোন

উত্তরাধিকার থাকে না। তবে সন্তানের বৈধতা সম্বন্ধে কোন বিবাদ ওঠে না। কিন্তু এরূপ বিবাহের ছেদ ঘটবার পর স্ত্রীকে 'ইদ্দত' পালন করতে হয়। ('ইদ্দত' হচ্ছে পরবর্তী বিবাহ করবার পূর্বে নির্দিষ্ট অপেক্ষা করবার সময়)।

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে মুসলিম-সমাজে সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়। এ সম্পর্কে প্রথাগত রীতি অনুযায়ী দু'রকম পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে 'তালাক' উচ্চারণ করে দাম্পত্য সম্পর্কের ছেদ ঘটানো। 'তালাক' উচ্চারণ করবার সময় কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। এমনকি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতেও 'তালাক' উচ্চারণ করা যেতে পারে। তার মানে, স্ত্রী নেপথ্যে থাকলেও 'তালাক' দেওয়া যেতে পারে। যদি 'তালাক' একবার উচ্চারণ করা হয় এবং প্রত্যাহার করবার কোন ইচ্ছা না থাকে, তা হলে তালাক তিনবার উচ্চারণ করতে হয়; স্ত্রীর ক্রমান্বয় তিনটি 'তুর'-এর সময় (মাসিক ঋতুর সময়) 'তালাকের' পর স্ত্রীকে 'ইদ্দত' পালন করতে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'ইলা'। 'ইলা' হচ্ছে ব্রত গ্রহণ করে চারমাস স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না করা। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আরও যে-সব পদ্ধতি আছে, তার বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' (আনন্দ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৫) দ্রষ্টব্য। ১৯৩৯ সালের 'মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন' অনুযায়ীও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। এ-সম্বন্ধেও বিশদ বিবরণের জন্য আমার ওই বইখানা (পৃষ্ঠা ১১৬) দ্রষ্টব্য। তবে উল্লেখনীয় যে আদালতের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালেও, এ-সম্বন্ধে মুসলিম-সমাজের ব্যক্তিগত আইন (personal law) বলবৎ থাকে। এ-সম্বন্ধে শাহবানু মামলার রায় ও ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ 'তালাকের পর অধিকার সংরক্ষণ আইন' সম্পর্কে আমার প্রাগুক্ত বইখানি দ্রষ্টব্য।

পরিশেষে বক্তব্য যে, ধর্মান্তরিত অন্যান্য সমাজের ন্যায় বাঙালী

মুসলিম-সমাজেও চিরাচরিত হিন্দুসমাজের অনেক লোকাচার পালিত হয়। যেমন, বিবাহের পূর্বে বরকনেকে আশীর্বাদ করা, আইবুড়োভাত বা 'থাল' দেওয়া, গায়ে-হলুদ দেওয়া, জল আনা, লৌকিক গীত গাওয়া, বরের সঙ্গে নিতবরের যাওয়া, বিয়েতে বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা, বাসর-ঘরে কৌতুক, নাপিতের ভূমিকা (নাপিতকে 'সিধে' দেওয়া), 'দুধভাত' (হিন্দুসমাজের কনকাঞ্জলির সমতুল), কোনও কোনও জায়গায় সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব লোকাচার ছাড়া মূল মুসলমান বিবাহ অনুষ্ঠান সাক্ষীর সমক্ষে মৌলবীর দ্বারা সম্পাদিত হয় ও মৌলবী এজন্য দক্ষিণা পান।

পারসীদের বিবাহ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের 'দি পারসী ম্যারেজ অ্যাণ্ড ডাইভোর্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী ও বিদেশী বা বিদেশিনীর সঙ্গে বিবাহ ১৯৬০ সালে বিধিবদ্ধ 'দি ফরেন ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী হয়।

জ্ঞাতিত্বমূলক সম্বোধন, আচরণ ও অধিকার

হিন্দুদের মধ্যে কুল নির্ণীত হয় গোত্র দ্বারা। হিন্দুসমাজে ছেলেদের বেলায় কুল অপরিবর্তিত থাকে, জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েদের বেলায় কুল পরিবর্তিত হয়ে যায় বিবাহের পর, কেননা, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের গোত্রান্তর ঘটে। তবে বিবাহের পূর্বে মেয়েদের পিতৃকুলে যে-সকল সম্পর্কবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বিবাহের পূর্বে মেয়ে পিতাকে 'বাবা' বলে ও মাতাকে 'মা'। পিতার বড় ভাইকে বলে 'জ্যাঠা' ও ছোট ভাইকে 'খুড়া' এবং তাঁদের স্ত্রীদের যথাক্রমে 'জ্যাঠাইমা' ও 'খুড়ীমা'। (উত্তর ভারতে কোথাও কোথাও খুড়োকে 'চাচা' ও খুড়ীকে 'চাচী' বলা হয়। কিন্তু জ্যাঠা ও জ্যাঠাইমাকে 'জেঠ' ও 'জেঠানী' বলা হয়)। পিতার অন্যান্য সন্তানদের পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয় 'ভাই' ও মেয়েদের ক্ষেত্রে 'বোন'। (উত্তর ভারতে বলা হয় 'ভাইয়া' ও 'বহিন')। বড়ভাইকে বলে 'দাদা' ও বড়বোনকে 'দিদি'। জ্যাঠা ও খুড়োর ছেলেমেয়েদেরও ওইভাবেই সম্বোধন করা হয়। পিতামহকে দাদা ও পিতামহীকে ঠাকুরমা (উত্তর ভারতে 'নানা' ও 'নানী')। পিতামহের ভাইদের ও তাঁদের স্ত্রীদের ওই-ভাবেই সম্বোধন করা হয়। নিজ ভাইয়ের ছেলেদের বলা হয় 'ভাইপো' ও মেয়েদের ভাইঝি। (উত্তর ভারতে বলা হয় 'ভাতিজা' ও 'ভাতিজী')। বোনের ছেলেমেয়েদের বলা হয় 'ভাগ্নে' ও 'ভাগ্নী'। (উত্তর ভারতে 'ভনেজ' ও 'ভনচা')। ভাগ্নে ও ভাগ্নীরা মায়ের ভাইকে বলে 'মামা' ও তাঁর স্ত্রীকে 'মামী'। মায়ের বোনকে বলে 'মাসী' ও তাঁর স্বামীকে 'মেসো'। পিতার বোনকে বলা হয় 'পিসী' ও 'পিসী'র স্বামীকে 'পিসে'। (উত্তর ভারতে তাঁদের বলা হয় 'ফুফা' ও 'ফুফী')। বিবাহের পর গোত্রান্তর ঘটা সত্ত্বেও এসকল সম্পর্কবাচক শব্দের কোন পরিবর্তন ঘটে

না। এগুলো সবই অপরিবর্তিত থাকে। তবে যখন গোত্রান্তর ঘটে এবং সে তার স্বামীর কুল বা গোত্র পায়, তখন সে স্বামীর কুলে কতকগুলি নূতন সম্পর্কবাচক শব্দ ব্যবহার করে। স্বামীকে বা তার গুরুজনদের সে নাম ধরে ডাকে না। এরূপ ডাকা একেবারে নিষিদ্ধ। স্বামীকে সে সাধারণত 'ওগো' বলে সম্বোধন করে। তবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে যখন স্বামীর উল্লেখ করে তখন বলে 'আপনার ছেলে', কিংবা পাড়া-পড়শীর কাছে বলে 'আমাদের কর্তা'। স্বামীর বাবাকে বলে 'বাবা' ও মাকে 'মা'। (উত্তর ভারতে শ্বশুরকে বলা হয় 'শ্বস্', আর জামাইকে 'দামাদ')। বস্তুত, বিবাহের পর শ্বশুর-শাশুড়ীই তার 'বাবা' ও 'মা' হয়ে দাঁড়ায়। তার মানে, স্বামী যে-নামে তার বাবা ও মাকে ডাকে, স্ত্রীও সেই নামে তাদের ডাকে। অনুরূপভাবে স্বামী যে-নামে তার জ্যাঠা-জেঠী, খুড়ো-খুড়ী, পিসী-পিসে, মামা-মামী, মেসো-মাসীকে ডাকে, স্ত্রীও সেই নামে তাদের সম্বোধন করে। আর স্বামীর বড় ভাইদের 'ভাসুর' এবং ছোট ভাইদের দেবর বা 'ঠাকুরপো' বলে। আর তার নিজ ভাইবোনেরা তার শ্বশুর-শাশুড়ীকে 'আবুইমশায়' ও 'আবুইমা' বলে। পিতৃকুলে সে যেমন নিজ ভাইদের ছেলেমেয়েকে 'ভাইপো' ও 'ভাইঝি' বলত, শ্বশুরবাড়ি সে ভাসুর ও দেবরের ছেলেমেয়েদের ভাসুরপো, ভাসুরঝি, দেওরপো, দেওরঝি ইত্যাদি বলে। তবে স্বামীর ভাগ্নে-ভাগ্নীকে ভাগ্নে-ভাগ্নীই বলে। সম্পর্কিত জ্ঞাতিদেরও সে ওইভাবেই সম্বোধন করে। এক কথায়, বিয়ের পর মেয়েদের সম্পর্কবাচক শব্দগুলি যেমন দ্বিপার্শ্বিকভাবে দ্বিগুণ হয়ে যায়, ছেলেদের বেলাতেও বিবাহের পর সম্পর্কবাচক শব্দগুলি দ্বিগুণ হয়ে যায়। দু'-একটা অবশ্য ব্যতিক্রম আছে; যেমন শালার স্ত্রীকে 'শ্যালজ' বলা হয়। এদিকে স্বামীর কুলে স্বামীর বড় ভাই (ভাসুর) তাকে 'বৌমা' বলে, আর ছোট ভাইয়েরা তাকে 'বৌদি' বলে। উত্তর ভারতে 'ভাবী' বলা হয়, এবং বউ (বহু) দেবরের স্ত্রীকে 'দেওরানী' বলে। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে কতকগুলি

নিষিদ্ধ আচরণ (মনে হয়, সাঁওতাল ও মুণ্ডাসমাজ থেকে গৃহীত, কেননা অনুরূপ বিধি তাদের মধ্যেও প্রচলিত) আছে। যেমন ভাসুরের সঙ্গে কিংবা মামা-শ্বশুরের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি হওয়াটা ভ্রাতৃবধূ বা ভাগ্নেবৌয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। দৈবক্রমে ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেলে, তাঁকে 'ধান-সোনা' উৎসর্গ করতে হয়। এসব বিধি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে বোধহয় এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। তবে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামের অনেক জায়গায় এসব নিষেধ (taboo) এখন উঠে যাচ্ছে। এ ছাড়া, স্বামীর বা স্বামীর কোন গুরুজনের নাম করাও নিষিদ্ধ ছিল।

জ্ঞাতিত্বমূলক নিষেধ-বিধি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উপরে আমরা সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে অনুরূপ প্রথার বিদ্যমানতার উল্লেখ করেছি। সে-সম্বন্ধে এখন কিছু বিস্তারিতভাবে বলতে চাই। সাঁওতালদের মধ্যে ভাসুর ও ভাদ্দরবৌ কখনও পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে না। তারা পরস্পর পরস্পরকে কখনও স্পর্শ করে না বা অন্য কারুর অনুপস্থিতিতে কখনও এক ঘরে উপস্থিত হয় না। মাঠ থেকে কাজকর্ম সেরে ভাদ্দরবৌ যদি দ্যাখে যে, বাড়িতে ভাসুরই একা রয়েছে, তা হলে ভাদ্দরবৌ কখনও বাড়িতে প্রবেশ করে না, বাইরে রাস্তায় বা অন্য কোন জায়গায় অন্য কারুর উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে। তা ছাড়া, ভাসুরের সামনেও সে কখনো উপবেশন করে না, এবং যদি উপবেশন করার একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে একটা ছোট মোড়ার উপর উপবেশন করে।

মুণ্ডাদের মধ্যেও ঠিক সাঁওতালদের মত অনুরূপ আচরণবিধি প্রচলিত আছে। ওরাঁওদের মধ্যেও ভাসুর ও ভাদ্দরবৌ পরস্পরের নিকট 'বেনালা' ও 'বেনালী'। তার মানে, তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না ও পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে না। এ ছাড়া, ওরাঁও সমাজে কোন স্ত্রীলোককে তার কনিষ্ঠ ভগিনীপতির সঙ্গেও অনুরূপ আচরণ

করতে হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি সম্বন্ধে এ-নিয়ম প্রযোজ্য নয়। দেবর সম্বন্ধেও এসব বিধিনিষেধ নেই। ওড়িশায় 'সহর' ও 'গণগণ্ডা' জাতির মধ্যে ভাসুর কিংবা মামাশ্বশুর কোন স্ত্রীলোকের সামনে এসে পড়লে, তাকে একপাশে সরে গিয়ে তাদের যাবার পথ করে দিতে হয়। কনিষ্ঠ ভগিনীপতির ক্ষেত্রে এ-নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

গোণ্ড জাতির মধ্যে যদি কোনও স্ত্রীলোক তার ভাসুরপুত্র বা দেবরপুত্রের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে, তা হলে তাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তার নিজের খাওয়া শেষ হলেও, সে উঠে পড়তে পারে না। তাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং তারা না ওঠা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়। (আদমশুমারির ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টের ৩৩৪ পৃঃ দ্রঃ)।

যেহেতু বিবাহের পর মেয়েদের কুলচ্যুতি ঘটে, সেজন্য পিতৃকুলে কেউ মারা গেলে পিতৃকুলের যে অশৌচ হয়, স্বামীর কুলে আসবার পর মেয়েদের পূর্ণাশৌচ (ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন ও শূদ্রের তিরিশ দিন বা একমাস) পালন করতে হয় না। মাত্র পিতামাতার মৃত্যুতে তিনদিন অশৌচ হয়। (অবিবাহিতা কন্যার একদিন)। পিতামাতার মৃত্যুর চতুর্থ দিনে তাকে 'চতুর্থী' শ্রাদ্ধও করতে হয়। মাতামহের মৃত্যু হলে দৌহিত্রের তিনদিন অশৌচ হয়। গায়ত্রীদাতা, মন্ত্রদাতা বা গুরু মারা গেলেও তিনদিন অশৌচ হয়। সপিণ্ডদেরও অশৌচ বহন করতে হয়। পিতামাতার মৃত্যুতে মরণাশৌচকালে মাত্র দিবাভাগে হবিষ্যান্ন পাক করে খেতে হয়। এই সময় কাষ্ঠাসনে উপবেশন করা, পাদুকা পরা, ক্ষৌরকর্ম ও স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। এ ছাড়া, একবৎসরকাল একাদশী পালন করতে হয়। এই একবৎসরকালকে কালাশৌচ বলা হয়। কালাশৌচকালের মধ্যে বিবাহাদি শুভকর্ম নিষিদ্ধ (taboo)।

মাত্র মৃত্যু ঘটলেই যে অশৌচ হয়, তা নয়। জননেও অশৌচ হয়।

এরও অশৌচকাল মরণাশৌচের মত। তবে জননাশৌচে মরণাশৌচের মত উপরি-উক্ত নিয়মাদি পালন করতে হয় না। এ অশৌচ বিবাহিতা কন্যা বা তার ছেলেদের বহন করতে হয় না।

আত্মীয়স্বজনের প্রেতকার্যের অধিকার সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা দরকার। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উভয়ের ক্ষেত্রেই এর একটা ক্রম আছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এই ক্রম হচ্ছে—(১) জ্যেষ্ঠ পুত্র, (২) কনিষ্ঠ পুত্র (জ্যেষ্ঠের পরবর্তী), (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) অপুত্রক পত্নী, (৬) কর্ম-সমর্থ-পুত্রযুক্তা পত্নী, (৭) অদত্তা কন্যা, (৮) বাগদত্তা কন্যা, (৯) দত্তা কন্যা, (১০) দৌহিত্র, (১১) কনিষ্ঠ সহোদর, (১২) জ্যেষ্ঠ সহোদর (১৩) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়, (১৪) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, (১৫) কনিষ্ঠ সহোদরপুত্র, (১৬) জ্যেষ্ঠ সহোদরপুত্র, (১৭) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়পুত্র, (১৮) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়পুত্র, (১৯) পিতা, (২০) মাতা, (২১) পুত্রবধূ, (২২) বিমাতা, (২৩) কুমারী পৌত্রী, (২৪) বাগ্‌দত্তা পৌত্রী, (২৫) দত্তা পৌত্রী, (২৬) পৌত্রবধূ, (২৭) কুমারী প্রপৌত্রী, (২৮) বাগ্‌দত্তা প্রপৌত্রী, (২৯) দত্তা প্রপৌত্রী, (৩০) প্রপৌত্রবধূ, (৩১) পিতামহ, (৩২) পিতামহী, (৩৩) সপিণ্ড, (৩৪) সকুল্য, (৩৫) সমানোদক, (৩৬) সগোত্র, (৩৭) মাতামহ, (৩৮) মাতুল, (৩৯) ভাগিনেয়, (৪০) মাতৃপক্ষ, (৪১) মাতৃপক্ষ, সপিণ্ড সকুল্য, (৪২) মাতৃপক্ষ সমানোদক, (৪৩) অপরিণীতা স্ত্রী, (৪৪) শ্বশুর, (৪৫) জামাতা, (৪৬) পিতামহীভ্রাতা, (৪৭) শিষ্য, (৪৮) পুরোহিত, (৪৯) আচার্য, (৫০) মিত্র, (৫১) পিতৃমিত্র, (৫২) একগ্রামবাসী, (৫৩) স্বজাতীয়, (৫৪) গৃহীতবেতন স্বজাতীয়।

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অধিকার—(১) জ্যেষ্ঠ পুত্র, (২) কনিষ্ঠ পুত্র (আপেক্ষিক), (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) অদত্তা কন্যা, (৬) বাগ্‌দত্তা কন্যা, (৭) দত্তা কন্যা, (৮) দৌহিত্র, (৯) সপত্নীপুত্র, (১০) পতি, (১১) পুত্রবধূ, (১২) সপিণ্ড, সকুল্য, (১৩) সমানোদক, (১৪) সগোত্র, (১৫) পিতা, (১৬) ভ্রাতা, (১৭) ভগিনীপুত্র, (১৮) ভর্তৃভাগিনেয়,

(১৯) ভ্রাতুষ্পুত্র, (২০) জামাতা, (২১) ভর্তৃমাতুল, (২২) ভর্তৃশিষ্য, (২৩) পিতৃবংশ, (২৪) পিতৃবংশ-সন্নিহিত ক্রমে সমানোদক, (২৫) মাতৃবংশ-সন্নিহিত ক্রমে মাতৃসমানোদক, (২৬) দ্বিজোত্তম।

সামাজিক অনুষ্ঠানেও কোন কোন বিশেষ আত্মীয়ের অধিকার আছে। যেমন, ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ীর অন্নপ্রাশনে মাতুলই তার মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেয়। আবার দক্ষিণ ভারতে মামাতো ভাই ও পিসতুতো ভাইদের অধিকার আছে পিসতুতো বোন ও মামাতো বোনকে বিবাহ করবার। এসব ক্ষেত্রে বিবাহের পর জ্ঞাতিত্বমূলক সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে। বিবাহের পূর্বের মামা বা পিসেই বিবাহের পর শ্বশুর হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজ ও জাতিভেদ

আগেই বলেছি যে হিন্দুর বিবাহ ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার মধ্যেই নিহিত ছিল পরিবারের স্থায়িত্ব। এবং এই পরিবারের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করত সমাজের সংহতি। মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে যে-সমাজের চিত্র দেওয়া হয়েছে তা চতুর্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ। সেটা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ। সে সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। চতুর্বর্ণ বলতে মৌলিক চারটি শ্রেণীকে বোঝাত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। (চতুর্বর্ণের উদ্ভব সম্বন্ধে পরে দেখুন)। বিবাহ যে মাত্র সবর্ণে হত, তা নয়, অসবর্ণেও হত। উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে 'অনুলোম' ও নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহকে 'প্রতিলোম' বিবাহ বলা হত। এরূপ বর্ণের বাইরে বিবাহ ঘটত বলে মনুর মানবধর্মশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে আমরা এক সম্প্রসারিত সমাজের চেহারা দেখি।

চারিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ মিলনের ফলে অনেক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। দশম অধ্যায়ে এই সঙ্কর জাতির মধ্যে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে, তারা হচ্ছে—মূর্ধাভিষিক্ত, কৈবর্ত, করণ বা কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, অয়োগব, ধিগবন, পুক্কস ও চণ্ডাল। এদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বা বৃত্তি ছিল। সুতরাং বৃত্তিভিত্তিক জাতি ও শ্রেণীর উদ্ভব এ-যুগেই হয়েছিল। তবে সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এদের স্থান ও মর্যাদা নির্দেশের পেছনে ব্রাহ্মণদের কিছু উষ্মা ছিল বলে মনে হয়। কেননা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি পিতা হতেন এবং মাতা নিম্নবর্ণের, তা হলে তাকে অম্বষ্ঠ বা উগ্র নামে অভিহিত করে ব্রাহ্মণদের অব্যবহিত পরেই তাদের স্থান দেওয়া হত। আর ব্রাহ্মণী যদি মাতা হতেন এবং পিতা নিম্নবর্ণের, তা হলে তাকে চণ্ডাল নাম দিয়ে সমাজের একেবারে নীচের তলায় তার

স্থান নির্দিষ্ট হত। এক কথায় চণ্ডালের মা হতেন ব্রাহ্মণী, আর অম্বষ্ঠের পিতা হতেন ব্রাহ্মণ। যেহেতু পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না, সেজন্য ব্রাহ্মণীকে সমাজের এই পাঁতি মাথা পেতে নিতে হত। আমরা পরে দেখব যে আগেকার সমাজে তা ছিল না।

এক কথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের যে ফসল, তার সমাজে একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল, যদিও আজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সে-স্থানগুলি অবিসংবাদিত নয়। তা হলেও প্রাচীন সমাজ সে-ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল, কেননা তার পেছনে ছিল ধর্মশাস্ত্রসমূহের চাপ। না মানলে পাপপুণ্যের ভয় দেখানো হত। আগেকার দিনে মানুষের মনে পাপপুণ্যের ভয়টা ছিল অত্যন্ত বেশি। যেটার শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই, সেটাই পাপ। এবং এই পাপের ভয়েই সমাজ সংহত অবস্থায় থাকত। পাপের ভয়কে অগ্রাহ্য করে মানুষ যখন কোন 'অসামাজিক' কাজ করত, তখন তাকে 'একঘরে' করা হত। একমাত্র তখনকার দিনের মানুষই জানত 'একঘরে' হওয়াটা কী ভীষণ বিপদের ব্যাপার ছিল।

তবে সমাজ কোন এক বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। বিভিন্ন যুগে তার বিবর্তন ঘটেছিল। এই বিবর্তনমূলক সামাজিক সচলতা (social mobility) নানা কারণে ঘটেছিল। মনে হয়, আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল, তখন তাদের মধ্যে কোনরূপ বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। কেননা, যদিও ভৃগু ঋষি মন্ত্র রচনা করে গেছেন, কিন্তু তাঁর বংশধরগণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাঁরা রথনির্মাণে দক্ষ ছিলেন। 'শ্রমবিভাগের ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে চাষী, গোপালক, বায় (অর্থাৎ তন্তুবায়), কামার, ছুতার, চামার, নাপিত, ভিষক, বণিক প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।' কিন্তু এ-সকল বৃত্তি যে কুলগত বা জাতিভিত্তিক ছিল, অথবা বিভিন্ন শিল্পিসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার কোন তারতম্য ছিল, এমন কথা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের কোথাও লেখা নেই। তবে প্রাগার্যদের মধ্যে যে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীবিভাগ ছিল,

তার প্রমাণ আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন প্রভৃতি স্থান থেকে পাই। যারা সমাজকে শাসন করত, তারা বাস করত পরিখা-বেষ্টিত নগরের মধ্যে এক উচ্চ পাটাতনের ওপর নির্মিত দুর্গ অঞ্চলে। আর নীচের শহরে বাস করত সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা। আবার ঘরবাড়ি তৈরির বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, নীচের শহরে যারা বাস করত, তাদের মধ্যেও একটা ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগ ছিল। এসব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল নানা বৃত্তিধারী শ্রেণী ও শ্রমিক সম্প্রদায়।

আমি বহুবার বহুস্থানে বলেছি যে, আমার ধারণা, আগন্তুক আর্যরা তাদের সঙ্গে খুব অল্পসংখ্যক মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিল। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে ঋগ্বেদের উৎপত্তি হলেও সমগ্র ঋগ্বেদে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে তাদের একই বৈষয়িক প্রার্থনা। ঋগ্বেদের প্রায় দশ হাজার মন্ত্রের মধ্যে হাজারখানেক মন্ত্রে শুধু একই প্রার্থনা করা হয়েছে—'আমাদের শত্রুর ধন দাও, শত্রুর স্ত্রী দাও, শত্রুর অন্ন দাও' (১।৫।৩)। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগেই আর্যরক্তের সঙ্গে অনার্য-রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। তখন তারা প্রাগার্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ, গোত্রবিভাগ ইত্যাদি অনুসরণ করেছিল। এই শ্রেণীবিভাগ ঋগ্বেদের এক নবীন বিভাগে (১০।৯০।১২) প্রথম বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে প্রজাপতির 'মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু বাহু রাজন্য হল, উরু বৈশ্য হল ও দু পা শূদ্র হল'। এই প্রসিদ্ধ সূক্তটিকে 'পুরুষসূক্ত' বলা হয় এবং এটা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের উল্লেখ নেই। মোট কথা, ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে কোন বর্ণবিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে 'পুরুষসূক্ত'-এর ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। তবে এ-থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়। একই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়েছিল। যদিও নৃতত্ত্বের দিক থেকে এটা অলীক ব্যাপার,

তাহলেও ‘পুরুষসূক্ত’ অনুযায়ী সকল বর্ণের লোকের দেহে একই ‘পুরুষ’-এর রক্ত প্রবহমান। মোট কথা, আর্যদের মধ্যে গোড়ার দিকে কোন জাতিভেদ প্রথা ছিল না, এবং থাকলেও, এক জাতি থেকে অপর জাতিতে উন্নীত হতে পারত। এর প্রমাণ এবং প্রতিধ্বনি আমরা পরবর্তীকালের ধর্মগ্রন্থসমূহে পাই। যেমন পরবর্তী কালের ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে আর্যরা বহু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে (যেমন সত্যকাম জাবালি, মহীদাস ঐতরেয়) নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালের কোন কোন ‘ধর্মশাস্ত্রে’ও আমরা এর সমর্থন পাই। যেমন কপিলস্মৃতিতে বলা হয়েছে—চারবার হিরণ্যগর্ভ দান করলে শূদ্রেরও উপনয়ন-সংস্কারের অধিকার হয় এবং উপনয়ন-সংস্কার করলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশবার তুলাপুরুষ দান করলে শূদ্র ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। (‘হিরণ্যগর্ভদানস্য চতুর্বারকৃতস্য তু মহিম্না বৃষলস্যাপি মৌঞ্জ্যামধিকৃতির্ভবেৎ/ততোঽপি কৃতয়া মৌঞ্জ্যা শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যমৃচ্ছতি/তুলাষ্টাদশধা জ্ঞেয়া তত্রাদৌ রাজতা স্মৃতা//’, কপিলস্মৃতি, শ্লোকসংখ্যা ৮৯৬-৮৯৭, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ)। এক কথায় গোড়ার দিকে আর্যদের মধ্যে সামাজিক সচলতা বা ‘সোস্যাল মোবিলিটি’ ছিল। শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে বিশ্বামিত্র মুনিও ব্রাহ্মণত্বলাভ করেছিলেন। সুতরাং সবক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, জন্ম বা রক্তের বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করত না। যথাযথ সংস্কার ও দানের ওপর তা নির্ভর করত। নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে এখানে একটা কথা বলে নিতে চাই। নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে এটা সর্ববাদিসম্মত মত যে জগতে মাত্র একটাই জাতি আছে, যাদের রক্তের বিশুদ্ধতা আছে। তারা হচ্ছে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নগ্ন আদিম অধিবাসীরা। জগতের আর সমস্ত জাতিরই রক্ত কলুষিত। (গ্রন্থকারের ‘হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য’, পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য)। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সম্মান ও অর্থদান করে কি-ভাবে আদিবাসী সমাজের লোকেরা হিন্দু-

সমাজভুক্ত হয়ে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করছে, তার দৃষ্টান্ত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'উড়িষ্যার কন্ধজাতীয় এবং মধ্যপ্রদেশে গণ্ডজাতীয় অনার্য শাসকগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সম্মান এবং বৃত্তিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এবং তৎসহ নিজেরা শুদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচারবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে।' (হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)।

বস্তুত বেদোত্তরকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি-জাতির মধ্যে পার্থক্য যখন ঘনীভূত হয়েছিল, তখন থেকেই জাতি সম্বন্ধে তাদের মনে একটা গোঁড়ামির সঞ্চার হয়েছিল। তখন তাদের মনে রক্তের বিশুদ্ধতা, আচার-ব্যবহারের শুচিতা প্রভৃতি প্রাধান্যলাভ করল। এমনকি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশে প্রচলিত এক প্রবচন যথেষ্ট আলোক-পাত করে। প্রবচনটা হচ্ছে—'তিন কনৌজিয়া তেরহ চুলি'। তার মানে, তিন কনৌজ ব্রাহ্মণ যদি একত্রিত হয়, তাহলে তাদের শুচিতা রক্ষার জন্য তেরটা রন্ধনশালার প্রয়োজন হয়। তাদের এ শুচিতা কোথা থেকে এল? রক্তের বিশুদ্ধতা? তা তো নয়। কেননা, পঞ্চনদ ও উত্তর প্রদেশ যেভাবে বিদেশী রক্তের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, ভারতের আর কোন প্রদেশের রক্ত ততটা কলুষিত হয়নি। আর্যদের আসবার পর ওই অঞ্চলের রক্ত প্রথম কলুষিত হয়েছিল আখামেনিদদের রক্তের দ্বারা। এ-সম্বন্ধে বেহিস্তুনের পাঁচটি স্তম্ভলিপি যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই স্তম্ভলিপিগুলির তারিখ হচ্ছে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক। এই স্তম্ভলিপিগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের (হিরোদতাসের 'হিন্দু') কিছু অংশ আখামেনিদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারপর ৩২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ঘটে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ। যদিও আলেকজাণ্ডার অল্পদিনের

জন্য ভারতে ছিলেন, তথাপি তাঁর উত্তরসূরীরা বেশ কিছুদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে দিমিত্রাস ও শেষের দিকে মিলিন্দের রাজত্বকালে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কিছু অংশ গ্রীকদের অধীনে যায়। তারপর ভারতে আসে শকেরা। তারা ভারতে কুষাণবংশের রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ-সমস্ত জাতি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে ভারতের জনসমুদ্রে মিশে যায়। তারপর আসে হূনেরা। ৫২৮ খ্রীস্টাব্দে মালবাধিপতি যশোবর্মণ কর্তৃক পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তারাও ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এরা সকলেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এইসব বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্যের সময় ব্রাহ্মণেরা কি কোনরূপ 'চৈনিক প্রাচীর' নির্মাণ করে নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা ও আচারের শুচিতা রক্ষা করেছিলেন? কই ইতিহাস তো তা বলে না! তবে তাঁদের রক্তের বিশুদ্ধতা ও আচার-ব্যবহারের শুচিতা সম্বন্ধে এত গুমোর কেন?

হিন্দুসমাজের ওপর এরূপ প্রতিঘাত মাত্র বাইরে থেকে আসেনি। ভেতরেও বিপ্লব ঘটেছিল বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় থেকে। সম্রাট অশোকের সময় থেকে কুষাণদের আমল পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই বিপর্যয়ের সময় হিন্দুসমাজ একভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল না। বহমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে ও জীবনযাত্রা-প্রণালীকে চলমান রেখে, ধর্মের সংহতি রক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ ক্রমাগতই তার বিধানসমূহকে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল। বস্তুত হিন্দুধর্ম যদি জাতীয় জীবনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল না হত, তা হলে হিন্দুধর্ম বহুদিন পূর্বেই লোপ পেয়ে যেত।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল বলেই, আমরা ধর্মশাস্ত্রসমূহে পরস্পরবিরোধী বিধান দেখি এবং এই বিরোধ সমন্বয়ের জন্যই শেষ

পর্যন্ত সমাজকে মনুর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু দেশ যখন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হল তখন মনুর বিধানও আর সমাজকে সংবদ্ধ রাখতে সক্ষম হল না। সমাজ ও সংস্কৃতির সংহতি রক্ষার জন্য নূতন নূতন বিধানকারদের আবির্ভাব ঘটল। এটা আমরা বিশেষ করে বাঙলার ইতিহাসে দেখি। মুসলমান অধিকারের পূর্বেই বাঙলার সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাঙলায় পালসম্রাটদের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তখন জাতিভেদ প্রথা প্রায় একেবারেই উঠে গিয়েছিল। সেজন্য পালবংশের পর যখন সেনবংশীয় রাজাদের আধিপত্য ঘটল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তখন আবার নূতন করে জাতি-বিন্যাসের প্রয়োজন হল। সে-কাজকে সহজ করবার জন্য ব্রাহ্মণ ছাড়া সব জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলা হল। এ-ছাড়া, নূতন বিধানকাররা উত্তরাধিকার ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নূতন নূতন বিধান দিতে লাগলেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে উত্তর ভারতের জন্য বিজ্ঞানেশ্বর রচনা করলেন 'মিতাক্ষরা', আর বাঙলার জন্য জীমূতবাহন তৈরি করলেন 'দায়ভাগ'। এগুলি হচ্ছে মনুরই একরকম পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। বাঙলাদেশ সম্বন্ধে জীমূতবাহন ছাড়া নূতন বিধানকারদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন ভবদেব ভট্ট ও রঘুনন্দন। দু'জনই ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মশাস্ত্রসমূহ (বিধান-গ্রন্থসমূহ) লেখা হয়েছিল উচ্চকোটির লোকেদের (elites) জন্য। রঘুনন্দনই প্রথম নিম্নকোটির লোকেদের (masses) প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মুসলমান কর্তৃক বাঙলা অধিকৃত হবার পর লোককে জোরজুলুম করে মুসলমান করা হত। তবে অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দুসমাজের অবহেলিত ও নিপীড়িত নিম্নকোটির লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ বরাবরই এদের ঘৃণার চোখে দেখত। এসব সম্প্রদায় ইসলামের সাম্য-নীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। এ-ছাড়া ছিল পদস্খলিতা হিন্দু সধবা ও

বিধবা। এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান পতি বা উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। (গ্রন্থকারের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্রষ্টব্য)। রঘুনন্দন দেখলেন এভাবে যদি হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহলে হিন্দু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাঁর সামনে এটা একটা 'চ্যালেঞ্জ' হিসাবে দেখা দিল। আগে যে-সব বিদেশী আক্রমণকারী এদেশে এসেছিল, তারা হিন্দুই হয়ে গিয়েছিল। তাতে হিন্দুসমাজ প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তরকরণের ফলে হিন্দু-সমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। কি-ভাবে এই ক্ষয় নিবারণ করা যেতে পারে, সেটাই হল রঘুনন্দনের চিন্তা। সেজন্য রঘুনন্দন বিধান দিলেন যে, মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ ধর্মান্তরিত লোকরা আবার হিন্দু হতে পারবে।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটল। ভবদেব ভট্টই প্রথম বাঙালী ব্রাহ্মণের আমিষ-ভোজনের বিধান দিলেন। তার আগে বাঙালী ব্রাহ্মণ আমিষ-ভোজনের জন্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ-দের কাছে হেয় ছিল। ভবদেব ভট্ট বাঙালী ব্রাহ্মণের আমিষ-ভোজনের বিধান দিলেও সিদ্ধ চাউল ও মসুরির ডাল খাওয়ার অনুমতি দিলেন না। বাঙালী ব্রাহ্মণকে এই অনুমতি দিলেন পরবর্তী বিধানদাতা রঘুনন্দন। এরপর ব্রাহ্মণরা বিদেশী তরকারিও (আলু, কপি, টম্যাটো ইত্যাদি) খেতে আরম্ভ করল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা কিছুদিন তাদের গোঁড়ামি বজায় রাখল বটে, কিন্তু পরে তারাও এসব খেতে লাগল। (গ্রন্থকারের 'বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)

আমরা দেখেছি যে হিন্দুসমাজ গঠিত হয়েছিল জাতিভেদপ্রথার ওপর। এই সমাজে প্রতি জাতির এক-একটি বিশেষ বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। ফলে, অর্থনৈতিক জীবনে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর কোনরূপ বিরোধ ছিল না। এই সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক বিন্যাসই হিন্দুসমাজকে দৃঢ় করে তুলেছিল।

হিন্দুসমাজে আছে অসংখ্য জাতি। বর্তমানে 'জাতি' বলতে আমরা দুটি জিনিস বুঝি। প্রথম, জাতক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার যে জাতিভুক্ত, জাতকও সেই জাতিভুক্ত হয়। দ্বিতীয়, জাতককে নিজজাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তার মানে, বংশানুক্রমে জাতকের জাতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে না। আমরা আগে দেখেছি যে চাতুর্বর্ণ্য প্রথা যখন প্রথম অবলম্বিত হয়েছিল, তখন এটা ছিল না। বর্ণ সম্বন্ধে তখন একটা 'সামাজিক সচলতা' (social mobility) ছিল। এক বর্ণের লোক অপর বর্ণে উন্নীত হতে পারত।

চতুবর্ণের বর্ণসমূহ প্রথমে কঠোর নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী (**rigid endogamous groups**) ছিল না। এটা 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' বিবাহপ্রথার প্রচলন থাকা থেকে বুঝতে পারা যায়। এই দুই বিবাহের ফসল ছিল সঙ্কর জাতি। তবে সঙ্কর জাতিগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল, তা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায়। (প্রমাণসূত্রের সংখ্যার অর্থ তালিকার শেষে দেখুন):

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
১. অম্বষ্ঠ	১ ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫, ৭, ১, ১২
	২ ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪
২. আগুরি	করণ	রাজপুত্র	৮
৩. উগ্র	১ ক্ষত্রিয়	শূদ্র	১, ৫, ১২, ৬
	২ ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৯
	৩ বৈশ্য	শূদ্র	৭
৪. কর্মকার	১ বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচী	৫
	২ শূদ্র	বৈশ্য	২
	৩ শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
৫. করণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
৬. চর্মকার	১ শূদ্র	ক্ষত্রিয়	৯
	২ বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৯
	৩ বৈদেহক	নিষাদ	৬
	৪ অয়োগব	ব্রাহ্মণ	৮
	৫ তীবর	চণ্ডাল	৩
	৬ তক্ষণ	বৈশ্য	২
৭. তিলি	গোপ	বৈশ্য	২
৮. তেলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
৯. তামলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	১
১০. কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
১১. চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২. নাপিত	১ ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	২ ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
	৩ ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
	৪ ক্ষত্রিয়	নিষাদ	৮
১৩. বাগদি	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৩
১৪. হাড়ি	লেট	চণ্ডাল	৩
১৫. সুবর্ণবণিক	১ অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	২
	২ বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচী	৩
১৬. গন্ধবণিক	১ ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
	২ অম্বষ্ঠ	রাজপুত্র	৭
১৭. কায়স্থ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
১৮. কৈবর্ত	১ নিষাদ	অয়োগব	৫
	২ শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	৩ ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
	৪ নিষাদ	মাগধ	৬
১৯. গোপ	১ বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	২
	২ ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৭
২০. ডোম	লেট	চণ্ডাল	৩
২১. তন্তুবায়	১ শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	২ বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচী	৩
২২. ধীবর	১ গোপ	শূদ্র	২
	২ বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	৪
২৩. নিষাদ	১ ব্রাহ্মণ	শূদ্র	১৪
	২ ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৬
	৩ ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৩
২৪. পোদ	বৈশ্য	শূদ্র	৩
২৫. মালাকার	১ বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচী	৩
	২ ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	২
২৬. মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪, ১২
২৭. মোদক	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
২৮. বারুজীবী	১ ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
	২ গোপ	তন্তুবায়	১৩
২৯. বৈদ্য	১ ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫
	২ শূদ্র	বৈশ্য	৬
৩০. শুঁড়ি	১ বৈশ্য	তীবর	৩
	২ গোপ	শূদ্র	২
৩১. রজক	১ বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৮
	২ ধীবর	তীবর	৩
	৩ করন	বৈশ্য	২

[প্রমাণসূত্র : ১. বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২. বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ৩. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৪. গৌতম ধর্মসূত্র, ৫. মনুসংহিতা, ৬. মহাভারত, ৭. পরাশরসংহিতা, ৮. সূতসংহিতা, ৯. উশানস্‌সংহিতা, ১০. বিষ্ণু ধর্মসূত্র, ১১. বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র, ১২. যাজ্ঞবল্ক্য, ১৩. জাতিমালা, ১৪. কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র]।

এক কথায়, সঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিধানকারদের মধ্যে কোন ঐক্যমত ছিল না। আবার মনুর বিধান অনুযায়ী স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হতে জাত পারশব নাম্নী কন্যার যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ হয়, এবং এরূপ ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিকভাবে সাতপুরুষ পর্যন্ত চলে, তবে সপ্তম জন্মে ওই পারশব বর্ণ, বীজের উৎকর্ষের জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনুসংহিতা ১০/৬২-৬৫)। সুতরাং এ-থেকে প্রমাণ হয় যে প্রাচীনকালে চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে একেবারে বাধ্যতামূলক কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে 'সামাজিক সচলতা' (social mobility) অনুমোদিত হত।

এবার আমরা বাঙলাদেশের জাতিবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। একেবারে সূচনায় বাঙলার সমাজ-সংগঠন আর্যসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে খুব বিলম্বে ঘটেছিল। সেজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ ছিল না; ছিল কৌমসমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। তারপর যে-সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না; ছিল পদাধিকার-ঘটিত বৃত্তিভেদ। এটা আমরা জানতে পারি সমসাময়িক তাম্রপট্টে উল্লেখিত 'প্রধান কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ', 'প্রতিবেশী', 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারী' ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সংস্থা (marriage

groups) থাকেনি। বৃত্তিধারী জাতিনির্বিশেষে তখন বিবাহ হতে থাকে। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজাদের পরে সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ বাঙলার সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। সেই তিন শ্রেণীর তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে :

(১) উত্তম সঙ্কর (শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা যাদের পুরোহিতের কাজ করে)—(ক) করণ, (খ) অম্বষ্ঠ, (গ) উগ্র, (ঘ) মাগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্যবণিক, (ছ) শঙ্খবণিক, (জ) কুম্ভকার, (ঝ) তন্তুবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সদ্গোপ, (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত, (ঢ) নাপিত, (ণ) মোদক, (ত) বারুজীবী, (থ) সূত, (দ) মালাকার, (ধ) তাম্বুলী ও (ন) তৈলক।

(২) মধ্যম সঙ্কর—(ক) তক্ষক, (খ) রজক, (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক, (ঙ) আভীর, (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌণ্ডিক, (ঝ) নট, (ঞ) শবক ও (ট) জালিক।

(৩) অন্ত্যজ—(ক) গৃহি, (খ) কুড়ব, (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বাহুর, (ঙ) চর্মকার, (চ) ঘটজীবী, (ছ) দোলবাহী ও (জ) মল্ল।

এ-ছাড়া আরও যে-সব জাতির উল্লেখ আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ (দেবল, গণক ইত্যাদি) ও ম্লেচ্ছজাতিসমূহ, যথা—পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, সৌম, কম্বোজ, শবর ও খর।

এরপর মধ্যযুগে আরও একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল—নবশাখ বিভাগ। নবশাখ হচ্ছে তারা, যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল নয়টি জাতি—তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা। এখানে উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মেদিনীপুরের জেলা আদালত,

কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত ও বিলাতের প্রিভি-কাউনসিল সদ্‌গোপদের 'সদ্‌গোপ ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। (Moore's India Appeals দ্রষ্টব্য)।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ অন্যান্য যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে, মধ্যযুগের বঙ্গীয় সমাজে তারাও বিদ্যমান ছিল। তারাই ছিল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়ূরভট্ট তাঁর 'ধর্মপুরাণ'-এ বাঙলাদেশের জাতিসমূহের এক তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি: 'সদ্‌গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥ যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥ হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি॥ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা। পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮২)। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের 'চণ্ডীকাব্য' ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'ও আমরা এইসকল জাতির উল্লেখ পাই। এদের মধ্যে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক জাতি ছিল ধনবান গোষ্ঠী।

এসকল জাতি বর্তমানেও বাঙলাদেশে বর্তমান। তবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বাঙলাদেশের জাতিসমূহ এখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: ১. তপশীলভুক্ত জাতি ও ২. অ-তপশীলভুক্ত জাতি। বাঙলার তপশীল-ভুক্ত জাতিসমূহ হচ্ছে: (১) বাউরী, (২) চামার, (৩) ধোবা বা রজক, (৪) ডোম, (৫) দোসাধ, (৬) ঘাসি, (৭) লালবেগী, (৮) মুসাহার, (৯) পান, (১০) পাশি, (১১) রাজওয়ার, (১২) তুরি, (১৩) বাগ্‌দি, দুলে, (১৪) বাহেলিয়া, (১৫) বাইতি, (১৬) বেদিয়া, (১৭) বেলদার, (১৮) ভুঁইমালী, (১৯) ভুইয়া, (২০) বিন্দ, (২১) দামাই, (২২) দোয়াই, (২৩) গৌড়ি, (২৪) হাড়ি, (২৫) জেলে কৈবর্ত, (২৮) ঝালোমালো,

(২৭) কাদার, (২৮) কামি, (২৯) কান্দ্রা, (৩০) কেওরা, (৩১) করেঙ্গা, (৩২) কাউর, (৩৩) কেওট, (৩৪) খটিক, (৩৫) কোচ, (৩৬) কোনাই, (৩৭) কোঁয়ার, (৩৮) কোটাল, (৩৯) লোহার, (৪০) মাহার, (৪১) মাল, মল্ল, (৪২) মাল্লা, (৪৩) মেথর, (৪৪) নমঃশূদ্র, (৪৫) মুনিয়া, (৪৬) পলিয়া, (৪৭) পাটনি, (৪৮) পোদ বা পৌণ্ড্র, (৪৯) রাজবংশী, (৫০) সরকি, (৫১) শুঁড়ি, (৫২) তিয়র, (৫৩) বানটার, (৫৪) চৌপল, (৫৫) ভোগতা, (৫৬) দাবগর, (৫৭) হালালখোর, (৫৮) কানজর, (৫৯) কুরারিয়ার, (৬০) নট, (৬১) ভূমিজ, (৬২) ভঙ্গী, ও (৬৩) খয়রা। এছাড়া বাকী সব জাতিই অ-তপশীলভুক্ত। অনেকের ধারণা যে তপশীল-ভুক্ত জাতিরা সকলেই নীচু জাত। কিন্তু তা নয়। কেননা, তপশীলভুক্ত জাতির তালিকায় আমরা ঝালোমালো, নট প্রভৃতি জাতির নাম পাই। মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র' অনুযায়ী (১০।২২) এরা সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও করণ-দের (কায়স্থ-দের) সমান। তবে বাঙলার জাতিসমূহের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে একটা মাহাত্ম্যের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলছে, বাগদীরা নিজেদের বর্গক্ষত্রিয় বলছে, মেথররা নিজেদের মলক্ষত্রিয় বলছে, পোদরা নিজেদের পুণ্ড্রক্ষত্রিয় বলছে। কিন্তু কেউ-ই চিন্তা করে দেখছে না যে সকলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে সমীকরণ করলে পরিস্থিতিটা কি দাঁড়ায়? সমীকরণ করলে পরিস্থিতিটা দাঁড়ায়: কায়স্থ = বাগদী = মেথর = পোদ = ক্ষত্রিয়।

তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি যে মাত্র বাঙলাদেশেই আছে, তা নয়। ভারতের সব অঞ্চলেই আছে। আবয়বিক বৈশিষ্ট্য সমেত তাদের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দু জাতিসমূহের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিলের কথাও বলা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ৭·৫৪ শতাংশ লোক হচ্ছে তপশীলভুক্ত জাতি। সেখানে 'পণ্ডিত' জাতির লোকরা ৬৬·৫ শতাংশ মধ্যমাকার ও ২০ শতাংশ খর্বকায়। মুসলিমদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ মধ্যমাকার ও ২৮·৮ শতাংশ দীর্ঘকায়। লাডাখিদের

মধ্যে ৬১ শতাংশ মধ্যমাকার ও ২৯ শতাংশ খর্বকায়। সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ডোগরা জাতিভুক্ত এবং তারা সাধারণত খর্বকায়, বুক প্রশস্ত, গলা ঋজু ও নাক ঈগল পাখীর মত। কানাওয়ারিরা সাধারণত মধ্যমাকারের লোক। এখানে উল্লেখনীয় যে জম্মু-কাশ্মীরে কোন উপজাতি নেই।

পাঞ্জাবের জনসংখ্যার ২০.৩৮ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ২০.০৭ শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। আওয়ান, অরোরা, গুজর, ক্ষত্রী, কুলু কানেট, লাহুল, কানেট, শিখ প্রভৃতি জাতির লোকদের মধ্যে ৬০.৩ শতাংশ মধ্যমাকার ও ৩০ শতাংশ দীর্ঘকায়। লাহুল কানেটরা বেশ খর্বকায়। শিখদের মধ্যে ৬১.৫ শতাংশ দীর্ঘকায়, ৩২ শতাংশ মধ্যমকায় ও ৬.৮ শতাংশ অতিশয় দীর্ঘকায়।

রাজস্থানের জনসংখ্যার মধ্যে ১৬.৬৭ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ১১.৪৬ শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। ভীলদের মধ্যে ৩৬.০ শতাংশ মধ্যমাকার ও ৫২.০ শতাংশ খর্বকায়। পানার রাজপুতরা ৩০.৭ শতাংশ দীর্ঘকায় ও ৬১.৫ শতাংশ মধ্যমাকার।

উত্তর ভারতে উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার ২০.৯১ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি। উত্তরপ্রদেশে ১৬টি উচ্চবর্ণের ও ৩৭টি নিম্নবর্ণের জাতি আছে। তিনটি উপজাতিও আছে, যথা—কাচি, লোধা ও ওরাঁও। এছাড়া আছে ছয়টি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, যথা—ভাটু, পাঠান, শেখ ইত্যাদি। এদের যে-সব পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ মাঝারি আকারের লোক। উত্তর-প্রদেশে অবস্থিত রাজপুতরা অবশ্য খুব ঢ্যাঙা, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম, মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.২ শতাংশ; ৩২.৫ শতাংশ ঢ্যাঙা ও ৫৫ শতাংশ মাঝারি। রাজপুতদের দুটি উপশাখা, যথা—চৌহান ও রাঠোরদের মধ্যে ৩০ শতাংশ ঢ্যাঙা ও ৬০ শতাংশ মাঝারি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাত্র একশতাংশ খুব ঢ্যাঙা: ৩৮ শতাংশ ঢ্যাঙা

ও ৮৩ শতাংশ মাঝারি। বেনিয়া ও ক্ষত্রিয়রা একশতাংশ খুব ঢ্যাঙা ও ১৫ শতাংশ ঢ্যাঙা। কায়স্থরা ৩৮ শতাংশ ঢ্যাঙা ও ১৭ শতাংশ মাঝারি। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ৫০ শতাংশ মাঝারি ও ৩০ শতাংশ বেঁটে। তবে কতকগুলি জাতির মধ্যে অসাধারণ বৈষম্য লক্ষিত হয়। যেমন গুজরদের মধ্যে ৮ শতাংশ খুবই ঢ্যাঙা, ৪১ শতাংশ ঢ্যাঙা, ৪৪ শতাংশ মাঝারি ও ২ শতাংশ দৈত্যাকায়। হাবরু জাতির লোকদের মধ্যে ২১ শতাংশ লম্বা, ৫৭ শতাংশ মাঝারি ও ২২ শতাংশ বেঁটে।

গুজরাটের জনসংখ্যার ৬·৩ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ১১·৩৫ শতাংশ উপজাতি। নগর ব্রাহ্মণ ও বেনিয়াদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মধ্যমাকার। নগর ব্রাহ্মণদের ২৬ শতাংশ বেঁটে, কিন্তু বেনিয়াদের মধ্যে বেঁটের সংখ্যা ৪২ শতাংশ। ভঙ্গীরা বেঁটে। মাচ্ছি-খারওয়া উপজাতির লোকরা বেঁটে। অন্যান্য জাতির লোকরা মাঝারি। ভাটিয়ারাও মাঝারি। পারসীরাও তাই। বেনিয়া জৈন, ওসওয়াল জৈন ও খোজারা মাঝারি।

মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৫·৩ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ৬·০৬ শতাংশ উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে খান্দেশ ভীল ও কাটকারিরাই প্রধান। ভীলরা মাঝারি, তবে ২০ শতাংশ লম্বা। কাটকারিদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বেঁটে ও ৪৪ শতাংশ মাঝারি। মহারাষ্ট্রের জাতি-সমূহের মধ্যে চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা ২১ শতাংশ লম্বা। অন্যান্য উচ্চবর্ণের 'মারাঠি' জাতিদের মধ্যে ১৬ শতাংশ লম্বা। কুন্বীদের মধ্যে ৫০ শতাংশের ওপর বেঁটে ও ৪৪ শতাংশ মাঝারি। অন্যান্য ৬০টি জাতি মাঝারি, তবে হালবি, কুন্বী মানা, মহার বাওয়ানে বা মারাঠা লোহাররা অধিকাংশই বেঁটে।

মধ্যপ্রদেশের জনসংখ্যার ১৩·১৫ শতাংশ তপশীলভুক্ত ও ২০·৬৩ শতাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। উপজাতিদের মধ্যে মারিয়ারা ৫০ শতাংশ মাঝারি ও ৪০ শতাংশ বেঁটে। তবে বাইগাদের মধ্যে

একটা ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বেঁটে ও ৪০ শতাংশ মাঝারি। দণ্ডামি মারিয়া, ঢাকর, গডাবা, হলাবা, পাহাড়ি খরিয়া ও রাউতিয়া কোলরা সাধারণত বেঁটে, তবে মাঝারি দৈর্ঘ্যের লোকও দেখা যায়। জাতিসমূহের মধ্যে মালবী ব্রাহ্মণ, বাঘেল রাজপুত ও বিবিধ অন্যান্য রাজপুতরা মাঝারি।

অন্ধ্রপ্রদেশের জনসংখ্যার ১৩'৮২ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ৩'৬৮ শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। জলারি, মালা, মাডিগা জাতির ও চেঞ্চু উপজাতির লোকরা মধ্যমাকার। জলারি, মালা ও মাডিগাদের মধ্যে ৫০ শতাংশের ওপর লোক মধ্যমাকার, কিন্তু চেঞ্চুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ বেঁটে। অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশ জাতিই মধ্যমাকার, কিন্তু পদ্মশালেরা বেঁটে। নৃতত্ত্ববিদ ইভানসকি ও চাকলাদার অন্ধ্রপ্রদেশের জাতিসমূহের যে বহুল পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে ৫১ শতাংশ মধ্যমাকার ও ৩৭ শতাংশ বেঁটে; আর তামিলদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ মধ্যমাকার ও ২৯ শতাংশ বেঁটে।

কেরলে ৬টি জাতি ও ২১টি উপজাতি আছে। নগণ্যসংখ্যক ইহুদিও আছে। কেরলের জনসংখ্যার মাত্র ১'২৩ শতাংশ ১১টি তপশীল-ভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকদের আকার বেঁটে। তবে শুক্ল ইহুদি ও সম্বভন সম্প্রদায়ের লোকরা লম্বা। কেরলের প্রধান দুই জাতি হচ্ছে নায়ার ও নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। নায়াররা মাঝারি, কিন্তু নাম্বুদ্রিরা মাঝারির তলায়। পরিমাপ-দৃষ্টে দেখা যায় যে কেরলের লোকরা বেঁটে বা মাঝারি, দীর্ঘশিরস্ক ও মাঝারি নাক-বিশিষ্ট। তবে কতকগুলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে প্রসারিত নাকও দেখা যায়। ইটালিয়ান নৃতত্ত্ববিদ চিপ্রিয়ানি (Cipriani), ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ও জার্মান নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর ডবলিউ. আর. এহরেনফেলস্ কেরলের কাদার জাতির কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে কুঞ্চিত কেশ লক্ষ্য

করেছিলেন। তা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে কাদারদের দেহে অন্তঃসলিলার মত এক নিগ্রিটো উপাদান আছে। কিন্তু বর্তমান লেখক ও ডক্টর শশাঙ্কশেখর সরকার এ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। (অমৃতবাজার পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৩৫)।

মহীশূরের জনসংখ্যার ১৩.২২ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ০.৮১ শতাংশ লোক উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। য়েরুবা উপজাতি এবং কোডাগু ও সিদ্ধি সম্প্রদায়ের লোকরা মাঝারি। সিদ্ধিয়ারা খুব সম্ভবত আফ্রিকার হাবসি জাতির লোক। য়েরুবাদের ক্ষেত্রে ৬৪ শতাংশ বেঁটে, তবে কুরুবা ও হাট্টিকনকনা কুরুবাদের মধ্যে মাঝারি লোকও দেখতে পাওয়া যায়। কেরলের জাতিসমূহের মধ্যে মুকরি ও আগের ছাড়া বাকী লোকরা মাঝারি। মুকরি ও আগেররা বেঁটে।

তামিলনাড়ুর জনসংখ্যার ১৮.০৩ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ০.৭৫ শতাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। শানার, পরওয়ান, পরায়ান, পট্টনাভন, বেল্লালা আম্বেদিয়ান, সেম্বদভন প্রভৃতি উপজাতিদের ৫০ শতাংশ মাঝারি দৈর্ঘ্যের লোক। তবে টোডাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ লম্বা ও ৫৯ শতাংশ মাঝারি। কম্মলন জাতির লোকরা বেঁটে। তারা ছাড়া অন্যান্য জাতিরা সকলেই মধ্যমাকারের লোক। যে-সব জাতি মধ্যমাকারের, তারা হচ্ছে পল্লি, পল্লন, মালওয়ালী, চাক্কিলিয়ান, অম্বট্টন, পরায়ান, সুকুন সালে ও সুক সালে। ওড্ডে ও ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মপ্পিলারাও সব মধ্যমাকারের।

ওড়িশার জনসংখ্যার ১৫.৭৫ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ২৪.০৭ শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। তেরোটি উপজাতির পরিমাপ থেকে দেখা যায় যে তাবা বেঁটে। তবে সাঁওতালরা মধ্যমাকার, যদিও তাদের মধ্যে যথেষ্ট বেঁটে লোক দেখা যায়। গোণ্ড ও মুণ্ডারা বেশিরভাগই মধ্যমাকার। নুলিয়া ও অন্যান্য জাতিসমূহ সবই মধ্যমাকার।

বিহারের জনসংখ্যার ১৪.০৭ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ৯.০৫

শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। ১৬টি উপজাতির পরিমাপ থেকে জানা যায়, তাদের ৬০ শতাংশ বেঁটে। হো উপজাতির মধ্যে ৪৭·৫ শতাংশ মধ্যমাকার, ৪৫ শতাংশ বেঁটে ও ৬·৫ শতাংশ লম্বা। খারওয়াররা মধ্যমাকার থেকে বেঁটে। বিহারের ১০টি নিম্নজাতির লোকরা মধ্যমাকার কিংবা বেঁটে। উচ্চজাতির মধ্যে ৩০ শতাংশ লম্বা, ৫০ শতাংশ মধ্যমাকার। তবে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা মধ্যমাকার ও বেঁটে। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১৩ শতাংশ খুব লম্বা। মোট কথা, বিহারের উচ্চজাতির লোকরা মধ্যমাকার।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১৯·৯০ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাত ও ৫·৯১ শতাংশ উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত লেপচা, খামবু, গারোরা, ও মুণ্ডারী গোষ্ঠীভুক্ত সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া, মালে বা লোধারা সকলেই মধ্যমাকার। তবে তাদের মধ্যে লম্বা ও বেঁটে লোকও দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকরা মধ্যমাকার ও বেঁটে। খুব কমসংখ্যক ঢ্যাঙা। বুনো বা নোলুয়ারা বেঁটে। তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বেঁটে, ১৫ শতাংশ মধ্যমাকার ও ২ শতাংশ খুব বেঁটে। বৈদ্যরা অপেক্ষাকৃত লম্বা। তবে তাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ মধ্যমাকার, ৩০ শতাংশ লম্বা, ২২ শতাংশ বেঁটে ও ৩ শতাংশ খুব বেঁটে। উচ্চজাতিদের মধ্যে ৫৫ শতাংশের ওপর মধ্যমাকার, ২০ শতাংশ লম্বা ও ১৫ শতাংশ বেঁটে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ৪৭·৬ শতাংশ মধ্যমাকার ও ৪২·৭ শতাংশ বেঁটে।

আসামের জনসংখ্যার ৬·১৭ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও ১৭·৪২ শতাংশ তপশীলভুক্ত উপজাতি। আবলেঙ, বোডো, খাসি, গারো প্রভৃতি ১২টি উপজাতির লোকরা অর্ধেকের ওপর মধ্যমাকার ও ৩০ শতাংশ বেঁটে।

মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুণাচল ও নাগাল্যাণ্ড-এর জনসংখ্যার মধ্যে

মণিপুরের পুরুম, থাডু কুকি, ত্রিপুরা, কাইপেঙ, রিয়াঙ তিপরা এবং অরুণাচল ও নাগাল্যাণ্ডের নাগা, আও নাগা ও আঙ্গামি নাগা প্রভৃতি ১১টি উপজাতির পরিমাপ থেকে দেখা যায়, তারা ৫০ শতাংশের ওপর বেঁটে, ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মধ্যমাকার। মণিপুরে ৪০টি মূল উপজাতি আছে। এছাড়া নাগা ও কুকি উপজাতির বহু শাখা-উপজাতিও আছে। সংখ্যাগরিমার দিক দিয়ে নাগাল্যাণ্ড-এর উপজাতিসমূহ হচ্ছে যথা-ক্রমে আঙ্গামি, আও, সেমা, কোনিয়ারা, চাখেসাঙ, লোথা, ফোম্, খিয়ামংগন, চাঙ, য়িমচুংগার, জেহাঙ কুকি, রেঙমা ও সাঙটম্। অরুণাচলপ্রদেশের ৬০ শতাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। তবে অধ্যুষিত উপজাতি-সমূহ অধিকাংশই বেঁটে, এক-তৃতীয়াংশের কম মধ্যমাকার। সকলেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর লোক।

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৩০,৪৩৩ মোট জনসংখ্যার ২২,০০০ জন নিকোবরী ও শোমপেন উপজাতিভুক্ত লোক। আকারে সকলেই বেঁটে। আন্দামানীরা চারটি উপজাতিতে বিভক্ত—জারাওয়া, সেণ্টেনেলিজ, বনবাসী এরিমটাগা অঙ্গী ও আন্দামানী। এরা নিগ্রিটো জাতিভুক্ত। আন্দামানের আদিম অধিবাসীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিমতম জনগোষ্ঠী। এরা সভ্যজগতের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। এদের সংখ্যা নগণ্য। নিকোবরের অধিবাসীরা আন্দামানের আদিম অধিবাসী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক।

বাঙলার জাতি ও উপজাতি

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ১৯.৯০ শতাংশ হচ্ছে তপশীলভুক্ত জাতি ও ৫.৯১ শতাংশ উপজাতি। এরাই হচ্ছে বাঙলার আদিম অধিবাসী, এবং এরাই রচনা করেছে বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ। পশ্চিমবঙ্গের তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৩২.৪৯ শতাংশ। মোট হিন্দু জনসংখ্যার বাকী ৬৭.৫১ শতাংশ তপশীল-বহির্ভূত জাতি-সমূহ। মোটামুটিভাবে আমরা তাদের বাঙলার উচ্চজাতি বলে বর্ণনা করি।

বাঙলার উচ্চজাতিসমূহ প্রায় সকলেই বিস্তৃতশিরস্কতার (brachy-cephaly) ছাপ বহন করে। এই বিস্তৃতশিরস্কতার বিস্তৃতি কিছু পরিমাণে উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যেও আছে। বাঙলার উচ্চজাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতশিরস্কতার লক্ষণ দেখে রিজলি কিরূপ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে বাঙালী তার বিস্তৃতশিরস্কতা আলপাইন নরগোষ্ঠীর কাছ থেকে পেয়েছে। যদিও আলপীয়রা আর্য-ভাষা-ভাষী ছিল, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে পঞ্চনদ উপত্যকায় আগত 'নর্ডিক' পর্যায়ভুক্ত বৈদিক আর্যদের ভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিয়ারসন (Grierson) এটা লক্ষ্য করেছিলেন। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশের আর্য-ভাষা-ভাষী লোকেরা 'অসুর' জাতিভুক্ত ছিল। এটা মহাভারতের এক উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মদেশের লোকেরা দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে, বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে বলিরাজার ক্ষেত্রজ সন্তান। মনে হয়, এই উক্তির পিছনে আছে দীর্ঘতর কোন জাতির সহিত রক্ত-সংমিশ্রণের কাহিনী।

(লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' ও 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থদ্বয় দ্রঃ)।

তবে বাঙলায় আগত আলপীয়রা তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। তারা বাঙলার আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoids) ও আলপীয়দের পূর্বে আগত দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে খানিকটা সংমিশ্রিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত দুই জাতির বিশিষ্টতা হচ্ছে দীর্ঘশিরস্কতা (dolichocephaly)। বাঙলার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে এইসকল নৃতাত্ত্বিক উপাদান কি পরিমাণ আছে, সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা বাঙলার আদি ও পরবর্তীকালের সমাজবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে চাই। বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যসমাজের অনুপ্রবেশ অনেক পরে ঘটেছিল। আদিতে বাঙলার সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল। এই সকল কৌম-জাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র ও কর্বট। মনে হয়, পুণ্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি ও কর্বটদের বংশধর হচ্ছে কৈবর্ত। এছাড়া প্রাচীন বাঙলায় আরও কৌমভিত্তিক জাতি ছিল, যথা—বাগদী, হাড়ি, ডোম, বাউরি ইত্যাদি। বাগদীরাই যে একসময় বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল, তা আমরা প্রাচীন গ্রীসদেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে জানতে পারি। এরা ঋগ্বেদে বর্ণিত 'বঙ্গদ' জাতির বংশধর কিনা তাও বিবেচ্য। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্রঃ)।

যদিও খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তথাপি গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সে-যুগে জাতিভেদের যে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। পালরাজগণের পরে সেনরাজগণ বাঙলায় আবার ব্রাহ্মণ্য-

ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নূতন করে আবার একটা জাতি-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু পালরাজগণের চারশত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহু সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' (যা সেনরাজগণের রাজত্ব-কালের অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল) থেকে আমরা জানতে পারি যে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার আর সব জাতিই সংকর জাতি। তবে এইসকল সংকর জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল।

সে যাই হোক, বাঙলার জাতিসমূহ যে সংকর জাতি তা বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তবে এই সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত হদিস পাওয়া যায় না, কেননা বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্নরকম উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও বা কোন জাতি অনুলোম বিবাহের ফসল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলোম বিবাহের ফসল।

বস্তুত পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিসমূহের উৎপত্তিকাহিনী যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, প্রথমত পরস্পরবিরোধী মতবাদ, ও দ্বিতীয়ত উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিসাবে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' জাতি কোনদিনই বাঙলায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু এইসকল লিপিতে কেহ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করেনি। তবে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানা জাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল, তা নয়—পুনঃমিশ্রণেরও ফল।

পরবর্তীকালে বাঙলায় যে সমাজবিন্যাস রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে : (১) ব্রাহ্মণ, (২) বৈদ্য, (৩) কায়স্থ, (৪) নবশাখ ও (৫) অন্যান্য জাতি। যে-সব জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করত, তাদেরই নবশাখ বলা

হত। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক ও মোদক। অন্যান্য জাতি-সমূহ ছিল জল-অনাচরনীয়।

তবে বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (endogamous) হিসাবে মধ্যযুগে যে-সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। এসকল জাতি আজও বিদ্যমান আছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৩টি তপশীল-ভুক্ত জাতি আছে, তাদের নাম আমরা আগে দিয়েছি। ৬৩টি তপশীল-ভুক্ত জাতির মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৬৮,৯০,৩১৪। ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে তাদের মধ্যে যারা প্রধান, তারা হচ্ছে রাজবংশী (১২,০১,৭১৭), বাগদী (১০,৯৩,৮৮৫), পোদ (৮,৭৫,৫২৫), নমঃশূদ্র (৭,২৯,০৫৭), বাউরি (৫,০১,২৬৯), চামার বা মুচি (৩,৯৬,৫৯১), ধোবা (১,৫৪,৭৯১), ডোম (১,৫১,৮০৮), হাড়ি (১,২৫,৮৫০), কেওড়া (১,১৭,৯২৯), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (১,১৭,৭০৪), শুঁড়ি (১,০৬,৮৭০), লোহার (৮৩,৫৪৫), পলিয়া (৭৩,৯৯৭), ঝালোমালো (৬৮,৭৫৭), খয়রা (৬৭,৯১৩) ও ভুঁইয়া (৫৩,৩২৯)। তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার এরা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে ৮৭·৬৭ শতাংশ। বাকী ৪৫টি তপশীলভুক্ত জাতির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০০-এর কম। আবার অনেক তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যা হচ্ছে একহাজারের কম। সমষ্টিগতভাবে এরা মোট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১·৩২ শতাংশ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশি তপশীলভুক্ত জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় চব্বিশ-পরগনায় (১৫,২৪,৯২২),। এর পর ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় স্থান পায় বর্ধমান (৭,৫৩,৮৮৩), মেদিনীপুর (৫,৬৩,৪০৬) ও বাঁকুড়া (৪,৯২,৭০০)। কুচবিহার, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও

বাঁকুড়া, এই পাঁচটি জেলায় তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ বাস করে। আর পুরুলিয়া, মালদহ, কলিকাতা ও দার্জিলিঙ, এই চারটি জেলায় বাস করে মাত্র ৮ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতির লোক। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশি তপশীলভুক্ত লোকসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহারে (৪৬.৯০ শতাংশ)। এর পর স্থান পায় জলপাইগুড়ি (৩০.৮০ শতাংশ), বাঁকুড়া (২৯.৬০ শতাংশ), বীরভূম (২৯.১৪ শতাংশ), বর্ধমান (২৪.৫ শতাংশ) ও চব্বিশ-পরগনা (২৪.২৮ শতাংশ)।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ তপশীলভুক্ত জাতির উৎপত্তি হয়েছে উপজাতি থেকে। মাত্র হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর থেকেই, তারা বর্ণ ও জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে। রাজ-বংশীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে কোচ উপজাতি থেকে। রিজলি বলেছিলেন, রাজবংশী কোচ ও পলিয়াদের উৎপত্তি হয়েছে একই উৎস থেকে। রাজবংশীদের প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ-পরগনায়। পোদেরা এখন নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী তারা বৈশ্য ও শূদ্রের সং-মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর জাতি। মনে হয়, প্রাচীন সাহিত্যে উক্ত পুণ্ড্র-জাতি হতে তারা অভিন্ন। যদি তাই হয়, তাহলে তারা বাঙলার অতি প্রাচীন জাতি। কেননা পুণ্ড্রদের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। পোদেদের আবাসস্থল প্রধানত চব্বিশ-পরগনা, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায়। বাগদীরাও এখন নিজেদের ব্যগ্রক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। ওলডহামের মতে, তারা মাল-জাতিরই এক উপশাখা মাত্র। তবে বাগদীরা যেভাবে নিজেদের গোষ্ঠী বিভাগ করে (যেমন তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, মাটিয়া), তা থেকে মনে হয় যে এগুলি একসময় উপজাতি-সংক্রান্ত 'টোটেম' ছিল। উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাগদীদের পশ্চিমবঙ্গের

সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের রাজ্যের এক অংশের (দক্ষিণবঙ্গের) নাম ছিল বাগড়ি। মনে হয়, এটা বাগদী-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। নমঃশূদ্রদের বাস হচ্ছে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ-পরগনা ও কুচবিহার জেলায়। রিজলির মত অনুযায়ী পোদ, কয়াল, কোটাল, ঢুলিয়া ও বেরুয়া—এরা সকলেই হচ্ছে নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর উপশাখা। অনেকে নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল সমার্থ-বোধক শব্দ বলে মনে করেন; কিন্তু নমঃশূদ্রেরা নিজেদের চণ্ডাল থেকে উচ্চ-সম্প্রদায়ের লোক বলে দাবী করেন। বাউরিরা প্রধানত রাঢ় দেশের লোক। তাদের বর্তমান আবাসস্থল হচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও পুরুলিয়া জেলায়। তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৫,০১,২৬৯ বা সমগ্র তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জনসংখ্যার ৭·২৭ শতাংশ। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা দাবী করে যে, দেবগণের খাদ্য অপহরণ করার অপরাধে তাদের বাউরি জাতি হিসাবে জন্মাতে হয়েছে। বস্তুত দেশজ উপজাতিসমূহ যখন হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করে, তখন তারা সকলেই এক-একটা উপকথা সৃষ্টি করে নিজেদের গৌরবান্বিত করবার চেষ্টা করে। যেমন, চামাররা নিজেদের রামানন্দের শিষ্য রবিদাস বা রুইদাস-এর বংশধর বলে দাবী করে। মুচিরা নিজেদের ঋষি বলে আখ্যাত করে। অনুরূপভাবে ধোবারা নিজেদের নেতামুনি বা নেতা-ধোবানির বংশধর বলে দাবী করে। কিন্তু স্কন্দপুরাণ ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণ অনুযায়ী ধোবারা ধীবর পিতার ঔরসে তিবর মাতার গর্ভে উৎপন্ন। অবশ্য অনুরূপ উৎপত্তিকাহিনী ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণসমূহে মাত্র ধোবাদের সম্বন্ধেই লেখা নেই, অন্যান্য জাতিসমূহ সম্বন্ধেও লেখা আছে। অনুরূপভাবে হাড়িরা দাবী করে যে তারা ব্রহ্মার হাতের ময়লা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তবে বর্তমান জাতি-বিন্যাস ব্যবস্থিত হবার পূর্বে, এইসকল তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতি-সমূহের সমাজে যে অনুরূপ স্থান ছিল, তা মধ্যযুগের চর্যাগানসমূহে

ডোম জাতির ভূমিকা থেকে বুঝতে পারা যায়। লক্ষণীয় যে, যারা সমাজের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'টেকনোলজিক্যাল' কাজে নিযুক্ত থাকত, ব্রাহ্মণ সমাজবিন্যাস-ব্যবস্থাপকেরা তাদেরই সমাজে নিকৃষ্ট স্থান দিয়েছিলেন।

রাজবংশী, বাগদী, পোদ, নমঃশূদ্র, বাউরি, চামার, ধোবা, ডোম ও হাড়ি ছাড়া আর যে প্রধান প্রধান তপশীলভুক্ত জাতি আছে, তারা হচ্ছে কেওড়া (১,১৭,৯২৯), কেওট (২৩,১৭৪), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (৬৮,৭৫৯), শুঁড়ি (১,০৬,৮৭০), লোহার (৮৩,৫৪৫), পলিয়া (৭৩,৯৯৭), ঝালোমালো (৬৮,৭৫৭), খয়রা (৬৭,৯১৩), ভুঁইয়া (৫৩,৩২৯), কোনাই (৪৩,১০১) ও ভুঁইমালী (৩৯,১৮১)।

চেহারার সাদৃশ্য থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ উপজাতিসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কোচ-রাজবংশীদের কিছু অংশ মঙ্গোলীয় উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বাকী উপজাতিসমূহ আদি-অস্ত্রাল নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই আদি-অস্ত্রাল উপজাতিসমূহ যে মাত্র বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠনেই সাহায্য করেছে, তা নয়—তারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও সংস্কার রচনাতেও যথেষ্ট উপাদান যুগিয়েছে। এদের ভাষার শব্দসমূহ যে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া কুলকেতুর (টোটেম) পূজাসংক্রান্ত আচার-ব্যবহার, শুভকাজে তেল-হলুদের ব্যবহার, ঝাড়ফুঁক, খাদ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ, যাদুতে বিশ্বাস, পঙ্‌ক্তিভোজন, সগোত্র-বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ, ধান্যের চাষ, হস্তিবিদ্যা প্রভৃতি আদি-অস্ত্রাল উপজাতিসমূহের নিকট থেকে বাঙালী-সমাজে গৃহীত হয়েছে।

(উপরে জনসংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা সবই ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের। তার পরবর্তীকালের হিসাব পাওয়া যায় না, কেননা আদম-

শুমারিতে এখন জাতি ও উপজাতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান-গ্রহণ বর্জিত হয়েছে।)

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের লোক-সংখ্যা ছিল ২০,৫৮,০৮১। আমরা আগেই দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গে তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যা ছিল ৬৮,৯০,৩১৪। সুতরাং তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির মোট সংখ্যা ছিল ৮৯,৪৪,৩৯৫ বা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ২৫·৮ শতাংশ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার তারা ছিল ৩২·৪৯ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাঁওতালরা। তাদের সংখ্যা ১২,০০,০১৯। তার পরেই হচ্ছে ওরাঁওরা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৯৭,৩১৪। আর তার পরে হচ্ছে মুণ্ডা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১,৬০,২১৫। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। সাঁওতাল, ওরাঁও ও মুণ্ডা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপজাতি হচ্ছে ভূমিজ, কোরা, লোধা বা খেরিয়া, হো, ভুটিয়া, লেপচা, মহালি, মেচ, নাগেসিয়া ও রভা। সাঁওতাল, ওরাঁও ও মুণ্ডাদের বাদ দিলে, বাকী ৩৮টি উপজাতির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম। এদের মধ্যে আবার অনেকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। যেমন বৈগাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪, আর কিষাণদের হচ্ছে ৩। তবে মুণ্ডাদের পরে যাদের সংখ্যাগরিমা আছে, তারা হচ্ছে যথাক্রমে ভূমিজ, কোরা ও লোধা। ভূমিজদের সংখ্যা হচ্ছে ৯১,২৮৯, কোরাদের ৬২,০২৯ ও লোধাদের ৪০,৮৯০। এরা সকলেই বাঙলার আদিম অধিবাসী। আর অন্যান্য যে-সব সংখ্যালঘু উপজাতি আছে, তারা মনে হয়, অন্য অঞ্চল থেকে বাঙলায় প্রবেশ করে এখানে বাস করছে।

সাঁওতালরা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি ও মালদহ জেলায় বাস করে। কিন্তু সাঁওতালদের বাসস্থানের পরিধি মাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পশ্চিমবঙ্গে

সাঁওতালদের যে সংখ্যা, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক সাঁওতাল বাস করে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে, বিহারের ঝাড়খণ্ডে (সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ, মানভূম ও সিংভূম জেলায়)। অবশ্য একসময় এসব অঞ্চল বাঙলা-দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনে হয়, প্রাচীন অঙ্গদেশেই সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল। কেননা তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী তারা বহুপুরুষ চম্পায় বাস করত। সেখান থেকে হিন্দুরা তাড়িয়ে দিলে, তারা সাঁওতাল পরগনায় এসে বাস করে। পরে তারা বাঙলা-দেশের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত খেরওয়ারি ভাষায় কথা বলে। কিংবদন্তি অনুযায়ী তাদের আগের নাম ছিল খারবার। 'খর' শব্দ 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'হর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মানুষ'। মেদিনীপুরের সাঁওত পরগনায় এসে যখন তারা বাস করে, তখন তাদের নাম সাঁওতাল হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর জেলায়। এ-থেকেই বুঝতে পারা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সাঁওত পর-গনাতেই তাদের প্রথম বাস। মনে হয় 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' উল্লেখিত 'খর' জাতি ও সাঁওতাল জাতি অভিন্ন।

সাঁওতালরাই যে পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী ও আদি-অস্ত্রাল জাতিভুক্ত, আর বাকী অন্যান্য উপজাতিরা এখানে আগন্তুক মাত্র, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যাগরিমার দিক থেকে প্রথম ছয়টি উপজাতির জনসংখ্যার নিচে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে এটা স্বতই প্রমাণিত হয়।

উপজাতি	পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
১. সাঁওতাল	১২,০০,০১৯	৫৮·৪২
২. ওরাঁও	২,৯৭,৩৯৪	১৪·৪৮

উপজাতি	পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
৩. মুণ্ডা	১,৬০,২৪৫	৭·৮০
৪. ভূমিজ	৯১,২৮৯	৪·৪৪
৫. কোরা	৬২,০২৯	৩·০২
৬. লোধা বা খেরিয়া	৪০,৮৯৮	১·৯৯
৭. বাকী ৩৫টি উপজাতি	২,০২,১০৭	৯·৮৫
মোট উপজাতি জনসংখ্যা	২০,৫৪,০৮১	১০০·০০

এখানে উল্লেখনীয় যে সাঁওতালদের সঙ্গে মুণ্ডাদের ভাষাগত ঐক্য আছে, কিন্তু ওরাঁওদের সঙ্গে নেই। ('ভাষার যাদুঘর' অধ্যায় দেখুন)। ওরাঁওদের বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি (১,৮১৭৪৯), দার্জিলিং (২৮,৩৩৮), পশ্চিম দিনাজপুর (২২,২৮৭) ও চব্বিশ-পরগনায় (২৪,৭০৭)। এই চার জেলায় ওরাঁওদের সংখ্যা ২,৬৪,৮৩১, তার মানে পশ্চিমবঙ্গের মোট ওরাঁও জনসংখ্যার (২,৯৭, ৩৯৪) ৮৯·০৪ শতাংশ। মুণ্ডারা অধিক সংখ্যায় বাস করে জলপাইগুড়ি (৫৩,৮৮১) ও চব্বিশ-পরগনা জেলায় (৪১,২৫৬)। এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মোট মুণ্ডা জনসংখ্যার (১,৬০,২৪৫) ৬০·১৮ শতাংশ এই জেলাদ্বয়ে অবস্থিত। ওরাঁওদের মত তারাও যে এই দুই জেলায় আগন্তুক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এদের মধ্যে কতসংখ্যক চিরস্থায়ী বাসিন্দা, আর কতসংখ্যক ভাসমান শ্রমিক জনকুণ্ডলী তা বলা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের বাকী জেলাসমূহে মুণ্ডাদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৪.১০৮ বা মোট মুণ্ডা জনসংখ্যার মাত্র ৩৯·৮২ শতাংশ। এক কথায়, ওরাঁওদের মত মুণ্ডারা ভাগীরথীর পূর্ব অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। ভূমিজরা কিন্তু রাঢ় দেশের বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের লোক। এদের বাসস্থান প্রধানত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগনা ও পুরুলিয়া জেলায়। যদিও জলপাইগুড়ি জেলায় কিছুসংখ্যক কোরাদের সাক্ষাৎ মেলে, তা হলেও

কোরাদের অবস্থিতি মোটামুটি ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে—বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও হুগলি জেলায়। লোধাদের বাসস্থান হচ্ছে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে—মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সংলগ্ন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাকী ৩৫টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে নগণ্য। তাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) আদি-অস্ত্রাল ও (২) মঙ্গোলীয়। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বেদিয়া, বিরহর, চেরো, গোণ্ড, গোরাইত, হো, করমালী, খারওয়ার, কোরওয়া, লোহারা, মহালী, মালপাহাড়িয়া, নাগাসিয়া, পারহাইয়া, সওরিয়া, পাহাড়িয়া ও শবর। আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজঙ, লেপচা, মগ, মেচ, মুরু ও রভা। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বাসস্থান হচ্ছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে ও পূর্বসীমান্ত অঞ্চলে। এরা অস্ট্রিক ভাষার মোন্-খ্মের গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলে।

এবার আমরা বাঙলার জাতি, উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতি-সমূহের নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমেই এদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া যাক :

জাতি	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
*ব্রাহ্মণ	৭৮·৮	৭০·৮	১৬৭৬
কায়স্থ	৭৮·৪	৭০·৭	১৬৩৬
সদ্গোপ	৭৮·৬	৮৪·২	১৬৩৩

---

* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে :

ব্রাহ্মণ	৭৮·৯	৬০·৭	১৬৮০
কায়স্থ	৮০·৮	৬৮·৯	১৬৯০

জাতি	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ মিঃ মিঃ
গোয়ালা	৭৭'৩	৭৪'৬	১৬৪৬
কৈবর্ত	৭৭'৫	৭৬'৬	১৬২৯
পোদ	৭৭'৮	৭৬'৪	১৬২৫
রাজবংশী	৭৫'৪	৭৬'৯	১৬০৭
বাগদী	৭৬'৪	৮০'৮	১৬০৩
বাউরি	৭৫'১	৮৪'৩	১৫৮৫
চণ্ডাল	৭৮'১	৭৪'২	১৬১৯
মুসলমান	৭৭'৯	৭৭'৫	১৬৩৪
সাঁওতাল	৭৬'১	৮৮'৮	১৬১৪
মুণ্ডা	৭৪'৫	৮৯'৯	১৫৮৯
ওরাঁও	৭৫'৪	৮৬'১	১৬২১
মালপাহাড়িয়া	৭৫'৮	৯৩'৬	১৫৭৭

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এরা কেউই বিস্তৃতশিরস্ক (brachy-cephalic) নয়, সবাই নাতিদীর্ঘশিরস্ক বা মাঝারি আকারের মাথার লোক। আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙলায় আসবার পর আলপীয়রা বাঙলার দেশজ জাতিসমূহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দেশজ জাতি-সমূহ দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic) নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। এই সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়া গড় পরিমাপের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যক্তির পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতির (range) দিকে নজর দিলে আমরা অন্য দৃশ্য দেখতে পাব। যেমন, যদিও ব্রাহ্মণদের গড় শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৮'৮, তথাপি যে-সকল ব্রাহ্মণের পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তাদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭২ থেকে ৮৭। অনুরূপভাবে

কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮৮ এবং সদ্‌গোপদের ঠিক ব্রাহ্মণদের মত ৭২ থেকে ৮৭। লক্ষ্য করা যাবে যে, যদিও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার গড় প্রায় একই এবং বিস্তৃতির (range) দিক থেকে যদিও ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপদের বিস্তৃতি এক, তথাপি এদের গড়ের মধ্যে মিল নেই। গড়ের পার্থক্য নির্ভর করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্ক ব্যক্তির অনুপাতের কম-বেশির উপর। বস্তুত উপরে যে-সকল জাতি ও উপজাতির পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, তাদের সকলেরই মধ্যে বিস্তৃতশিরস্কতা (তার মানে, ৮০-র উপর শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা) বর্তমান আছে। গড় যত নিচের দিকে গিয়েছে, সেই জাতির মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্ক ব্যক্তির সংখ্যা তত কম। সেটা ঊর্ধ্বতম বিস্তৃত-শিরস্কের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা থেকেও প্রকাশ পায়। যথা: কৈবর্তদের মধ্যে ৮৭, পোদদের ৮৫, চণ্ডালদের ৮৯, বাগদীদের ৮৩, বাউরিদের ৮১, ভূমিজদের ৮৪, সাঁওতালদের ৮৮, মুণ্ডাদের ৮১ ও ওরাঁওদের ৮৭। অনুরূপভাবে সবচেয়ে নিম্নতম দীর্ঘশিরস্ক ব্যক্তিদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও তাদের সংখ্যা-পরিমাণ গড়কে প্রভাবান্বিত করেছে। যথা: ব্রাহ্মণদের ৭২, সদ্‌গোপদের ৭২, বাউরিদের ৭১, কায়স্থ, কৈবর্ত, পোদ ও চণ্ডালদের ৭০, বাগদীদের ৬৮, ভূমিজদের ৬৭, সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের ৬৯ ও ওরাঁওদের ৬৭। বস্তুত বাঙলাদেশে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে, পরবর্তীকালে পুরাণকারগণ বাঙলার জাতিসমূহকে 'সংকর' জাতি বলে অভিহিত করে অন্যায় কিছু করেননি।

তবে এ-কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, মাত্র শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ করা যায় না। এর সঙ্গে নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও দেহ-দৈর্ঘ্যের পরিমাপও বিচার করতে হয়। সেদিক থেকে দেখা যাবে যে, আমরা

উপরে প্রদর্শিত জাতিসমূহের যে তালিকা দিয়েছি, তাতে আমরা যত উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর দিকে যাব, তত বেশি চওড়া নাক ও খাটো দেহ-দৈর্ঘ্য (উভয়ই আদি-অস্ত্রাল বা **Proto-Australoid** জাতির লক্ষণ) দেখতে পাব। নিচে আমরা বিভিন্ন জাতির শিরাকার ও নাসিকাকার -জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যাসমূহের পরিসীমা দেখালাম :

জাতি	শির-সূচক সংখ্যা	নাসিকা-সূচক সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
ব্রাহ্মণ	৭১—৮৭	৫৮--১০০	১৫৫০--১৭৩৪
কায়স্থ	৭০—৮৮	৫৬— ৮৯	১৫৪৪—১৮১০
সদ্‌গোপ	৭১—৮৭	৫৫— ৯৮	১৫১০--১৬৮০
কৈবর্ত	৭০—৮৭	৬৩—১০৩	১৪৯০—১৭৭৬
পোদ	৭০—৮৫	৬৩— ৯১	১৪৯০—১৮৫০
চণ্ডাল	৭০—৮৯	৬১— ৮৯	১৪৭২—১৭৩৪
বাগদী	৬৮—৮৩	৬১—১০০	১৪৩৪—১৭১২
ভূমিজ	৬৭—৮৪	৭১—১১৩	১৪৬০—১৭৮২
সাঁওতাল	৬৯—৮৮	৭৪—১১০	১৫১০—১৭৭০
মুণ্ডা	৬৯—৮১	৭৪—১১২	১৪৪৬—১৭১৮
ওরাঁও	৬৭—৮৭	৭০—১১৩	১৪৮০—১৭৪৪

যাক, এবার আমরা গড়ের দিক থেকে একটু বিচার করি। কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রায় সমান। কিন্তু কায়স্থদের দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম। সদ্‌গোপদেরও শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে প্রায় সমান, কিন্তু তাদের নাক কিছু বেশি প্রসারিত ও দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক কম। গোয়ালা, কৈবর্ত ও পোদদের বিস্তৃতশিরস্কতা অনেক কম ও নাক বেশি প্রসারিত এবং দেহ-দৈর্ঘ্য গোয়ালাদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কম, ও তাদের চেয়েও

কম পোদদের। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত, তথাপি তারা নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক ও কৈবর্তদের চেয়ে দেহ-দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। তবে রাজবংশীদের সঙ্গে যে মঙ্গোলীয় পর্যায়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', তৃতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য)। বাগদী ও বাউরিরা নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক, বিস্তৃতনাসা ও দৈহিক উচ্চতায় অনেক কম। সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে বাগদী ও বাউরিদের উপর আদি-অস্ত্রাল **(Proto-Australoid)** প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে রয়েছে। পোদদের সঙ্গে বাঙলার মুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ নেই। এ-থেকে বুঝতে পারা যায় যে হিন্দুসমাজের অবহেলিত পোদ সম্প্রদায়ের লোকরাই অধিক পরিমাণে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। আরও বলা দরকার যে, যদিও বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণরা প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভক্ত (যথা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য), তা হলেও তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ বিশেষ কিছু নেই। (তুলনামূলক পরিমাপের জন্য লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' তৃতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৪ দ্রষ্টব্য)। বাঙলার বৈদ্যদের পরিমাপও অনেকটা ব্রাহ্মণদের মত।

তবে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সামান্য হেরফের থাকলেও, আমরা কয়েকটি বিশেষ জাতির মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সদ্‌গোপরা একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। অনুরূপভাবে গোয়ালা, কৈবর্ত ও পোদরা একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত। কেবল চণ্ডাল ও নমঃশূদ্ররা ব্যতিক্রম। আর সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহ একই পর্যায়ভুক্ত।

বাঙলার অধিকাংশ জাতিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের আঞ্চলিক প্রাধান্য। আঞ্চলিক প্রাধান্য থেকে আমরা তাদের আদি আবাসস্থল

সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করতে পারি। তবে আজ পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার তাদের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত করেছে। সেজন্য মনে হয়, আজকের পরিবর্তে একশ' বছর আগেকার পরিস্থিতিটা এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করবে। সেজন্য আমরা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারির পরিসংখ্যানের সাহায্য গ্রহণ করছি। আমরা আলোচনা করছি পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলা, যথা—(১) মেদিনীপুর, (২) হুগলি-হাওড়া (তখন এ-দুটি সংযুক্ত জেলা ছিল), (৩) বর্ধমান, (৪) বাঁকুড়া, (৫) বীরভূম, (৬) চব্বিশ-পরগনা ও (৭) নদীয়া ; ৩০টি জাতি, যথা—(১) কৈবর্ত, (২) বাগদী (৩) ব্রাহ্মণ, (৪) সদ্গোপ, (৫) গোয়ালা, (৬) কায়স্থ, (৭) তিলি, (৮) পোদ, (৯) তাঁতী, (১০) চামার, (১১) বাউরি, (১২) কেওরা, (১৩) চণ্ডাল, (১৪) নাপিত, (১৫) ডোম, (১৬) যুগী, (১৭) কুম্ভকার, (১৮) হাড়ি, (১৯) শুঁড়ি, (২০) গন্ধবণিক, (২১) সুবর্ণবণিক, (২২) আগুরী, (২৩) ময়রা, (২৪) তাম্বুলী, (২৫) বারুই, (২৬) বৈদ্য, (২৭) ভুঁইয়া, (২৮) কাঁসারী, (২৯) মেথর ও (৩০) শাঁখারী জাতিসমূহের ভিত্তিতে। কৈবর্তদের (মোট জনসংখ্যা ১৩,৫৮,৫৩১ এবং স্বতন্ত্রভাবে মাহিষ্যের উল্লেখ ছিল না) ৬,৯২,১৪০ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায় ও ২,৮৮,৬২১ হুগলি-হাওড়া জেলায়। তার মানে, ৭২ শতাংশ এই জেলা-সমূহে বাস করত। বাগদীদের (মোট জনসংখ্যা ৬,৪৪,১৬৮) ২,০৪,০৭৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৫২,৬১৮ জন হুগলি-হাওড়া জেলায় ও ৯৯,৮১৬ জন চব্বিশ-পরগনায়। তার মানে, ৭১ শতাংশ এই জেলা-সমূহে বাস করত। ব্রাহ্মণদের (মোট জনসংখ্যা ৬,১৬,৬৫৯) সবচেয়ে বেশি বাস করত বর্ধমান জেলায় এবং তারপর যথাক্রমে চব্বিশ-পরগনা, মেদিনীপুর ও হুগলি-হাওড়া জেলায়। সদ্গোপদের (মোট জনসংখ্যা ৬,১৬,৫১৬) ১,৮৫,৮০৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৮৩,০৮০ জন মেদিনীপুর জেলায়, ১,০৯,৬৩০ জন বীরভূম জেলায় ও ৬৩,৭৭৪ জন

হুগলি-হাওড়া জেলায়। তার মানে, তাদের মোট সংখ্যার ৮৭ শতাংশ এই সংযুক্ত অঞ্চলে বাস করত। গোয়ালাদের সংখ্যাধিক্য ছিল যথাক্রমে বর্ধমান, চব্বিশ-পরগনা ও নদীয়া জেলায়; কায়স্থদের যথাক্রমে মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগনা ও বর্ধমান জেলায়: এবং তিলিদের যথাক্রমে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায়। পোদদের ৯১ শতাংশ বাস করত চব্বিশ-পরগনায়; তাঁতীদের ৭৫ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, হুগলি-হাওড়া ও বর্ধমান জেলায়। বাউরিদের ৭৮ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায়। চামারদের ৮৩ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলায়। ডোমদের ৬৫ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়। কেওরাদের ৫৫ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে চব্বিশ-পরগনা ও হুগলি-হাওড়া জেলায়। যুগীরা পোদদের মত চব্বিশ-পরগনার লোক। এই জেলাতেই তাদের ৬৮ শতাংশ বাস করত। কুম্ভকারদের ৭৭ শতাংশ যথাক্রমে বাস করত মেদিনীপুর, হুগলি-হাওড়া, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায়; হাড়িদের ৮৭ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে বর্ধমান, মেদিনীপুর চব্বিশ-পরগনায়। শুঁড়িদের ৪৬ শতাংশ বাস করত বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়। গন্ধবণিকদের ৬৬ শতাংশ যথাক্রমে বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায়। সুবর্ণবণিকদের ৬৬ শতাংশ বাস করত চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়। আগুরীদের ৮৫ শতাংশ বাস করত বর্ধমান জেলায়। ময়রাদের ৫৯ শতাংশ বাস করত বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়া জেলায়। তাম্বুলীদের ৮০ শতাংশ বাস করত যথাক্রমে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলি-হাওড়া জেলায়। বারুইদের ৭৫ শতাংশ বাস করত বর্ধমান, হুগলি-হাওড়া ও চব্বিশ-পরগনায়। বৈদ্যরা সব জেলাতেই বিস্তৃত ছিল, তবে বর্ধমান ও চব্বিশ-পরগনায় বেশি। নাপিতদের ৬৪ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনায়। ভূঁইয়ারা মেদিনীপুরের লোক। কাঁসারীরা চব্বিশ-পরগনা, হুগলি-হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান

ও নদীয়া জেলায় বিস্তৃত ছিল। মেথররা চব্বিশ-পরগনা ও মেদিনীপুরের লোক। শাঁখারীরা বাস করত মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চব্বিশ-পরগনায়, আর চণ্ডালরা চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় (বর্তমানে এরা নমঃশূদ্র নামে পরিচিত)।

এখন দেখা যাক, জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই আটটি জেলায় বিভিন্ন জাতির স্থান কী। প্রতি জেলায় প্রথম পাঁচটি জাতির স্থান নিচের ছকে দেখান হচ্ছে :

স্থান	মে	হু	ব	বাঁ	বী	২৪-প	ন
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩	৩	৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

টীকা—জেলা : মে = মেদিনীপুর ; হু = হুগলি-হাওড়া ; ব = বর্ধমান : বাঁ = বাঁকুড়া ; বী = বীরভূম ; ২৪-প = চব্বিশ-পরগনা ; ন = নদীয়া।

জাতি : ১ = কৈবর্ত ; ২ = সদ্‌গোপ ; ৩ = ব্রাহ্মণ ; ৪ = তাঁতি ; ৫ = বাগদী ; ৬ = গোয়ালা ; ৭ = তিলি ; ৮ = ডোম ; ৯ = বাউরি ; ১০ = চণ্ডাল ; ১১ = চামার ; ১২ = পোদ।

মানবেতর প্রাণিজগতে আমরা ধর্মের কোন বালাই দেখি না। এটা মনুষ্যজগতেরই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে ধর্মের উন্মেষ কি-ভাবে ঘটেছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কিন্তু এ-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখি। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রুথ বেনেডিক্ট্ (**Ruth Benedict**) বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ফ্রানজ বোয়াস্ (**Franz Boas**) সম্পাদিত 'জেনারেল অ্যানথ্রপলজি' বইয়ে নিবদ্ধ তাঁর লিখিত 'রিলিজন' অধ্যায়ের সূচনায় এ-সম্বন্ধে বলেছেন :

"The most diverse origins of religion have been proposed. Herbert Spenser regarded the fundamental datum of religion as respect for the elder generations of one's family, derived all its manifestations from the original ancestor worship. Tylor believed that dreams and visions furnished the experiences from which man organized the concept of his own soul as separate from his body ; this concept man then extended to the whole material universe, arriving at animism or the belief in spirits. This belief in Tylor's formulation, was the inescapable minimum and least common denominator of all religions. Durkheim, on the other hand, believed that religion was the outcome of crowd excitement. Over against the unexciting daily routine which he

regarded as typically pursued by the individual in solitude or in small groups, he saw in group ritual, especially that connected with totemism, the original basis on which all religion has been elaborated. Religion, therefore, he says, is ultimately nothing more than society."

টাইলরের মতবাদের সার্থকতা তো আছেই, তবে বর্তমানে নৃতত্ত্ববিদগণের চিন্তাধারায় ডুরখাইমের মতবাদও প্রাধান্যলাভ করেছে। তাঁর 'সোশ্যাল থিওরি' মতবাদ অনুযায়ী, 'ধর্ম' মানুষের সমাজ-বিন্যাস ও জীবনচর্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বর্তমান আদিবাসীদের সমাজ-বিন্যাস ও জীবনচর্যার দিকে তাকালে আমরা ভারতে প্রাচীন মানবের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে খানিকটা হদিস পাব।

এ-সম্বন্ধে বর্তমান ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে প্রাধান্য পায় ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। সাধারণত আমরা তাদের 'জড়োপাসক' বলি। কিন্তু আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সত্যি তারা 'জড়'-এর উপাসক নয়। 'জড়' বলতে আমরা চেতনাবিহীন ও প্রাণশক্তি-রহিত পদার্থ বুঝি। কিন্তু 'জড়'-এর এ-কল্পনা আদিবাসী সমাজে নেই। প্রতি জিনিসের মধ্যেই তারা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। এ কল্পনার উন্মেষ তাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যখন তারা লক্ষ্য করে যে মানুষ যতদিন জীবিত থাকে ততদিন সে নড়াচড়া ও চলাফেরা করে, কথা বলে, শব্দ করে, কিন্তু মারা যাবার পর তার এসব ক্রিয়া করবার শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা চিন্তা করে যে, যে-পদার্থের মধ্যে নড়ন-চড়ন করবার শক্তি আছে, তার প্রাণও আছে। সেজন্য যখন তারা দেখে যে গাছের পাতা নড়ছে, নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তারা সিদ্ধান্ত করে নেয় যে বৃক্ষ বা

নদীরও প্রাণশক্তি আছে। সুতরাং তাদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ নিছক 'জড়' পদার্থ নয়, তাদেরও প্রাণশক্তি আছে। তারা আরও ভাবে যে মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে সে-সব পদার্থ সংশ্লিষ্ট। তার মানে, মৃতব্যক্তির আত্মা এইসব 'জড়' পদার্থের মধ্যেই আশ্রয় পেয়েছে। এবং যেহেতু তারা এইসব পদার্থের মধ্যে মৃতব্যক্তিকে দেখতে পায় না, সেইহেতু তারা মৃতব্যক্তির আত্মাকে অশরীরী রূপে কল্পনা করে। আত্মার এই অশরীরী রূপ থেকেই তাদের মনে ভূত-প্রেত ইত্যাদির ধারণা এসেছে। সেজন্য আদিবাসী-সমাজে আমরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস খুব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত আমি এমন কোন আদিবাসী মেয়ে বা পুরুষ দেখিনি, যে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরের বাইরে যাবার মত সাহস দেখাত। এসব অশরীরী আত্মা যে তাদেরই বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের, এ বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যখন তারা তাদের সশরীরে তাদের স্বপ্নে আবির্ভূত হতে দেখে। এভাবেই মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও নিজেদের শুভ ও মঙ্গলকামনায় নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই আত্মার সন্তোষবিধান করার প্রথা আদিবাসী-সমাজে উদ্ভূত হয়েছে। এজন্য তারা 'রোজা' বা 'গুনিন' নিযুক্ত করে। নানা নামে তাদের অভিহিত করা হয়, যেমন 'বাইগা', 'বাদওয়া' ইত্যাদি।

আদিবাসী-সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আচরণের আরও একটা রূপ আছে। খাদ্য-আহরণ ও নিজেকে প্রতিরক্ষণ করাই ছিল প্রথম মানবের আদিম সমস্যা। খাদ্য-আহরণের জন্য তাকে যাযাবরের জীবন অনুসরণ করতে হলেও, আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হয়ে তাকে এই দুই কাজ সম্পন্ন করতে হত। এরূপ এক-একটি যূথবদ্ধ দল কোন-না-কোন প্রাণ-বিশিষ্ট 'জড়' পদার্থকে (কেননা তাদের ধারণায় 'জড়'-এরও প্রাণ আছে) নিজ নিজ দলের রক্ষক হিসাবে গণ্য করত। এরূপ প্রাণী বা প্রাণ-

বিশিষ্ট 'জড়' পদার্থকে তারা দলের রক্ষক বা শুভকরী বলে মনে করে। এরূপ প্রাণবিশিষ্ট 'জড়' পদার্থকে তারা 'টোটেম' বলে। এক কথায়, 'টোটেম' দ্বারা তারা দলের রক্ষকস্বরূপ কোন শুভকরী পরমাত্মাকে (যার মধ্যে পূর্বপুরুষের আত্মা অবস্থান করছে) বোঝায়। টোটেমকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করে এবং কখনও তাকে বিনাশ করে না। সে-বৃক্ষের ফল বা সে-প্রাণীর মাংস কখনও ভক্ষণ করে না। প্রতি টোটেম গোষ্ঠীর মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ থাকে, যে ক্রিয়া-কলাপাদির দ্বারা দলের সেই শুভসাধক পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দলের শুভসাধনের জন্য তার প্রসন্নতালাভ করতে পারে। নানা নামে নানাজাতি সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে অভিহিত করে। মধ্যপ্রদেশের কোন-কোন উপজাতি তাকে 'বাইগা' বলে। সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে হিন্দুসমাজের পুরোহিতের বা ওঝা (রোজা) ও গুনিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যিনি দেবদেবী বা অপদেবতাদের প্রসন্ন করতে পারেন।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গান, লোথাল প্রভৃতি সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা যে-সকল 'সীল' বা 'মুদ্রা' পেয়েছি, তার ওপর ক্ষোদিত জন্তুর প্রতিকৃতিসমূহ 'টোটেম' প্রতিকৃতি কিনা তা নিশ্চিত-রূপে বলা কঠিন, তবে সেগুলি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হত, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু থেকে আদিম মানবের আদিম ধর্ম ও ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু সিদ্ধান্ত করা যে মুশকিলের ব্যাপার, তা সহজেই অনুমেয়। তবে বর্তমান কালের আদিবাসীদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও আচরণ থেকে আমরা সে-সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করতে পারি।

এরূপ চিন্তা করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে আদিম মানবের ধর্মীয় জীবনে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বেশি স্থান পেত। আদিম মানব কর্তৃক অনুসৃত এইসকল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ

দু'রকম পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : (ক) 'সদৃশ-বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া' (**mimetic magic**) ও (খ) 'সংস্পর্শ-বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া' (**contagious magic**)। 'সদৃশ-বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া' বলতে বোঝায়, সদৃশ নাটকীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা সদৃশ উদ্দেশ্য-সাধন করা। যেমন কাউকে মারতে হলে, তার একটা মৃন্ময়-পুত্তলিকা তৈরি করে তার বুকে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। যারা এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়, তাদের বিশ্বাস যে এর ফলে শত্রু বিনষ্ট হবে। বর্তমান কালের আদিবাসী-সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনচর্যা পর্যা-লোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে পশুশিকারে সাফল্যের জন্য তারা চিত্রাঙ্কন দ্বারা সদৃশ-বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করত। মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারতের বহু স্থানে শিকারের সাফল্যের জন্য পর্বত-গাত্রে আমরা এরূপ চিত্রাঙ্কন দেখি। আবার দক্ষিণ-ভারতের চেনচু ও সিংহলের ভেদ্দা জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনচর্যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এইসব ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মা সংশ্লিষ্ট। সেজন্য পশুশিকারের সাফল্যের জন্য তারা যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তার দ্বারা তারা তাদের পিতৃপুরুষদের আত্মার তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মার তুষ্টিসাধন থেকেই পরবর্তীকালের লোকায়ত দেবদেবী-সমূহের উদ্ভব ঘটেছিল।

আর 'সংস্পর্শ-বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া' দ্বারা, যার অনিষ্ট করা হয়, তার ব্যবহৃত কোন জিনিস—যেমন শাড়ির আঁচলের একটা কোণ বা শিশুর কাঁথার একটা অংশ এনে, তার ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শিশুর অনিষ্ট করা হয়।

মনে হয় যে, লোকজীবনে আমরা যে-সকল লোকায়ত দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তৎসদৃশ দেবদেবীর উপাসনা অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগেই উদ্ভূত হয়েছিল। অন্তত পণ্ডিতমহলের তাই ধারণা। তাঁরা মনে করেন

যে, যে-সকল পাহাড়ের গুহার মধ্যে অন্তিম প্রস্তোপলীয় যুগের মানুষেরা মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত, সেইসকল গুহার মধ্যেই এইসকল লোকায়ত দেবদেবীর উদ্ভব ঘটেছিল। মধ্যভারতের যে-সব পর্বতগাত্রে আদিম মানবের পশুশিকার সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন আছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডবলিউ. এস. ওয়াকানকার (**V. S. Wakanker**) লিখেছেন : একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে রয়েছে কঙ্কালীদেবীর এক মন্দির। এটা অবস্থিত পাহাড়ের মাথায় এমন এক শিলা-গঠিত ছাউনির মধ্যে, যেখানে আমরা আরও লক্ষ্য করি মৃগশিকারের চিত্রাঙ্কন-সমূহ। তার মানে, এইসব চিত্রাঙ্কন প্রথমে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াতেই ব্যবহৃত হত, পরে সেখানেই উদ্ভূত হয়েছিল কঙ্কালীদেবীর কল্পনা ও আস্তানা। এক কথায়, যে জায়গায় এককালে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয় অনুষ্ঠিত হত, সে-জায়গাই পরবর্তীকালে দেবস্থান হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। মাদ্রাজের সন্নিকটে গুডিয়াম গুহাতেও আমরা অনুরূপ লোকায়ত দেবীর পূজাপীঠ দেখি, এবং সাম্প্রতিককালের উৎখননের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, এখানে মানুষ প্রস্তরযুগ থেকেই বাস করে এসেছে। আবার দেখি, প্রস্তরযুগের মানুষ আয়ুধ-নির্মাণের জন্য যে-সকল জায়গায় কর্মশালা স্থাপন করত, সে-সকল কর্মশালার নিকটেই পরবর্তীকালের ধর্মীয় পীঠস্থানসমূহ গড়ে উঠেছিল। ডি. ডি. কোশাম্বী মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ অনেক ধর্মীয় পীঠস্থানের সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য এ-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না, কেননা, এসকল জায়গায় ধর্মীয় পীঠস্থানসমূহ দৈবক্রমে বা অন্য কোন কারণেও গড়ে উঠতে পারে। তবে যে-সকল জায়গায় এককালে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত, সে-সব জায়গা যে পরবর্তীকালের মানুষের কাছে পবিত্র স্থান হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সেখানে লোকায়ত দেবদেবীসমূহের পীঠস্থান গড়ে উঠবে, তার সপক্ষে খানিকটা যুক্তি আছে, তা অনস্বীকার্য।

নবোপলীয় যুগেই যে প্রথম লিঙ্গপূজা ও মাতৃপূজার সূচনা হয়েছিল, এবং তা কি-ভাবে ঘটেছিল, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে-যুগেও লিঙ্গরূপী কর্ষণ-যষ্টি ও মাতৃরূপী পৃথিবীকে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই উদ্দীপিত করা হত, কৃষির সাফল্যের জন্য। এক কথায়, ভূমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। পরে এই থেকেই শিব-শক্তি পূজা ও তন্ত্রধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। এর সমর্থন আমরা পাই কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত কতকগুলি ইট-বাঁধানো চাতাল থেকে। একটা চাতালের ওপর সারি সারি কতকগুলি গর্ত আছে। গর্তগুলির ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছে কাঠকয়লা। একটি গর্তের ভেতর গবাদি পশু ও হরিণের হাড়ও পাওয়া গিয়েছে। আর এরই কাছে পাওয়া গিয়েছে কূপ ও অগ্নিবেদী। লোথালেও এরূপ অগ্নিবেদী পাওয়া গিয়েছে এবং তার ভস্মাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে গবাদি পশুর দগ্ধ অস্থি, একটি সোনার কণ্ঠ ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ। বোধ হয় এই অগ্নিবেদীসমূহ তান্ত্রিক বা তান্ত্রিকসদৃশ কোন ক্রিয়া-কলাপাদির জন্য ব্যবহৃত হত। কেননা, বর্তমানকালে আমরা তান্ত্রিক-পীঠস্থান বক্রেশ্বরেও অনুরূপ ইটের গাঁথা চাতাল দেখেছি, যে চাতালের ওপর তান্ত্রিকরা তাঁদের সাধনা করতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসী-সমাজেও আমরা কোথাও কোথাও, যেমন মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড ও ওড়িশার কন্দ জাতির মধ্যেও আগুন জ্বেলে ধর্মানুষ্ঠান করতে দেখি এবং সেই আগুনের মধ্যে তারা জীবন্ত পশু নিক্ষেপ করে আহুতি দেয়। এভাবে তারা নরমেধযজ্ঞও করত।

বস্তুত নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম যুগের সন্ধিক্ষণেই আমরা প্রাচীন মানবের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনচর্যার সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে পৌঁছাই। মনে হয়, পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মে যে-সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলি নবোপলীয়-তাম্রাশ্ম যুগের সন্ধিক্ষণেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। এইসকল ধর্মীয়

বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি-সম্পর্কিত অনেক উৎসব—যেমন নবান্ন, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদি, মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত ও পূজা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাউল, দূর্বা, কলা, হরিদ্রা, সুপারি ও পান, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার, শিলা, বৃক্ষ, জন্তু ও লিঙ্গপূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার, গ্রহ-প্রশমনের জন্য তাবিজ বা কবচের ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি সবই আর্যেতর সমাজের ধর্মীয় আচরণের অন্তর্গত ও উত্তরাধিকার। আরও মনে হয় যে শিবের চড়ক ও গাজন, লক্ষ্মীপূজা, লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপকরণ, মনসাপূজা, লিঙ্গরূপী শিবপূজা ও মাতৃদেবীর পূজা ইত্যাদি আমাদের দেশে প্রাগার্যকাল থেকেই চলে এসেছে।

বস্তুত এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে লোকায়ত সমাজের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতির অনেক কিছুই আমরা নবোপলীয় ও তাম্রাশ্মযুগের সন্ধিক্ষণের উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি। আর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া আমরা তৎপূর্ব প্রত্নোপলীয় যুগ থেকেই অনুসরণ করে আসছি। আরও মনে হয় যে নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম যুগদ্বয়ের সন্ধিক্ষণের কৃষ্টির ধারকরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক ছিল। আমাদের এ অনুমান মৃতব্যক্তিকে নানারকমভাবে সমাধিস্থ করার পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত। কেননা; ভিন্ন অঞ্চলে আমরা একই যুগে ভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধিস্থ করার পদ্ধতি দেখি। তার মানে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণের প্রচলন ছিল।

আদিবাসী সমাজের ধর্ম

এবার আমরা আদিবাসী-সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা ওড়িশা ও ছোটনাগপুরের পাহাড়-জঙ্গল-ঘেরা অঞ্চলের অরণ্যবাসী উপজাতিদের মধ্যে যে-সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ এবং পালপরব পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর বৎসর পূর্বে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও লক্ষিত হয়, তা দিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করব। এসকল জাতির মধ্যে ছোটনাগপুরের বির-হড় জাতি অন্যতম। রাঁচী শহরের অধিবাসী প্রয়াত শরৎচন্দ্র রায় বির-হড়দের সম্বন্ধে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন। তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সময়কাল হচ্ছে ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। তার মানে, তাঁর বিবৃত পরিস্থিতিটা হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াশোনা করবার সমসাময়িক কালের। শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার নিজেরও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন রাঁচী শহরে যাই, তখন শরৎ-বাবুর সাহায্যেই বির-হড়দের জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বীর-হড়দের জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি সরল এবং তারা অনিশ্চয়-তার মধ্য দিয়েই তাদের দিনপাত করত। আর্থিক অবস্থা তাদের দীনতার চরম সীমায় ছিল। তারা চাষবাস কিছুই জানত না। বন্য ফল-মূল ও শিকারই তাদের খাদ্য আহরণের একমাত্র উপায় ছিল। আর তাদের উপজীবিকার অন্য সূত্র ছিল দড়ি দিয়ে জাল তৈরি করা। বানরের মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য, সেজন্য দল বেঁধে তারা বানর-শিকারে বেরোত। শিকার-লব্ধ বানরটিকে উৎসর্গ করবার পর ঝলসে মেরে ফেলে দলের সকলে ভাগ করে নিত।

তারা বিশ্বাস করত যে তাদের প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মাসমূহ সর্বত্রই বিরাজ করছে এবং তাদের মঙ্গলসাধনের জন্য নিয়ত সচেষ্ট আছে। সেজন্য প্রতি গ্রামেই তারা একখানা কুঁড়েঘর তাদের প্রয়াত পূর্বপুরুষদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। প্রতিদিন যখনই তারা আহারে বসে, কিংবা মদ্যপানে রত হয় বা চর্বণের জন্য তামাকের সঙ্গে চুন মিশ্রিত করে, তখনই তারা তার কিছু অংশ প্রথমেই প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে।

বির-হড়দের বিশ্বাস 'লুগু' বা 'রাঙা বুড়ু' (মানে, লাল পাহাড়) থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম এসেছিল। সেজন্য বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে তারা লুগু বা রাঙা বড়র দিকে মুখ করে তাদের সেই সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করে। এছাড়া বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে তারা প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে খাদ্যাদিও নিবেদন করে। প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মা ছাড়া বির-হড়দের অনেক দেবতাও আছে, যেমন ব্যাঘ্র-দেবতা, নেকড়ে-দেবতা, বানর-দেবতা ইত্যাদি। এছাড়া, হিন্দুদের মত তারা দেবীমাই, কালীমাই প্রভৃতিকেও শ্রদ্ধা করে এবং তাদের উদ্দেশেও খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে। তবে এসব ধর্মাচরণ পালনের জন্য তাদের নিজেদেরই পুরোহিত বা যাজক আছে। দলের মাতব্বররাই তাদের পুরোহিত বা যাজক। পুরোহিতকে তারা 'নায়া' (এ-থেকেই কি 'নায়েক' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে ?) বলে। 'নায়া'কে অনেক কর্ম ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শিকার সংক্রান্ত কর্ম ও অনুষ্ঠানসমূহে 'নায়া'ই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 'রোজা' বা গুনিনের (যারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে) শক্তিতে বির-হড়রা বিশ্বাস করে। বস্তুত বির-হড়দের চিন্তায় তারা শক্তিধর ব্যক্তি। সেজন্য যখনই বির-হড় জাতির কেউ অনিশ্চয়তাজনিত কোন বিপদের মধ্যে পড়ে, তখনই নিরাপত্তা ও আশ্বাসের জন্য তারা গুনিনের শরণাপন্ন হয়। সাই-

বেরিয়ায় তাদের 'শামন' (Shaman) বলা হয়। নৃবিজ্ঞানীরা এই শব্দটাই গ্রহণ করেছেন। তবে আমাদের দেশের উপজাতিসমাজে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা পরিচিত শব্দ 'রোজা' (ওঝা) বা গুনিন ব্যবহার করছি। ('জঙ্গল-জীবক' শব্দটা প্রচলন করা যেতে পারে কিনা, তা বিবেচ্য)। বস্তুত এদের ধর্মীয় জীবনে পুরোহিতের যে ভূমিকা, যাদুকরেরও তাই। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বা অদৃষ্টবিপাকে পড়লে, যাদুকরই তার ভরসা। যাদু-করের ওপর 'ভর' হয় এবং সেই 'ভর' অবস্থায় সে নাম করে কোন্ দুষ্ট-শক্তি বা আত্মা তার জন্য দায়ী, এবং সেই দুষ্ট-শক্তির অশুভত্ব কাটাবার জন্য বা তাকে প্রশমন করবার জন্য কী করণীয় তা-ও সে বাতলে দেয়।

সঙ্গতির দিক দিয়ে বির-হড়দের চেয়ে অনেক উন্নত সম্প্রদায়ের উপজাতি হচ্ছে ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী জুয়াঙরা। জুয়াঙদের মধ্যে চাষবাসের প্রচলন আছে, তবে তা 'ঝুম' পদ্ধতিতে। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ই. টি. ডালটন (E. T. Dalton) এদের সম্বন্ধে যখন নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন, তখন জুয়াঙ মেয়েরা প্রায় নগ্ন অবস্থাতেই থাকত। কোমরে লতা-বাঁধা এক দুনশি থেকে একখণ্ড পাতা সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েই তারা লজ্জা নিবারণ করত। ছবিতে আমরা তাই দেখি। ছবিটা আছে ডালটনের 'এথনোলজি অভ্ বেঙ্গল' বইয়ের প্রথম সংস্করণে। ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু যখন পাল লহাড়া রাজ্যের (এখন ঢেনকানাল জেলার অন্তর্ভুক্ত) কণ্টাল। গ্রামের জুয়াঙদের মধ্যে গিয়ে কিছুদিন বাস করেছিলেন, তখন তিনি মাত্র দুজন প্রাচীনা স্ত্রীলোককেই ওইরূপ পর্ণবসনা অবস্থায় দেখে-ছিলেন। বাকী জুয়াঙ মেয়েরা তখন হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড় পরতে আরম্ভ করেছিল। আবার পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অজিতকিশোর রায়, শরদিন্দু বসু ও চার্লস ম্যাকডুগাল যখন জুয়াঙদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক

সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তখন তাঁরা একজনও পর্ণবসনা জুয়াঙ মেয়েকে দেখতে পাননি।

জুয়াঙদের বিশ্বাস যে, কেওনঝরের হোণ্ডা গ্রামের কাছে গোন-নসিকা পাহাড় থেকে যেখানে বৈতরণী নদী উৎপন্ন হয়েছে, সেখানেই অতি প্রাচীনকালে মাটি থেকে জুয়াঙ জাতির প্রথম উদ্ভব হয়। জুয়াঙদের ভাষায় 'জুয়াঙ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মানুষ'। তারা গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে বলে তাদের পত্রশবর বলা হয়। (তুলনা করুন দেবীর এক নাম 'পর্ণশবরী')।

জুয়াঙরা এখন কেওনঝর ও ঢেনকানাল জেলার অধিবাসী। জুয়াঙরা গ্রামের মাতব্বরকে বলে 'প্রধান', আর পুরোহিতকে বলে 'বৈতা', 'নগম' বা 'নিগম'। জুয়াঙদের প্রধান দেব-দেবী হচ্ছে 'বুড়াম-বুড়া' ও 'বুড়াম-বুড়ী'। কিন্তু বির-হড়দের মত জুয়াঙরাও হিন্দু-সমাজের সংস্পর্শে এসে অনেক হিন্দু দেব-দেবী গ্রহণ করেছে। এটা আমরা, নির্মলবাবু যখন পাল লহড়ার কুন্তলা গ্রামে প্রথম যান, তখন তার উদ্দেশ্যে জুয়াঙরা যে পূজা করেছিল, তার বিবরণ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি। এ সম্বন্ধে নির্মলবাবু লিখছেন—'গ্রামদেবতার পূজার জন্য যে ব্যক্তির উপরে ভার দেওয়া হইয়াছিল সে কণ্টলা গ্রামের মাতব্বর। তাহার নাম মানি…যেদিন আমার জন্য পূজা দেওয়া স্থির হইয়াছিল সেদিন মানি উপবাস করিয়া রহিল। পূজার জন্য জিনিসপত্রের জোগাড় শেষ হইলে নদীতে স্নানের পর ধোয়া কাপড় পরিয়া সে মজাঙের (যেখানে রাত্রে যুবকেরা শোয় ও দিনের বেলা পুরুষেরা বাঁশের কাজ করে ও গল্পগুজব করে) সম্মুখে দুইটি ছোট কাল রঙের মোরগ, প্রায় এক সের ভিজা আলোচাল, একটি টাঙ্গি, আগুন ও ধুনা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে শালপাতা দিয়া ঠোঙা তৈয়ারি করিয়া তাহাতে তেল ও সলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালা হইল। মজাঙের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া মানি বলিতে

লাগিল, 'সত্যা জেমতো মাসিকে তলে বাহ্বাসিন, উপরে ধর্মদেবতা বাবুরে আইঙ ডাগাতাইঙ্গে সামুইসেরে। বেগাবেগি মোরনে ঠাররে।' মানে, 'তলে বসুন্ধরা, উপরে ধর্মদেবতা, তোমরা যেমন সত্য, (তোমাদের দোহাই দিয়া বলিতেছি) বাবুকে আমাদের ভাষা দান কর। শীঘ্র (আমাদের) ঠার (তাঁহার নিকটে) আনিয়া দাও।' অতি সহজ সরল ভাষা, বলিবার কথাও সোজা; কোন মন্ত্রের বালাই নাই। নিত্যকার কথাবার্তার ভাষায় দেবতাকে স্বীয় প্রয়োজন জানাইয়া জুয়াঙেরা পূজা করে, প্রার্থনা জানায়।

'ইহার পর মানি গোবর দিয়া লেপা মাটির উপরে প্রথমে হলুদের গুঁড়া দিয়া তিনটি দাগ কাটিল এবং সেই দাগের উপরে আলোচালের নয়টি পিণ্ড দিল। প্রত্যেক পিণ্ড দিবার সময়ে একজন দেবতার নামে তাহা উৎসর্গ করিতে লাগিল। সেই সময়ে মানি বলিতে লাগিল, 'গলা বুঢ়ামবুঢ়ী পাইসেনা। বুঢ়ামবুঢ়া পাইসেনা মডে। তলে বাহ্বা-সিন্দরি আমডে পাইসেনা। উপরে ধর্মদেবতা আমডে পাইসেনা। গলা পিতাসনি আমডে পায়েনা। পত্রশঅরনি আমডে পায়েনা। লক্ষ্মীদেবতা আমডে পায়েনা। জেতেকে বুঢ়ারিকি গলা বাবুকে ঠাররে। মেডেঞ্চেনাতে আফে পায়সেনায়েতে।' মানে, 'আচ্ছা বুঢ়াম-বুঢ়ী তুমি নাও। বুঢ়ামবুঢ়া তুমি নাও। ঋষিপত্নী, তুমি নাও। তলে বসুন্ধরা, তুমি নাও। উপরে ধর্মদেবতা তুমি নাও। আচ্ছা পিতাসনি (=পেত্না), তুমি নাও। পত্রশবরী, তুমি নাও। লক্ষ্মীদেবতা, তুমি নাও। (বাকি) যত বুঢ়ারা (=ঠাকুরদেবতা) আছ, আচ্ছা, বাবুকে আমাদের ভাষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরাও নাও।'

'আলোচালের পিণ্ড নিবেদন করিবার পর কালো মোরগ দুটিকে সেইখানে একে একে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা স্বেচ্ছায় যখন পিণ্ডের চাল খুঁটিয়া খাইতে লাগিল তখন বুঝা গেল যে, দেবতারা নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তখন টাঙ্গিখানিকে মাটির উপরে

চাপিয়া ধরিয়া মানি বঁটিতে কুটনো কোটার মত মোরগ দুইটির গলা কাটিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু তপ্ত রক্ত আলোচালের উপরে এবং কিছু মজাঙ্গের চাঙ্গুগুলির উপর ছড়াইয়া দিল। এইরূপে পূজা শেষ হইবার পর গ্রামে সকলে মিলিয়া এক টাকায় খরিদ করা চাল রান্না করিয়া ভোজের ব্যবস্থায় মন দিল।'

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, জুয়াঙ পল্লীতে অনুষ্ঠানটির মধ্যে স্নান ও উপবাস, ধুনা জ্বালার ব্যবস্থা, হলুদ, আলোচাল প্রভৃতির ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবতা, ঋষিপত্নী প্রভৃতির নামগ্রহণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যের পরিচয় দেয়। আবার পুরোহিত শ্রেণীর অভাব, বিশিষ্ট মন্ত্রের অভাব, মোরগ বলি দেওয়া, বুড়ামবুড়ী প্রভৃতি দেবতার পূজা লৌকিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য দেয়।

জুয়াঙদের চেয়ে আরও উন্নত মানের উপজাতি হচ্ছে গঞ্জাম ও কোরাপুট জেলার শবররা। তারা লাঙলের সাহায্যে স্থায়ী চাষবাস করে। শবররা প্রেতাত্মায় খুব বেশি বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস দৃষ্টির অগোচরে সমগ্র জগৎই প্রেতাত্মার দ্বারা অধ্যুষিত। শবরদের ধারণা অনুযায়ী প্রেতাত্মাসমূহ দু'রকমের। একরকম প্রেতাত্মা শুভ-সাধক। আর, আরেকরকম প্রেতাত্মা অমঙ্গলকারক। এই শেষোক্ত ধরনের প্রেতাত্মারা সবসময়েই সুযোগ খোঁজে মানুষের অসুখ-বিসুখ করাবার জন্য, তাকে বিপদে ফেলবার জন্য, তার নানারকম অমঙ্গল করবার জন্য। আবার তাদের কারসাজিতেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাদের অপচেষ্টাতেই মাঠে ফসল নষ্ট হয়, বা ফসল হয়ই না।

যে-সকল অপদেবতা বা দুষ্ট প্রেতাত্মা তাদের অসুখ-বিসুখ ঘটায়, তাদের বিপদে ফেলে বা তাদের অমঙ্গল করে, তাদের মাঠে ফসল হতে দেয় না বা নষ্ট করে, তাদের তারা বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করে। যে-সব অসুখ-বিসুখে বা জ্বরে মানুষের তিন-চারদিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে, সেই ঘটনাকারী অপদেবতাকে তারা বলে 'জলিয়া'। তাকে

প্রসন্ন করবার জন্য তারা তাকে পাকা আম বা কাঁচা আমের অম্বল বা ছাগবলি নিবেদন করে। এছাড়া, তার উদ্দেশ্যে তারা মদ্যপান করে ও নাচগান করে।

'রথু' নামক অপদেবতার কুদৃষ্টি বা 'নজর' লাগার জন্যই তাদের ঘাড়ে বেদনা বা যন্ত্রণা হয়। শিশুর প্রসবের জন্য যে-অপদেবতার প্রসন্নতার প্রয়োজন হয়, তাকে তারা 'লঙ্কন' বা 'আউঙগাঙ লঙ্কন' বা 'আউঙগাঙ' বলে। অপদেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট ও ভীষণ অনিষ্ট-কারী হচ্ছে 'কান্নি'। বড় বড় গাছই হচ্ছে 'কান্নি'র আশ্রয়স্থল। সে-জন্য সেসব গাছ শবররা কখনও কাটে না। তার নিকটস্থ ঝোপ-জঙ্গলেও তারা যায় না। এরকম অসংখ্য অপদেবতা শবরদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাদের সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এ-সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা ভেরিয়ার এলউইন (Verrier Elwin) রচিত 'ভারতের এক উপজাতির ধর্ম' (The Religion of an Indian Tribe) নামের বইখানা পড়ে নিতে পারেন। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই বৃহৎ বইখানা একমাত্র শবর জাতির ধর্ম নিয়েই আলোচনা। সুতরাং আমরা এই অধ্যায়ে উপজাতিদের ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ নিয়ে যে আলোচনা করছি তা সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুমাত্র। বস্তুত উপজাতিদের ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে বহু বৎসরের অধ্যবসায় ও অনুশীলনের প্রয়োজন। এখানে আমরা মাত্র একটা রূপরেখাই টানছি।

ভারতের অন্যান্য উপজাতিদের মত শবররাও তাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর অপদেবতার প্রভাবে বিশ্বাস করে বলে, শবর সমাজে 'রোজা' বা 'গুনিন'-এর শক্তির ওপর নির্ভরতা খুব বেশি। সেই সুযোগে গুনিনরা মোটা টাকা উপার্জন করে। ভেরিয়ার এলউইন যে-সময়ে সমীক্ষা (১৯৪৯-৫০) করেছিলেন সে-সময়ে তিনি এক একজন গুনিনকে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা অর্জন করতে দেখেছিলেন। মাত্র পুরুষ মানুষই

যে গুনিন হয়, তা নয়। মেয়েছেলে গুনিনও আছে। শবরদের মধ্যে এই উভয় লিঙ্গের গুনিনের সংখ্যা প্রচুর। তবে যে-কোন লোক ইচ্ছা করলেই গুনিন হতে পারে না। অশরীরী আত্মা বা অপদেবতারাই তাদের খুঁজে বের করে এবং তখন যদি তারা গুনিন হতে অস্বীকৃত হয় তখন ওই অশরীরী আত্মা বা অপদেবতা তাদের ব্যাধি-বা-বিপদ্‌গ্রস্ত করে শাস্তি দেয়। কারো ওপর ওইসব অপদেবতা 'ভর' হয়ে ওইরূপ নির্দেশ দেয়। ব্যাধি-বা-বিপদ্‌গ্রস্ত হবার ভয়ে, তখন ওই ব্যক্তির 'গুনিন' হওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না। এসম্পর্কে যেটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার তা হচ্ছে ওই অপদেবতা গুনিনের সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করে, এবং এরূপ অবস্থায় তাদের সঙ্গে যৌনমিলনে আবদ্ধ হয়ে পুত্র-কন্যাও উৎপাদন করে, যদিও সে-সকল পুত্র-কন্যা অগোচরীভূত জগতে বাস করে।

প্রত্যেক গুনিনকে শুদ্ধাচারী জীবনযাপন করতে হয়, এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ডাক পড়লেই সেখানে গিয়ে হাজির হবার জন্য তাদের নিজেদের উৎসর্গ করতে হয়। তার মানে, কেউ একবার গুনিন হবার আদেশ পেলে, তাকে মাত্র যে সেই অপদেবতার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হয় তা নয়, নিজ প্রতিবেশীদের মঙ্গলার্থেও নিজেকে নিবেদিত করতে হয়। এক কথায়, গুনিনের কর্তব্য-কর্ম হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজে সে একটা বিশেষ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'In this manner, Savara society becomes divided into a kind of moral elite and laymen ; a fact which tends to raise the general level of the people as a whole '

সংস্কৃত সাহিত্যে 'শবর'দের অনেক উল্লেখ আছে। তবে মনে হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যে গঙ্গা উপত্যকার দক্ষিণস্থ সমস্ত আদিবাসীদেরই 'শবর' নামে অভিহিত করা হত। তবে ওড়িশার 'শবর' ও হিন্দু

অধিবাসীরাই পরস্পরের ঐতিহ্যের দ্বারা বেশি পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা বিশেষ করে ঘটেছে মহানদী উপত্যকায় ও ছত্রিশগড়ের মালভূমি অঞ্চলে। কথিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বসু নামে এক সাধুসুলভ শবরের কথা শুনে তার পূজিত দেবতাকে নিজে পূজা করবার মানস করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্যা নামে এক ব্রাহ্মণকে বসুর নিকট পাঠিয়ে দেন। বিদ্যা কৌশল অবলম্বন করে জানতে পারে যে বসু শবর এক নীলরঙের পাথরকে (নীলা?) দেবতারূপে পূজা করে। তার পূজার স্থলও সে আবিষ্কার করে। ইত্যবসরে ওই ব্রাহ্মণ বসু শবরের মেয়েকে বিয়ে করে ও তার পূজিত নীলপাথরটি চুরি করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে নিয়ে যাবার মতলব করে। কিন্তু চুরি করতে গিয়ে দ্যাখে যে পাথরটি সেখানে নেই এবং অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ওদিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আকাশবাণীতে শোনেন যে নদী দিয়ে একখণ্ড কাঠ ভেসে যাবে এবং তিনি যেন ওই কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করেন। রাজা ওই কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করে এক দেবশিল্পীর সাহায্যে ওই কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনমূর্তি ও বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র তৈরি করান। এক মন্দির নির্মাণ করিয়ে সেখানেই তিনি ওই বিগ্রহদের স্থাপন করেন। এভাবেই জগন্নাথের মন্দিরের উদ্ভব ঘটে। বিদ্যা ব্রাহ্মণের ঔরসে তার শবরপত্নীর গর্ভসম্ভূত সন্ততিদের বংশধররাই জগন্নাথ মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত হয়। তাদেরই একমাত্র অধিকার আছে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে বিগ্রহদের স্পর্শ করবার এবং যথাযথ স্থানে নিয়ে গিয়ে উপবিষ্ট করাবার। স্নানযাত্রার পর বিগ্রহদের যখন পুনরায় রং-করবার প্রয়োজন হয়, সে রং-করবার অধিকারও তাদের।

এখানে উল্লেখনীয় যে বিলাসপুর জেলায় শবরী-নারায়ণ দেবতার এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে এবং সেটাই নাকি বসু-শবর কর্তৃক পূজিত দেবতার আদি লীলাকেন্দ্র। আবার মহানদীর তীরে বৈদ্যেশ্বর

নামক স্থানের বিপরীত দিকে বরাম্বায় অবস্থিত এক মন্দিরও ঠিক অনুরূপ দাবি করে। সে যাই হোক, যা লক্ষণীয় ব্যাপার তা হচ্ছে কটকের পশ্চিমে মহানদীর সমগ্র তীরভাগস্থ অঞ্চলে অনেকগুলি শিব-মন্দির আছে, সেগুলির পুরোহিতগণ হচ্ছেন শূদ্রকুলোদ্ভব এবং ব্রাহ্মণ-রাও সেইসকল শূদ্র-পুরোহিতকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। এসব দেখে মনে হয় যে, যুগ যুগ ধরে হিন্দু ও শবররা পরস্পরের সংস্পর্শে এসে, পরস্পর পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির উপাদানসমূহ গ্রহণ করেছে। সেজন্যই আমরা হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন সব উপাদানের সন্ধান পাই, যা অবিসংবাদিতরূপে আদিবাসীদের নিকট থেকে হিন্দু জনসমাজ গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে ওড়িশা ও মধ্যভারতের আদি-বাসী-সমাজও প্রতিবেশী হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক স্থলে তাদের ধর্মীয় জীবনচর্যার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু তা বলে তাদের 'হিন্দু' বলা সংগত নয়। এ-সম্বন্ধে জে. এইচ. হাটনের (J. H. Hutton) মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসীসমূহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ না করে ও গরুকে পবিত্র জীব বলে মনে না করে এবং হিন্দু মন্দিরে হিন্দুবিগ্রহের পূজার্চনা না করে ততক্ষণ তাদের 'হিন্দু' বলে অভিহিত করা সংগত নয়।' তবে এ-সম্বন্ধে হিন্দুরা অনেক উদার। তারা কঠোর নয় বলে, আদিবাসী-সমাজের অনেক ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার ও অনুষ্ঠান অতি সহজেই হিন্দুধর্ম ও জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

ভীলদের (আবু পাহাড় ও আসিরগড়ের মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসী) প্রধান দেবতা ভগদেও; তবে এরা হিন্দুদের কোন কোন দেবদেবীকেও পূজা করে, কিন্তু এরা হিন্দু নয়। এরা অত্যন্ত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভূতপ্রেত, অপদেবতা ও অশরীরী আত্মাতে বিশ্বাস করে। এসব ভূতপ্রেত ও অপদেবতাদের প্রভাব এড়াবার জন্য তারা রোজা বা গুনিন নিযুক্ত করে। এসকল রোজাদের

তারা 'বাদওয়া' (badwa) নামে অভিহিত করে। যখনই কেউ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখনই বাদওয়াকে ডাকা হয়। 'ভর'-এর মুখে বাদওয়া গ্রামের কোন হতভাগ্য বুড়ীকে ডাইনী বলে ঘোষণা করে। তাকেই ওই অসুখের কারণ হিসাবে অভিযুক্ত করে। বুড়ীকে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে ডুবে না যায়, বা তার চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেখা যায় তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, তাহলে সে ডাইনী নয় সাব্যস্ত হয়। আর যদি সে ডাইনী বলে প্রমাণিত হয় তখন সমবেত লোক তার পিছনে 'ভূত ভূত, ডাইনী' বলে চিৎকার করতে করতে তাকে গ্রামের সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে দেয়। ভীলরা যখন দিব্যি গালে, তখন কুকুরের গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালে।

ওরাঁওরা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। রাঁচী থেকে পশ্চিমে লোহারডাগা পর্যন্ত ওরাঁওদের গ্রামসকল বিস্তৃত। তারা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত। তবে অন্যান্য উপজাতিদের মত তারা প্রতিবেশী হিন্দুদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত। এ সম্পর্কে কিছুকাল আগে তারা টানা-ভগৎ নামে এক আন্দোলন করেছিল। তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। গ্রামের প্রধানকে তারা 'মাহাতো' বলে। তারা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার্চনাও করে এবং অশরীরী আত্মা ও অপদেবতাতেও বিশ্বাস রাখে। গ্রামদেবতার পুজা এবং ভূতপ্রেত ও অপদেবতাদের শান্ত করবার জন্য তাদের 'পাহান' বা 'বাইগা' আছে। ওরাঁও সমাজে 'পাহান'-এর পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল। কেননা, ওরাঁওরা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা না করে কোন বৈষয়িক ও ধর্মীয় কর্ম শুরু করে না, এবং সেই পূজায় পাহানই পৌরোহিত্য করে। প্রতি তিনবৎসর অন্তর পাহান পরিবর্তিত হয় এবং যদিও কুলার সাহায্যে গণনা দ্বারা এই পরিবর্তন সাধন করা হয়, তা হলেও প্রায়ই দেখা যায় যে একই পরিবারের লোক বংশানুক্রমে

এই পদের অধিকারী হয়। আবার অনেক ওরাঁও গ্রামে একই ব্যক্তিকে মাহাতো ও পাহান পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। তাদের সহকারীদের নাম 'পূজার' বা 'পানভরা'। তাদের প্রধান গ্রামদেবী হচ্ছে 'সরনবুড়িয়া'। এছাড়া, তারা চণ্ডী, মহাদানিয়া প্রভৃতিরও পূজা করে। মহাদানিয়ার কাছে আগে নরবলি হত। এখন তার পরিবর্তে মহিষ বলি হয়। তাদের মধ্যে যারা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত, তারা একদিকে যেমন গির্জায় যায়, উপাসনা করে, এবং গির্জাতেই বিবাহাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করে, অন্যদিকে তারা তেমনই উপজাতি-লোকাচারসমূহও পালন করে। এটা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, গির্জায় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদনের পর (এই বইয়ের 'বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান' সম্পর্কিত অধ্যায় দ্রঃ)।

মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি হচ্ছে গোণ্ড। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে তারাই হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে বস্তার জেলায়। তবে সাতপুরা মালভূমির পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে ছিন্দওয়ারা, বেতুল, সিওনি এবং মাণ্ডলা জেলাতেও গোণ্ডরা বাস করে। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গেও গোণ্ডরা ছড়িয়ে আছে। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে এরাই হচ্ছে বেশি পরিমাণে হিন্দু-ঘেঁষা। গ্রামের মাতব্বরকে তারা 'মুকদ্দম' বলে, আর পুরোহিতকে বলে 'পাণ্ডা'। এ-দুটোই স্বতন্ত্র পদ। তবে অনেক গ্রামে একই ব্যক্তি 'মুকদ্দম' ও 'পাণ্ডা'র পদ অধিকার করে। 'মুকদ্দম' ও 'পাণ্ডা' ছাড়া, তাদের মধ্যে গুনিন বা ওঝাও আছে। গুনিনের নাম 'বাইগা'। বাইগারাই হচ্ছে 'জঙ্গল-জীবক'। অসুখ-বিসুখে তারাই ঝাড়ফুঁক ও তুক্‌তাক্ করে চিকিৎসা করে।

যদিও গোণ্ডরা হিন্দু-ঘেঁষা, তা হলেও হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তারা সাহায্য নেয় না। নিজেদের 'পাণ্ডা'দের দিয়েই তারা পূজা-অর্চনা করায়। তবে দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। গোণ্ডদের

কোন কোন গ্রামে 'ছুদার পেঙ্ক' নামে গৃহদেবতা আছে। পরিবারের কোন এক ঘরে এক মাটির পাত্রে 'ছুদার পেঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত থাকে। এছাড়া প্রতি গ্রামে পবিত্র 'সাজা' গাছের তলায় গ্রামদেবতা আছে। এসব গ্রামদেবতাদের তারা 'পেঙ্ক-রা' বলে। আবার অনেকসময় তারা নুড়িতে সিঁদুর মাখিয়ে 'মহাদেও' ও 'নারায়ণ দেও' নামে পূজা করে। এক কথায়, গোণ্ডদের ধর্মমত খুব স্পষ্ট নয়। অঞ্চলভেদেও তাদের স্বতন্ত্র দেবতা আছে। যেমন, চাণ্ডা জেলাতে 'ছুদার পেঙ্ক' দেবতার পূজার প্রচলন আছে, কিন্তু বস্তার জেলায় নেই। সেখানকার তিনটি প্রধান দেবতা হচ্ছে ধরিত্রী-দেবতা বা 'ভূম', গোত্রদেবতা বা 'পেন' ও গ্রাম-মাতৃকা। গোণ্ডরা নিজেদের 'ভূম' বা ধারত্রীর সন্তান বলে মনে করে। প্রতি গ্রামে গাছতলায় গোত্রদেবতা ('পেন') ও গ্রামমাতৃকার পূজা হয়। এর জন্য কোন প্রতিমার প্রয়োজন হয় না। একখণ্ড পাথর কিংবা পাথরের স্তূপকেই তারা দেবতার প্রতীক হিসাবে মনে করে। বাইসন-শৃঙ্গ গোণ্ডরা (নাচগানের সময় ময়ূরের পালক-সজ্জিত বাইসন-শৃঙ্গ পরে বলে এদের এরূপ বলা হয়) 'ভূম'-দেবতাকে 'পেরমা' বলে অভিহিত করে। অনেকসময় 'ভূম'-দেবতা, গোত্রদেবতা ও গ্রাম-দেবতা একত্রীভূত হয়ে যায়। মারিয়া গোণ্ডরা 'ভূম'কে প্রকৃতি ও গোত্রদেবতাকে পুরুষশক্তির প্রকাশ বলে মনে করে। তাদের চিন্তায় এ-দুজনের আশীর্বাদেই তাদের জীবনপ্রবাহ ও ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। গোত্রদেবতার পূজারীকে তারা 'ওয়াদ্দাই' বা 'মহুল ওয়াদ্দাই' বলে। কতকগুলো কাঠ একখণ্ড বাঁশ বা সাজা গাছের সঙ্গে বেঁধে গোত্রদেবতার প্রতীক তৈরি করা হয় এবং ময়ূরের পালক দিয়ে সেটাকে সাজানো হয়। ঠিক এরকমভাবেই তারা 'অপদেও', 'পটদেও' ইত্যাদির প্রতীক তৈরি করে।

আসামের উপজাতিরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক; তাদের ধর্মবিশ্বাস বোঝাবার জন্য আমি এখানে খাসিদের দৃষ্টান্ত দেব: ভারতের অন্যান্য

উপজাতিদের মত খাসিয়ারাও এক পরম সৃষ্টিকর্তা, পিতৃপুরুষের আত্মা, ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। পিতৃপুরুষদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভূতপ্রেতের অশুভ প্রভাব ব্যাহত করবার জন্যও অভিচার প্রক্রিয়াদির আশ্রয় নেয়। এছাড়া নানা দেবদেবীরও পূজার্চনা করে। সর্পদেবতারও পূজা করে। তবে তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন নেই। সর্বোপরি, পূজার্চনার জন্য তাদের কোন পুরোহিত নেই। মেয়েরাই পূজার্চনা সম্পাদন করে।

উপজাতিদের মধ্যে ডাইনীতে বিশ্বাস খুব প্রবল। কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ হলে, তারা তার প্রাণান্ত ঘটায়। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে সাঁওতাল সমাজে এক ব্যক্তি নিজ শ্যালিকাকেই ডাইনী বলে সন্দেহ করে তার প্রাণান্ত ঘটিয়েছে।

উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভূতপ্রেত ও অশুভ অশরীরী শক্তিতে বিশ্বাস থাকার দরুন, হয়তো অনেকে ভাববেন যে তারা সদা-সর্বদা ভূতপ্রেতের ভয়েতেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তা মোটেই নয়। তাদের জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে তাদের জীবন মোটেই বিষাদময় নয়। তারা বেশ আমোদপ্রিয় ও দিনের কর্মশেষে রাত্রে নাচগানে মত্ত থাকে। তাদের নানারকম পরব ও উৎসব-অনুষ্ঠানও আছে। বসন্তকালে অনুষ্ঠিত 'সরহুল পরব' তার অন্যতম। এটা হচ্ছে প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানানোর উৎসব। বিহারের অরণ্য-পর্বত অঞ্চলে, ছোটনাগপুরে ও সাঁওতাল পরগনায় এই উৎসব পালিত হয়। চৈত্রমাসে দোলপূর্ণিমার পর যে শুক্লপক্ষ আসে সে-সময়ে আদিবাসী সমাজে মহাসমারোহের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়। অবশ্য সব অঞ্চলে এই উৎসব 'সরহুল' নামে আখ্যাত নয়। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। মুণ্ডা, অসুর ও সাঁওতালরা সরহুলকে 'বা' বা 'বাহা' বলে। ওরাঁওরা একে বলে 'খদ্দী'। রাঁচী জেলায় গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত 'মাণ্ডা পরব'ও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এই পরবে মাত্র মুণ্ডা বা

ওরাঁওরা নয়, অপর নানা জাতিও যোগ দেয়। এ-সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসু বলেছেন—'টাংরাটোলি নামক এক গ্রামে লোহার আহির এবং মৃধা অর্থাৎ ডোমজাতীয় ব্যক্তিকেও মাণ্ডা পরবে যোগ দিতে দেখিয়াছি।' রাঁচী শহরের পার্শ্ববর্তী মোরহাবাদি, টাংরাটোলি এবং দূরবর্তী অনেক গ্রামেই বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে মাণ্ডা পরব অনুষ্ঠিত হয়। এটা বাঙলাদেশের গাজন বা চড়ক উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা মাণ্ডা পরবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, তারা পরবের আগে কয়েকদিন যাবৎ সাত্ত্বিকভাবে ও শুদ্ধাচারে আহার-বিহার করে ও মহাদেবের আস্থানে নানাবিধ পূজার অনুষ্ঠান করে। যে-সকল ব্যক্তি ভোক্তা বা গাজনের সন্ন্যাসী হয়, তাদের মধ্যে কারো-কারোর ওপরে মহাদেবের 'ভর' হয়। কোন কোন স্থলে 'ভর' অবস্থায় ভোক্তা প্রত্যাদেশ পায়। এছাড়া বাঙলার গাজন উৎসবের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে ; যেমন—মুখোশ পরে তারা নাচে, জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, এবং শেষদিনে চড়কগাছে ঘোরে।

ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মৃতের সংকার। মৃতের সংকার সম্বন্ধে উপজাতি সমাজে সমাধি দেওয়া ও মৃতকে দাহ করা, এই উভয় পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। ভীলজাতির মধ্যে এই উভয় পদ্ধতিই আছে। তাদের মধ্যে মৃতকে সাধারণত দাহ করা হয়। তবে সমাধি অনুসৃত হয় মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা শিশুর দন্তোদ্গম হবার পূর্বে, কিংবা যদি কোন লোক কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগে মারা যায় বা আত্মহত্যা করে। এসব ক্ষেত্রে মৃতকে উত্তর-দক্ষিণ (পা-টা দক্ষিণদিকে থাকে) অবস্থায় শয়ন করিয়ে সমাধি দেওয়া হয়। সাধুসন্তদের কিন্তু শয়ন করিয়ে সমাধি দেওয়া হয় না। তাদের সমাধি দেওয়া হয় উপবিষ্ট অবস্থায়। ভীলদের মৃত-ব্যক্তিকে উত্তর-দক্ষিণ অবস্থাতেই বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে প্রথমে একটা 'বের' (কুল) গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। তারপর শববাহকরা পাথর সংগ্রহ করে গাদা করে। মৃতব্যক্তির পরিহিত বসন

থেকে একটুকরো কাপড় কেটে নিয়ে, 'বের' গাছের ওপর স্থাপন করে। মৃতব্যক্তিকে মাটির কলসী করে জল এনে স্নান করানো হয় এবং গাছতলায় যে পাথরের গাদা করা হয়েছে, তার ওপর কলসীটা ভেঙে ফেলা হয়। মৃতব্যক্তিকে তার তীর-ধনুক, লাঠি ইত্যাদির সহিত ও স্ত্রীলোককে তার প্রিয় অলঙ্কারের সহিত দাহ করা হয়। তারপর অদগ্ধ অস্থিগুলি সংগ্রহ করে একটা মৃৎপাত্রে করে নিয়ে গিয়ে তার বাড়ির নিকটে এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। তারপর তৃতীয় দিনে, যে 'বের' গাছের তলায় তার শব স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে তার উদ্দেশ্যে খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি রাখা হয়। ভীলেরা মৃতের আত্মায় ও পরকালে ওই আত্মা কোথায় আশয় গ্রহণ করবে, তাতে বিশ্বাস করে। এটা তারা নির্ণয় করে আটার একটা পিণ্ড প্রদীপের ধারে রেখে। ওই আটার পিণ্ডটা যদি মানুষের পদচিহ্নের আকার ধারণ করে, তাহলে তারা ধরে নেয় যে পরজন্মে সে মানুষরূপেই জন্মগ্রহণ করবে। আর পিণ্ডটা যদি কোন জন্তুর পায়ের ক্ষুর, বা পাখীর পা, বা বৃশ্চিক কিংবা সর্পের আকার ধারণ করে, তাহলে পরজন্মে সে সেই প্রাণীর মধ্যে আশ্রয় নেবে, এটাই ধরে নেয়। তাদের বিশ্বাস, যম দক্ষিণদিক থেকে এসে মৃত-ব্যক্তির আত্মাকে উত্তরদিকে নিয়ে যায়। তাদের ধারণা, পথিমধ্যে আত্মাকে এক কণ্টকাকীর্ণ সমতলভূমি অতিক্রম করতে হয়। এজন্য শ্রাদ্ধের দিন তার উদ্দেশ্যে যেসকল জিনিস দেওয়া হয়, তার মধ্যে পাদুকা থাকে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাবার পথে আত্মাকে দুই তপ্ত স্তম্ভের ভিতর দিয়ে যেতে হয় এবং এক রন্ধনশালার মালিকের সঙ্গে দেখা হয়, যে তাকে রান্না-করা খাদ্যসামগ্রী খেতে দেয়। তারপর পথে সে এক নদীর সম্মুখীন হয়। সেখানে এক গাভী এসে হাজির হয়, এবং তার লেজ ধরে সে ওই নদী অতিক্রম করে। সেজন্য শ্রাদ্ধের সময় গাভীদান করা হয়। যম তারপর নির্ধারণ করে তিন কুণ্ড বা নরকের কোন্ নরকে সে প্রবেশ করবে। তারপর তার পুনর্জন্ম হয়। যাদের

সাংঘাতিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে, তারা পরজন্মে বৈরী প্রেতাত্মা বা ভূত হয়। অবৈরী আত্মারা 'দেও' হয়। তারা মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী। ভীলদের ধারণা, পাপী লোকেরা কীটে পরিণত হয়। যারা যুদ্ধে মারা যায় তাদের স্মরণার্থে ভীলরা প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্মিত স্মারকস্তম্ভ তৈরি করে প্রোথিত করে রাখে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কখনও হিন্দু ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না। সকল অনুষ্ঠান ওঝা বা 'বাদওয়া' সম্পন্ন করে।

ভীলদের মত বাস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যেও মৃতদেহ দাহ করাই নিয়ম, মাত্র ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম অনুসৃত হয়। মারিয়ারা কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় শুয়ে মরতে দেয় না। তাকে খাটিয়া থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। যে বসন বা অলঙ্কার পরে সে মারা যায়, সে-সমস্ত সমেতই তাকে দাহ করা বা সমাধি দেওয়া হয়। আরও দেওয়া হয় তার ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। তার ব্যবহৃত কুঠার ও 'গোদারি' বা 'করকি'ও (যা দিয়ে সে মাটি খুঁড়ত) তার সঙ্গে দাহ করা বা সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু তার ব্যবহৃত তীর-ধনুক বা বর্শা কখনও তার সঙ্গে দাহ করা বা সমাধি দেওয়া হয় না। তাছাড়া, যে ঘরে সে মারা যায়, সে ঘর অব্যবহৃত রাখা হয় এবং কখনও সংস্কার করা হয় না। সেটা বন্ধ রাখা হয় এবং সেটাই তার স্মারকচিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। তারা কখনও সমাধিস্তূপ তৈরি করে না। যদি কলেরা বা বসন্তে বা আত্মহত্যার ফলে তার মৃত্যু ঘটে, তা হলে প্রতিষ্ঠিত সমাধিস্থানে তাকে সমাধি দেওয়া হয় না। যদি বাঘের দ্বারা নিহত হয়ে মৃত্যু ঘটে, তা হলে যে স্থানে তার মৃত্যু ঘটেছে সেই স্থানেই তাকে দাহ করা হয় কিন্তু তাকে কেউ স্পর্শ করে না। মাত্র মৃতের ওপর কাঠ চাপিয়ে তাকে দাহ করা হয়। যদি কোন লোকের আচমকা মৃত্যু ঘটে, তা হলে মারিয়ারা দলের পুরোহিতের (**Waddai**) সাহায্যে নির্ণয় করে, কী কারণে তার মৃত্যু ঘটেছে—রোগে, না দেবতাদের অসন্তোষে, না কোন ভূতের রোষে,

না কোন শত্রুস্থানীয় প্রতিবেশীর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায়, না কোন ডাইনীর ক্রিয়াকলাপে, না স্বাভাবিকভাবে।

সাঁওতালদের মধ্যে মৃতব্যক্তিকে কোন নদী বা জলাশয়ের ধারে দাহ করা হয়। মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারী দাহের পর অদগ্ধ মাথার খুলির একটুকরো ও কাঁধের হাড়ের দু'টুকরো সংগ্রহ করে সেগুলি জলে ধুয়ে নিয়ে একটা মাটির হাঁড়ির ভেতর রাখে এবং হাঁড়ির মুখে একখানা সরা চাপা দেয়। মৃতব্যক্তির আত্মা যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সরাতে একটা ফুটো করে তার মধ্যে একটা খড় দেয় যাতে সে ওই খড়ের ভেতর দিয়ে বাইরের জগতে আনা-গোনা করতে পারে। সাঁওতালরা ছোট শিশুদের কোনরূপ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই মাটিতে পুঁতে ফেলে। সাঁওতালরা আত্মার শাশ্বতত্বে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর পেত্নী হয়, তার মস্ত বড় একটা মাথা হয় এবং মাথায় একঝাঁকড়া চুল খাড়া হয়ে থাকে। সাঁওতালদের আরও বিশ্বাস যে, মানুষ জন্মাবার সময় সৃষ্টিকর্তা তাকে যে পরিমাণ খাদ্য দেয়, সেই খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গেলেই তার মৃত্যু ঘটে এবং সে তখন তার ইহলোকের আবাসস্থল পরিত্যাগ করে। শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাকে তার মৃত পূর্ব-পুরুষদের কাছে পাঠানো হয় এবং তাকে অনুরোধ করা হয়, সে যেন তার কুল পরিহার না করে। সাঁওতালদের ধারণা, মৃত্যুর পর মানুষের ইহলোকে কৃত কাজকর্মের বিচার হয় এবং সৎ ও অসৎ কর্মের জন্য সে যথাযথভাবে পুরস্কৃত হয় বা শাস্তি পায়। কতকগুলি পাপকর্মের জন্য মানুষকে দুর্গন্ধময় পুরীষপূর্ণ পঙ্কের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ইহলোকে মানুষ যদি অপরের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায় তখন তাকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে বলা হয় এবং যেহেতু ঋণ পরিশোধ করবার কোন সঙ্গতি তার থাকে না, সেইহেতু তার পিঠ চিরে সেই ক্ষতের মধ্যে নুন দেওয়া হয়। তবে উত্তমর্ণ যদি হিন্দু হয়,

তা হলে তাকে এ শাস্তি ভোগ করতে হয় না। সাঁওতালী উপকথায় প্রায়ই মৃত্যুর পর টিকটিকি বা ফড়িঙ হওয়ার কথা শোনা যায়, এবং তা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ মৃত্যুর পর টিকটিকি বা ফড়িঙ-এও পরিণত হতে পারে। পরিশেষে উল্লেখনীয় যে, সাঁওতালদের মধ্যে যে অনুষ্ঠান (caco chatiar) দ্বারা কোন শিশুকে পূর্ণ সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়, সে অনুষ্ঠান পালিত না হলে, কোন সাঁওতালের বিবাহ বা প্রেতকৃত্য হয় না।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রেঙ্গমা নাগাদের মধ্যে মৃতব্যক্তিকে সমাধি দেওয়ার প্রথাই প্রচলিত আছে। মৃতকে সাধারণত গ্রামের মধ্যেই একখণ্ড সমতল পাথর চাপা দিয়ে সমাধি দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস যে, পরবর্তী চাষবাসের সময় পর্যন্ত (Ngada ceremony) মৃতের আত্মা গ্রামেই অবস্থান করে। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকেরই সৌভাগ্য হয় অন্তরীক্ষে (স্বর্গে) যাবার। অধিকাংশকেই পৃথিবীর নীচে মৃত্যুপুরীতে যেতে হয়। সেখানে মানুষকে ইহজন্ম সমেত সাত জন্ম থাকতে হয়। প্রতি জন্মের জীবনধারা একই রকমের। তার মানে, সাত-জন্ম একই জীবনধারার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রেঙ্গমা নাগাদের বিশ্বাস যারা ইহজন্মে ভালো গান করতে পারে তারা পরজন্মে ঝিঁঝিঁপোকা হয়, আর যারা সঙ্গীতজ্ঞ নয় তারা প্রজাপতি হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লুশাইরাও মৃতকে সমাধি দেয়। সমাধি সাধারণভাবেই দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমাধি দেওয়া হয় ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে। একখণ্ড কাঠকে কুঁদে একটা শবাধার বা কফিন তৈরি করা হয়। তারপর মৃতকে শবাধারের ভেতর স্থাপন করে বাড়ির দেওয়ালের পাশে রাখা হয় এবং তার সন্নিকটে একটা উনান নির্মাণ করা হয়। শবাধারে একটা বাঁশের নল লাগিয়ে নলটাকে মাটির তলা পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হয়। শব সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত উনানটি দিবারাত্র জ্বালিয়ে রাখা হয়। শবটি সম্পূর্ণ

শুষ্ক হয়ে গেলে, তার মাথার খুলি ও বড় অস্থিগুলি বের করে একটা ঝুড়ি করে উনুনের কাছে এক তাকের ওপর রাখা হয়। আর ছোট অস্থিগুলি একটা মাটির পাত্রে ভরে পুঁতে ফেলা হয়। শব যখন শবাধারে শুষ্ক হয় তখন তার বিধবাকে ততদিন তার পাশে বসে থাকতে হয়। লুশাইদের কল্পনায় মৃতব্যক্তিদের জন্য দু'রকমের প্রেতলোক আছে, যথা—মিথিকুয়া ও পিয়ালরাল। সাধারণ লোকেরা মিথিকুয়ায় যায়। আর, প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা ইহজীবনে তিন কুমারী বা সাত স্ত্রীলোককে উপভোগ করেছে তারা পিয়ালরালে স্থান পায়। লুশাইদের বিশ্বাস, মৃতশিশুরা তাদের ভ্রাতা বা ভগিনীর সন্তান হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

আগে ওরাঁওরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করত। পরে বৎসরের এক নির্দিষ্ট দিনে সমাধিস্থল থেকে মৃতদেহকে বের করে দাহ করত। একে 'হাড়বোরা' বলা হত। গোণ্ডসমাজে মৃতদেহকে দাহ করাই প্রতিষ্ঠিত প্রথা। তবে অস্বাভাবিকভাবে যদি কারোর মৃত্যু হয়, তাকে সমাধিস্থ করা হয়। দাহের সময় মৃতদেহকে পূর্ব-পশ্চিমে শোয়ানো হয়। চতুর্থ দিনে তার উপরে কাঠ বা পাথর দিয়ে একটা সমাধিস্তম্ভ তৈরি করা হয়। শবাধার আত্মীয়স্বজন বহন করে নিয়ে যায়। তাদের 'নাট' বলা হয়। কেউ মারা গেলে তারা অশৌচও পালন করে। অশৌচের সময় তারা কোন কাজকর্ম করে না। তবে অশৌচপালন ও অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রচুর আঞ্চলিক প্রভেদ ও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে মামাতো ভাই বা ভাগিনেয় দাহস্থান থেকে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে দশ দিনের দিন তা জলে বিসর্জন দেয়। তবে সর্বত্রই শেষকৃত্যের সময় 'নাট' বা কুটুম্বদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। পরে এক সামাজিক ভোজে তাদের আপ্যায়িত করা হয়।

শবররাও মৃতদেহ দাহ করে। কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন স্থলে শবকে সমাধিস্থ করা হয়। শবের সৎকারকর্মে মেয়েরাই

প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বে মেয়েরাই শব বহন করে নিয়ে যেত। মৃতব্যক্তি যে জায়গায় শেষ চাষবাস করত, সেই জায়গাতেই কাঁচা আমপাতা দিয়ে চিতা তৈরি করা হয়। চিতা জ্বলতে থাকলে, তারা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সেখান থেকে চলে আসে। তারপর তারা সেখানে ফিরে গিয়ে তার চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করে। তারপর তারা দেড় হাত গভীর এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ওই ভস্মাবশেষ ও অস্থি একটা মুরগীর ডিমের খোলার সঙ্গে সমাধিস্থ করে এবং পরে তার ওপর এক ক্ষুদ্রকায় সমাধি-কুটির তৈরি করে।

উপরে আদিবাসী সমাজের ধর্ম ও ধর্মীয় আচরণের যে পরিচয় দেওয়া হল, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাদের ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনের অনেক মিল আছে। তবে কে কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে সেটা বলা কঠিন। কেননা, আমি আগেই বলেছি যে, হিন্দুসভ্যতার বারো আনা ভাগই প্রাগ্‌বৈদিক সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের কাছ থেকে নেওয়া।

হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দুধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? হিন্দুধর্ম বলতে আমরা সেই ধর্মকে বুঝি, যে ধর্মের অনুগামীদের জীবনচর্যা একটা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয় এবং যারা বেদ-পুরাণ-তন্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলিকে তাদের ধর্মের ভিত্তি বলে মনে করে। কিন্তু হিন্দুর জীবনচর্যার কোন একটা বিশেষ ও বিশিষ্ট রূপ নেই। অঞ্চল ও জাতিভেদে এর অসংখ্য রূপ। কিন্তু এই অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের প্রতি মানুষের মনে একটা অন্তর্লীন ধারণা আছে যে, সে 'হিন্দু' বা সনাতন ধর্মের অনুগামী। কিন্তু হিন্দুর জীবনচর্যার যেমন কোন বিশেষ রূপ নেই, 'সনাতন' শব্দটারও কোন বিশেষ সংজ্ঞা নেই। কেননা, হিন্দুসমাজ কোন বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। কালের আবর্তনের সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটেছে এবং সেইসঙ্গে তার জীবনচর্যারও পরিবর্তন ঘটেছে। তার মানে, হিন্দুসমাজ static বা অনড় নয়, এটা dynamic বা সচল। হিন্দু-সমাজের এই সচলতাই হিন্দুসমাজকে তার সংহতি দান করেছে।

হিন্দুসমাজের এই সচলতা, হিন্দুধর্মের উদারতার ওপর নির্ভর করেছে। হিন্দু অপরকে যেমন দিয়েছে, অপরের কাছ থেকে তেমনি নির্বিবাদে গ্রহণ করেছে। তবে অপরের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে, তাকে হিন্দুত্বের রূপ দিয়েছে। যেমন মুসলিম শাসনকালে হিন্দু সত্যপীরকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাকে নারায়ণের স্বরূপ দিয়েছে। এ প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সোনাপীর ও মনাইপীরের নামও উল্লেখ্য। আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে, হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন ঘটেছিল প্রাগার্যকালে, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে। ('প্রি-আরিয়ান এলিমেণ্টস্ ইন হিন্দু কালচার', ১৯৩১, দ্রঃ)। কেননা, ধর্মের দিক দিয়ে সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা প্রত্নশিব

ও তার প্রতীক লিঙ্গ ও মাতৃকাদেবীর উপাসক ছিল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে যে দেবীপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। এছাড়া, তাদের মধ্যে আরও প্রচলিত ছিল নাগপূজা, অশ্বত্থবৃক্ষপূজা, সূর্যপূজা ইত্যাদি। ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলীতে এসবের কোন স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় হয়, তখনই প্রাগার্য দেবতাদের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা বলতাম 'মধ্যদেশ', তার মানে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি দেশে। সেখানে আর্যদের আপোস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার (যার মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবও কার্যকর ছিল) ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতালাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় (হিন্দু) সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতিগান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা। নূতন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটে। (পরে দেখুন)। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভজন ও ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। (লেখকের 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য', ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রঃ)। কিন্তু তাই বলে বৈদিক প্রভাব একেবারে লুপ্ত হল না। হিন্দুর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যথা নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধকার্যে বৈদিক মন্ত্রই আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। নানা অঞ্চলে এইসব অনুষ্ঠানের নানা রূপ আছে। কিন্তু সর্বত্রই সেই একই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়। নানারকম অনৈক্যের মধ্যে হিন্দুধর্মের যে একটা ঐক্য-স্বরূপ আছে, তা এ-থেকে প্রমাণিত হয়।

আর্যচিন্তাধারার দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, অনার্য দেবতাসমূহ পৌরাণিক

যুগে লোকমানসের রঙ্গমঞ্চে সামনে এসে দাঁড়ায়। আর বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্‌ভূমিতে চলে যায়। বৈদিক ইন্দ্র তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে মাত্র পূর্বদিকের একজন লোকপালে পর্যবসিত হয়। নূতন দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে আসে ব্রহ্মা (যার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই, 'ব্রহ্মা' কি অনার্যদের 'বুড়ামবুড়ো' থেকে কল্পিত হয়েছিল ?), বিষ্ণু, শিব (যাকে আমরা সিন্ধুসভ্যতায় পাই), দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী (ঋগ্বেদে নদী হিসাবে স্তুত হত), শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা, আরও কত কে। অবতারবাদের সৃষ্টি হয়, তাতে বুদ্ধও স্থান পায়। অবতারবাদের মধ্যেই আমরা পাই আর্য-অনার্য সংশ্লেষণের ইতিহাস। বৈদিক দেবতাদের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীতে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তারাই হল পুরুষ দেবগণের শক্তির উৎস (মনে হয়, এর ওপর পড়েছিল কালযান বা বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব)। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে আসেন 'দেবী' হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে আসেন অনার্যসমাজের সেই-সমস্ত দেবদেবী, যাঁরা আগে লুকিয়ে ছিলেন গাছতলায়, ঝোপ-জঙ্গলে ও পর্বতকন্দরে। সেইসব দেবী সমপর্যায় লাভ করে 'দেবী'র সঙ্গে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন ও 'যজ্ঞনাশকারী' বলে যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষপর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭ দ্রঃ)।

ওপরে আমরা যে-সব কথা বললাম, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা এখানে প্রধান বৈদিক দেবতামণ্ডলী, পৌরাণিক দেবতা-মণ্ডলী ও লোকায়ত দেবদেবীসমূহের একটা তালিকা দিই।

বৈদিক দেবতামণ্ডলী—(১) দ্যৌস্ ও পৃথিবী, (২) অদিতি ও আদিত্যগণ, (৩) অগ্নি, (৪) সূর্য, (৫) পূষণ, (৬) মিত্র, (৭) বরুণ, (৮) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, (৯) উষা, (১০) ইন্দ্র, (১১) পর্জন্য, (১২) বায়ু, (১৩) মরুৎ, (১৪) সোম, (১৫) ত্বষ্টা ও (১৬) যম।

পৌরাণিক দেবতামণ্ডলী—(১) ব্রহ্মা, (২) বিষ্ণু, (৩) শিব, (৪) দুর্গা, উমা, পার্বতী, (৫) লক্ষ্মী, (৬) সরস্বতী, (৭) দশভুজা, (৮) সিংহবাহিনী, (৯) মহিষমর্দিনী, (১০) জগদ্ধাত্রী, (১১) কালী, (১২) মুক্তকেশী, (১৩) তারা, (১৪) ছিন্নমস্তা, (১৫) অন্নপূর্ণা, (১৬) কৃষ্ণ, (১৭) জগন্নাথ, (১৮) বলরাম, (১৯) সুভদ্রা, (২০) গণেশ, (২১) কার্তিক, (২২) বিশ্বকর্মা, (২৩) হনুমান, (২৪) নীল, (২৫) গঙ্গা, (২৬) মঙ্গলা, (২৭) সূর্য, (২৮) শনি, (২৯) গরুড়, (৩০) নবগ্রহ, (৩১) তুলসী, (৩২) অশ্বত্থ, (৩৩) শালগ্রাম, (৩৪) নবপত্রিকা, ইত্যাদি।

লোকায়ত দেবদেবী—(১) শীতলা, (২) মনসা, (৩) ইতু, (৪) ষষ্ঠী, (৫) রক্ষাকালী, (৬) সুবচনী, (৭) মঙ্গলচণ্ডী, (৮) ঘণ্টাকর্ণ, (৯) মানিকপীর, (১০) সত্যনারায়ণ, (১১) ওলাইচণ্ডী, (১২) ধর্মঠাকুর, (১৩) পঞ্চানন, (১৪) দক্ষিণরায়, (১৫) কালুরায়, (১৬) বাশুলী, (১৭) বাবা-ঠাকুর, (১৮) সন্তোষী মা, ইত্যাদি। অনেক জায়গায় লৌকিক দেবদেবীর পূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির পুরোহিতরা বা মেয়েরা সম্পাদন করে।

এছাড়া আছে গ্রামদেবতারা। প্রায় প্রতি গ্রামের নিজস্ব গ্রাম-দেবতা আছে। ভারতের গ্রামসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও ওপর। সুতরাং ভারতের গ্রামদেবতাদের সংখ্যা হিসাব করে বলা খুব কঠিন। গ্রামের মানুষের কাছে গ্রামদেবতার প্রাধান্যই বেশি। আপদে-বিপদে তারা গ্রামদেবতার কাছেই ছুটে যায় ও মানত করে। তাদের সুখদুঃখে গ্রামদেবতারাই তাদের আশ্রয়স্থল। গ্রামদেবতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় : 'যেষু দেশেস্থু যে দেবাঃ' (দেবলবচন)।

এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা গণনার বাইরে। তবে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর শীর্ষে অবস্থান করছেন তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মনে হয়, এই তিন দেবতাই প্রাগার্য দেবতা। শিব যে প্রাগার্য দেবতা, তা মহেঞ্জোদারোতে শিবের যে প্রতীক পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মা সম্বন্ধে আমি আগেই

বলেছি যে, খুব সম্ভবত ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছিল আদিবাসী সমাজের দেবতা 'বুড়ামবুড়ো' থেকে। বিষ্ণু সম্বন্ধে আদমশুমারির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে **'Vishnu would seem to have some associations with religious beliefs represented chiefly in beliefs yet surviving among primitive tribes'** (বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী যে অনার্য দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই)। তবে এই তিন পুরুষদেবতা পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর শীর্ষে অবস্থান করলেও, আমরা হিন্দুধর্মে নারীদেবতার প্রতিপত্তি বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করি। এইসকল নারীদেবতার মধ্যে আছেন কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলা ইত্যাদি। হিন্দুধর্মে নারীদেবতার এই আধিপত্য প্রাগ্‌বৈদিক ধর্মেরই উত্তরাধিকার। এটা আমরা সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত অসংখ্য মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর প্রতিমূর্তি-সমূহ থেকে বুঝতে পারি।

বস্তুত প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, সহজিয়া, তান্ত্রিক, চৈতন্য-প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণবধর্ম, কর্তাভজা ধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় ইত্যাদি নানা স্তরের ভেতর দিয়ে হিন্দুধর্ম তার বর্তমান বিবর্তিত রূপ পেয়েছে। সংশ্লেষণ ও সমন্বয়, এটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। এমনকি, মধ্যযুগে পীর-পূজাকেও হিন্দু তার ধর্মে স্থান দিয়েছে। এর দ্বারাই হিন্দুধর্মের **dynamism** ও **social mobility** প্রকাশ পায়।

বর্তমানে হিন্দুরা সাধারণত পঞ্চোপাসক নামে পরিচিত। তার কারণ, তারা মূলত পাঁচ দেবতার উপাসক। এই পাঁচ দেবতা হচ্ছেন—শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য। সেই অনুযায়ী এদের শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর বলা হয়। তবে এদের প্রত্যেকেরই নানা শাখা ও সম্প্রদায় আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের দেবতাদের পূজা করে ঘটে, পটে, যন্ত্রে, শিলায় ও প্রতিমায়, নানা উপচারে।

যদিও এইসব দেবদেবীর আরাধনা হিন্দুধর্মে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, তা হলেও হিন্দু নিজেকে 'হিন্দু' বলে দাবী করবার পিছনে যে যুক্তি আছে, তা হচ্ছে তাদের শাস্ত্রবিহিত সংস্কার, আচরণ ও জীবনচর্যা। হিন্দু বিশ্বাস করে যে তার শুদ্ধির জন্য প্রয়োজন দশবিধ সংস্কার। এই দশবিধ সংস্কার হচ্ছে—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা হিন্দু এই দশবিধ সংস্কার সম্পাদন করে। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আমরা এর আগে যা দেখেছি, অন্যান্য সংস্কার সম্বন্ধেও তাই ঘটে। যে-সব অনুষ্ঠানাদির দ্বারা এই-সকল সংস্কার সম্পাদিত হয়, তার কতকগুলি পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত হয়, যাতে পুরোহিতরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে, আর কতকগুলি মেয়েরা সম্পাদন করে, যেগুলি আদিম অনার্যসমাজ থেকে গৃহীত।

হিন্দুর আচরণ প্রকাশ পায় তার জীবনচর্যার ভেতর দিয়ে। হিন্দুর আধুনিক জীবনচর্যা অনেক পালটে গিয়েছে। সেজন্য আমি এখানে সেকালের ধর্মীয় জীবনচর্যার কথাই বলব। বিবাহের পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শুরু হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র নিত। কেননা, সেকালের মেয়েদের বিশ্বাস ছিল যে, মন্ত্র না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা মন্ত্র নিত, তাদের প্রতি-দিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের মন্ত্র হয়নি, তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমনকি, শ্বশুর-শাশুড়ীও তাদের হাতের জল শুদ্ধ বলে মনে করতেন না।

সেকালের মেয়েরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করত। এই পঞ্চকন্যা হচ্ছে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী। তারপর সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দিত। এছাড়া, প্রতি বাড়িতেই

তুলসীমঞ্চ থাকত। তুলসীমঞ্চ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হত এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে দিত।

সেকালের মেয়েদের ধর্মবিশ্বাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিশুকাল থেকেই নানারকম ব্রতপালনের ভেতর দিয়ে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত। পাঁচ থেকে আট বছর বয়সের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত। যেমন, বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যিপুকুর. কার্তিক মাসে কুলকুলতি, পৌষ মাসে সোদো, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল, ইত্যাদি। সধবা মেয়েদের ব্রতের অন্তই ছিল না। সারা বছর ধরে দু-একদিন অন্তর একটা-না-একটা ব্রত বা উপবাস লেগেই থাকত। যেমন সাবিত্রী ব্রত, ফলহারিণী ব্রত, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, বিপত্তারিণী ব্রত, নাগপঞ্চমী, ইতুপূজা, নীলপূজা, লুণ্ঠনষষ্ঠী, চর্পটাষষ্ঠী, জন্মাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দশী, কাত্যায়নী ব্রত, শীতলষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, অরণ্যষষ্ঠী, ইত্যাদি। এছাড়া, অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ করা হত। বৈশাখ মাসে তুলসীগাছের ওপর ঝারা বাঁধা হত। কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হত। পৌষসংক্রান্তিতে 'বাউনি' বাঁধা হত। পিঠেপুলি তৈরি হত। চৈত্রসংক্রান্তিতে যবের ছাতু খাওয়া হত।

কথায় বলে, বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে বাঙালীর পার্বণের সংখ্যা তেরো-র অনেকগুণ বেশি। ১১৯৪ বঙ্গাব্দের (১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এইসব পর্বের দিন সরকারী কার্যালয়-সমূহ বন্ধ থাকত—অক্ষয়তৃতীয়া ১ দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ২ দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমী-একাদশী ২ দিন, স্নানযাত্রা ১ দিন, রথযাত্রা ১ দিন, পুনর্যাত্রা ১ দিন, জন্মাষ্টমী ২ দিন, শয়ন একাদশী ১ দিন, রাখীপূর্ণিমা ১ দিন, উত্থান একাদশী ২ দিন, অরন্ধন ১ দিন, দুর্গাপূজা ৮ দিন, তিলুওয়া সংক্রান্তি ১ দিন, বসন্তপঞ্চমী ১ দিন, গণেশপূজা ১ দিন, অনন্তব্রত ১ দিন, বুধনবমী ১ দিন, নবরাত্রি ১ দিন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ১ দিন,

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১ দিন, অন্নকূট ১ দিন, কার্তিকপূজা ১ দিন, জগদ্ধাত্রীপূজা ১ দিন, রাসযাত্রা ১ দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১ দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২ দিন, মৌনী সপ্তমী ১ দিন, ভীমাষ্টমী ১ দিন, বাসন্তীপূজা ৪ দিন, শিবরাত্রি ২ দিন, হোলি বা দোলযাত্রা ৫ দিন, বারুণী ১ দিন, চড়কপূজা ১ দিন, ও রামনবমী ১ দিন। এছাড়া, গ্রহণাদির দিনও ছুটি থাকত। গ্রহণের দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জন্য আবার নূতন হাঁড়ি ব্যবহার করত। ছুটির দিক দিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে যে দুর্গা-পূজা, দোলযাত্রা ও বাসন্তীপূজাই সেকালের বড় পরব ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এসব পরবের অনেকগুলিই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেক নূতন পরব সৃষ্টি হয়েছিল। যে-সব পরব বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিপালিত হতে দেখেছি সেগুলি হচ্ছে— হালখাতা, অক্ষয়তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরীপূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী, ফলহারিণী, কালিকাপূজা, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী, দশহরা বা গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, বিপত্তারিণীপূজা, নাগপঞ্চমী, বিশ্বকর্মা-পূজা, অরন্ধন, মহালয়া, দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসযাত্রা, ইতুপূজা, পৌষপার্বণ, শ্রীপঞ্চমী, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, বাসন্তীপূজা, নীলপূজা, ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটুপূজা, চড়ক বা গাজন। সেকালের কলকাতায় ছেলেদের খুব খোসপাঁচড়া হত। সেজন্য ঘেঁটুপূজার খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। আরও এক কথা। ভাইফোঁটার দিন ২২-নং রাধানাথ মল্লিক লেনের 'বসু মল্লিক' পরিবারের বাড়িতে প্রতিমা তৈরি করে চিত্রগুপ্তের পূজা করা হত।

যদিও বাঙালী বারো মাসে তেরো পার্বণ করে, তা হলেও লোক-মানসে বাঙলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব ও গাজন। অনুরূপভাবে বিহারের বড় উৎসব হচ্ছে 'ছট্'। উত্তরপ্রদেশের বড় উৎসব 'হোলি'. 'দশেরা' ও 'রামলীলা'। পশ্চিমভারতের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে 'দেওয়ালী'। আর, দক্ষিণ ভারতের বড় উৎসব হচ্ছে 'পোংগল'। এসব

উৎসব ছাড়া আরও অনেক উৎসব আছে, তবে এগুলিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উৎসব। তবে হিন্দুদের উৎসবের একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে মেলা। বাঙলার সর্বত্রই রথযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা এবং গাজন উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। এককালে মেয়েরা এইসব মেলাতেই সুযোগ পেত নিজেদের পছন্দমত জিনিসপত্তর কেনবার। বাঙলার বাইরে সব-চেয়ে বড় মেলা হয় শোনপুরে। কার্তিকী পূর্ণিমায় এই মেলা শুরু হয়। বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীতে আর কোথাও এত বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় না। এখানে পশুপক্ষী থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত বিক্রি হত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় গুজরাটের 'তারনেতা' মেলারও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয়। রামনবমীতে অনুষ্ঠিত অযোধ্যা, রামটেক, সীতামারী প্রভৃতি স্থানের মেলাও প্রসিদ্ধ। সীতামারীর পশুমেলার স্থান শোনপুরের মেলার পরেই। এছাড়া আছে হরিদ্বারে ও প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ মেলা।

লৌকিক ধর্ম ও জীবনচর্যা

হিন্দুর উৎসবমুখর ধর্মীয় জীবনে একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে লোকধর্ম ও উৎসবগুলি। 'লোকধর্ম' বলতে আমরা সেই ধর্মকে বুঝি, যা দেশের সাধারণ লোক, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনুসরণ করে। উত্তরভারতের লোকধর্ম ও উৎসবগুলি সম্পর্কে আমাদের একখানি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন ডবলিউ. ক্রুক্ (W. Crooke)। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বইখানির নাম 'দি পপুলার রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফোক্‌লোর্ অফ নরদারন্ ইণ্ডিয়া'। ইদানীং বাঙলার লোকধর্ম ও উৎসব সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুশীলন চলেছে। লোকধর্ম সম্বন্ধে যাঁরা মূল্যবান গ্রন্থ বা নিবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, 'ফোক্‌লোর্' পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী, অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মাইতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক ও আরও অনেকে।

যে-দেশের মানুষ আদিমকাল থেকে বিশ্বাস করে এসেছে যে তাদের পিতৃপুরুষরা, ইহজগতে জীবিত থাকাকালীন যে-সকল কর্ম করেন, তার গুণাগুণ অনুসারে মৃত্যুর পর তাদের বিভিন্ন নরকে (নরক একুশটি, যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তকুর্মী, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণবোন, বিশসন. লালভক্ষ, সারমেয়ার্দন, অবীচী ও অয়ঃপান) অবস্থান করে ক্লেশভোগ করতে হয় এবং তাঁদের উদ্ধারের জন্য সন্তানকে ক্রিয়াকলাপাদি সম্পাদন করতে হয়, সে-দেশে সন্তানের যে একান্ত প্রয়োজন তা বলা

নিষ্প্রয়োজন। সেজন্য সন্তানকামনায় মানুষ নানারূপ দেবতার পূজা ও একাধিক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়।

সন্তানকামনায় বাঙলাদেশে কার্তিকপূজা প্রশস্ত। লোকের বিশ্বাস, কার্তিকপূজা করলে নিঃসন্তানরা পুত্রলাভ করে। সেজন্য আগেকার দিনে নিঃসন্তানরা যখন স্বেচ্ছায় কার্তিকপূজা করত না, প্রতিবেশীরা রাত্রিকালে তাদের বাড়ি কার্তিকঠাকুরের প্রতিমা রেখে আসত। যার বাড়ি কার্তিকঠাকুর রেখে আসত, সে তখন বাধ্য হত কার্তিক-পূজা করতে।

সন্তানকামনায় অনেকেই শিবঠাকুরের কাছে 'হত্যা' দিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে দেয়। এ প্রথা যে মাত্র বাঙলাদেশেই প্রচলিত আছে তা নয়। এ সম্পর্কে দক্ষিণভারতে বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে মেয়েদের সন্তানকামনায় 'হত্যা' দেবার উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের যে-সব শিবমন্দিরে বন্ধ্যা নরনারীরা সন্তানকামনায় 'হত্যা' বা 'ধরনা' দেয় বা অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছে মেদিনীপুরের এগরা থানার অন্তর্গত হটনগরের শিবমন্দির, মেদিনীপুর ও ওড়িশার সীমান্তে অবস্থিত চন্দনেশ্বরের মন্দির, ঝাড়গ্রামের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত কেন্দুয়ার শিবমন্দির, হুগলি জেলার তারকেশ্বরের মন্দির, বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বরের মন্দির, মেদিনীপুরের ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড গ্রামের চপলেশ্বরের মন্দির, নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরের জলেশ্বরের মন্দির, হুগলি জেলার চন্দননগর ও চুঁচুড়ার সংযোগ-স্থলে অবস্থিত ষণ্ডেশ্বরের মন্দির, ইত্যাদি। বস্তুত শিবের সঙ্গে নারী-জীবনের সার্থকতার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা আমরা সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র মহেঞ্জোদারোয় আদি-শিবের যে প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে, তাতে শিবকে ঊর্ধ্বলিঙ্গ অবস্থায় উপবিষ্ট থাকা থেকে বুঝতে পারি। বস্তুত শিব যে প্রজনন দেবতা তা আমরা বাঙলাদেশের শতসহস্র শিবমন্দিরে অবস্থিত গৌরীপট্টের ওপর স্থাপিত শিবলিঙ্গের

প্রতিরূপ থেকেও বুঝতে পারি। বাঙলাদেশে বৈশাখ মাসে কুমারী মেয়েদের দ্বারা মাটির তৈরি গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গের পূজাও এই কল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মনে হয়, এ কল্পনা প্রাগার্যকাল থেকে চলে আসছে। কেননা, শিব যে প্রাগার্যদেবতা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লিঙ্গপূজাও যে ভারতে নবোপলীয় যুগ থেকে চলে আসছে, তার প্রমাণও আমরা আগে দিয়েছি।

শিবের ন্যায় শিবজায়া কালীরও বন্ধ্যা নারীকে উর্বরতা শক্তি দেবার ক্ষমতা আছে। মৃতবৎসা নারীর সন্তানকে দীর্ঘায়ু দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও কালী। বাঙলাদেশের অনেকগুলি কালীমন্দির সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে এটা প্রকাশ পায়। এইসকল মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের বড়তলাচকের মন্দির, মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত শীতলা পরমানন্দপুরের মন্দির, মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাশিম-নগরের টাঠারিবাড়ের মন্দির, মেদিনীপুরের তমলুক থানার অন্তর্গত সাবলআড়ার মন্দির, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গিরিয়ার সেকেন্দারা মন্দির, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মন্দির, চব্বিশ-পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়চণ্ডীপুরের মন্দির, চব্বিশ-পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসতের মন্দির, ওই থানারই অন্তর্গত ময়দার মন্দির, ও কলকাতার কালীঘাট, ঠনঠনিয়া প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি মন্দির। কালীঘাটের মন্দিরের যে এ মাহাত্ম্য আছে তা আমরা পড়ি বিমল মিত্রের একখানা উপন্যাসে। সেখানে আমরা পড়ি কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর জয়চণ্ডীপুর থেকে বুধবারি সপরিবারে কালীঘাটে আসে সন্তানকামনায়। লোকে এইসব মন্দিরে সাতদিনের জন্য 'হত্যা' দিয়ে মানত ক'রে যদি সন্তান-লাভ করে, তাহলে সেই বিশেষ মন্দিরে শিশুসন্তানকে নিয়ে এসে মস্তকমুণ্ডন করে পূজা দেয়।

পঞ্চানন, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার কাছে সন্তানকামনা করে লোক যদি সন্তানলাভ করে, তাহলে অনুরূপভাবে ওইসব বিশেষ মন্দিরে শিশুসন্তানকে নিয়ে এসে মস্তকমুণ্ডন করে পূজা দেয়। এসব ছেলেদের ওইসব ঠাকুরের 'দোর ধরা' বলা হয়। (সন্তানকামনায় লোকে আরও যে-সব দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়, তার জন্য ড. প্রদ্যোত মাইতির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

বাঙালীর লোকায়ত পূজাচারের মধ্যে বৃক্ষপূজারও একটা স্থান আছে। সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকেই বৃক্ষপূজা প্রচলিত আছে। যে-সকল বৃক্ষের প্রতি সাধারণ লোক শ্রদ্ধা দেখায় ও পূজা করে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় অশ্বত্থ, বট, ধাত্রী, পলাশ, তুলসী, বেল, ধান, সিজ-মনসা, শেওড়া, ঘেঁটু, দূর্বা, আমলকী, কুল, কলা, করম কদম, শাল (ইদ পূজার প্রতীক), খেজুর, নিম, বাঁশ ইত্যাদি।

বৃক্ষপূজার মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের পূজার নিদর্শন আমরা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পাই। সেখানকার সীলমোহরসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে ওই সভ্যতার বাহকরা অশ্বত্থবৃক্ষের বিশেষ আরাধনা করত। বর্তমানে সারা ভারতের আদিবাসী ও হিন্দুরা অশ্বত্থবৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাখে। তাদের সকলেরই ধারণা যে মৃতের আত্মাসমূহ অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করে। ঋগ্বেদের ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপূজার কোন স্থান নেই। অশ্বত্থবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অথর্ববেদেই প্রথম লক্ষ্য করি। এখনও বাঙালী হিন্দু সারা বৈশাখ মাস ধরে প্রত্যহ অশ্বত্থগাছের গোড়ায় জল ঢালে। আবার উত্তর-প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের লোকরা অশ্বত্থগাছে ঘট বেঁধে তাতে প্রত্যহ তিল, জল ও দুধ ঢালে। তাদের বিশ্বাস এতে পিতৃপুরুষদের আত্মার শান্তি হবে। বাঙলাদেশের মেয়েরা সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী 'অশ্বত্থপাতা'র ব্রত করে। চার বছর এ ব্রত সম্পাদন করলে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করা যায়।

বটবৃক্ষের আরাধনাও বাঙলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। এর সঙ্গে নানা দেবদেবীর যোগ আছে। লোকের বিশ্বাস বটবৃক্ষ শাশ্বত, কেননা জগতে যে মহাপ্লাবন ঘটেছিল, তাতে বৃক্ষসমূহের মধ্যে একমাত্র বটবৃক্ষই রক্ষা পেয়েছিল। সেজন্য রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে বটবৃক্ষকে 'অক্ষয়বট' বলা হয়েছে। বাঙলাদেশের মেয়েরা জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপনের দিন বট-বৃক্ষের পূজা করে। এছাড়া, সন্তানকামনায় অনেক জায়গায় বটগাছে ঢিল বেঁধে দেওয়া হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মেয়েরাও জ্যৈষ্ঠ মাসে বটগাছের পূজা করে।

গ্রামাঞ্চলে প্রতি বাড়িতেই তুলসীমঞ্চ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, তুলসীমঞ্চ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। সেখানে সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়। তাছাড়া, শপথ করবার সময় লোক তামা-তুলসী হাতে করে শপথ করে। তুলসীর সঙ্গে তামার এই সংযোগ থেকে মনে হয় যে, তাম্রাশ্মযুগ থেকে এই প্রথা চলে এসেছে। তা-ছাড়া, পূজাদি ধর্মকর্মে তুলসীপাতা একান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন নারায়ণশিলার পূজা করা হয়। নারায়ণের সঙ্গে তুলসীর সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরাণসমূহে দুটি কাহিনী আছে। একটি, শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী, ও আরেকটি, জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা সম্পর্কে। নারায়ণ তুলসী ও বৃন্দার সতীত্বনাশ করে তাদের বর দেন যে নারায়ণশিলারূপে অবস্থিত হয়ে তিনি সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকবেন। সেই থেকেই তুলসীর মাহাত্ম্য। বাঙলাদেশে সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী তুলসীগাছের ওপর জলদানের জন্য 'ঝারা' বেঁধে দেওয়া হয়। তাছাড়া, অন্তর্জলী মানুষকে তুলসীতলায় রাখা হয়।

পূজাদি কাজে তুলসী যেমন অপরিহার্য, দূর্বাঘাসও তাই। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী দূর্বাও বিষ্ণু বা নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষ্ণুর লোম থেকেই দূর্বার উদ্ভব। দূর্বা সিদ্ধিদাতা

গণেশের খুব প্রিয়। বাঙলাদেশে ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে মেয়েরা 'দূর্বাষ্টমী'র ব্রত উদ্‌যাপন করে।

বেলবৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক শিবঠাকুরের। বেলপাতা ছাড়া শিবঠাকুরের পূজা হয় না। দুর্গাপূজার একান্ত অঙ্গ হিসাবে যে নবপত্রিকা তৈরি হয়, বেল তার অন্যতম উপাদান। (অন্যান্য উপাদান হচ্ছে কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, অশোক, জয়ন্তী ও মানকচুর পাতা)। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিবের বরে লক্ষ্মীর অঙ্গ থেকে বেলগাছের উৎপত্তি। আবার, শিবরাত্রির ব্রতকথায় শিবের সঙ্গে বেলগাছের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত হয়। সাধারণ লোক শিব-জ্ঞানেই বেলগাছের পূজা করে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মেয়েরা অভীষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির কামনায় বেলবৃক্ষকে পূজা ও আলিঙ্গন করে।

একসময় সাপে কামড়ালে সিজগাছের আঠা প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হত। মনে হয় সেই থেকেই সিজগাছের সঙ্গে সর্পের দেবী মনসার সম্পর্ক। এবং সেজন্যই বাঙলাদেশের লোক সিজগাছকে মনসাগাছ বলে। মনসাগাছ মনসাদেবীর প্রতীক হিসাবেই পূজিতা হয়। নাগপূজার প্রচলন সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকেই চলে আসছে। বস্তুত ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে নাগপূজা যে প্রাগার্যকাল থেকে চলে আসছে, তা আমরা বুঝতে পারি সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে ভারতের সর্বত্র নাগ-নাগিনীর মূর্তি থেকে। তবে মনে হয়, সর্পের দেবতা আদিতে পুরুষদেবতা ছিলেন, পরে কালযান বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলীর অনুকরণে হিন্দুরা সর্পদেবতাকে নারীদেবতাতে পরিণত করেছিল। এটা পৌরাণিক উপাখ্যানে মনসা ও তাঁর স্বামীর নামের একত্ব (উভয়েরই নাম জরৎকারু ছিল) থেকে বুঝা যায়। বাঙলাদেশে মনসাপূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেকগুলি কাব্য আছে ; যথা—চাঁদ-সদাগর, বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী, রাখালবালকদের কাহিনী, কালু ও মালুর কাহিনী, কৃষক বাচাইয়ের কাহিনী ও হাসান-হোসেনের

কাহিনী। তাছাড়া, বাঙলাদেশে মনসাপূজা বহুল প্রচলিত। আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘটে অথবা সিজবৃক্ষে অথবা চালির পিছনে অঙ্কিত মনসাদেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানা স্থানে আছে। পল্লী অঞ্চলে অনেক জায়গায় পূজার পর আটদিন ধরে মনসার ভাসান বা অষ্টমঙ্গলা গীত হয়। (লেখকের 'বাঙলা ও বাঙালী', ১৩৮৭, পৃষ্ঠা ৫২-৫৪ দ্রষ্টব্য)

বাঙলার গৃহস্থঘরে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা হয়, তা ধান ছাড়া হয় না। এ ধান 'রেক'-এর মধ্যে রক্ষিত হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যেসকল উপকরণ থাকে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালীসমাজে লক্ষ্মীপূজা অতি আদিমকাল থেকে (সম্ভবত নবোপলীয় যুগ থেকে) প্রচলিত আছে। প্রতি পৌষ মাসে এই সংরক্ষিত ধান পালটানো হয়। তখন নূতন ফসল-তোলা ধান সংগৃহীত হয়। সেই ধানেই আবার চৈত্র ও ভাদ্র মাসে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজার উপকরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে লক্ষ্মী শস্যের দেবতা। অনেক জায়গায় লক্ষ্মীপূজাকে খন্দপূজা বলা হয়। 'খন্দ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শস্য, ফসলাদি'। তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে লক্ষ্মী শস্যসমৃদ্ধির দেবতা।

ধানের সঙ্গে একটা উৎসব হচ্ছে 'নবান্ন' উৎসব। এটা নূতন ফসল তোলার পর অনুষ্ঠিত হয় এবং পঞ্জিকায় উল্লেখিত দিনে সম্পাদন করা হয়।

নূতন ফসল তোলার পর জনসমাজে সবচেয়ে বড় যে আনন্দ-উৎসব পালিত হয়, তা হচ্ছে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে পালিত 'পৌষপার্বণ' বা 'পৌষালি' উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে বাঙলাদেশের মেয়েরা নানারকম পিঠে তৈরি করে। পিঠে-তৈরি বাঙলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন। পৌষপার্বণে মেয়েরা প্রদর্শন করত তাদের পিঠে-তৈরির শিল্পচাতুর্য। সাধারণত সুগন্ধি আতপ চাউলের গুঁড়া, দুধ, ক্ষীর,

নারিকেল, ভালো খেজুরের গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে তৈরি করা হত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই এটা প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে বিয়ের পর নূতন জামাই যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসত, তাকে আপ্যায়িত করা হত নানারকমের পিঠে দিয়ে। অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পিঠে তৈরি করা হত। ধনী-গরীব সকল ঘরেই এটা প্রচলিত ছিল। পিঠে-তৈরির এই নৈপুণ্য মেয়েরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে, অথচ উত্তরভারত বনাম বাঙলার এটাই ছিল এক বিশিষ্ট ঐতিহ্য। বাঙালী আজ পিঠের বদলে 'কেক'-এর ভক্ত হয়েছে।

পৌষপার্বণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা বাঙালী মেয়েদের পিঠে-তৈরির নৈপুণ্যে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের আবার পৌষপার্বণেই ফিরে আসা যাক। মাঠে সোনালী পাকা ধান বাঙালীর চিত্তকে উৎফুল্ল করে তোলে। এক শুভদিনে কৃষক নিজ ক্ষেত থেকে একমুঠো ধানের শিষ কেটে এনে একটুকরো কাপড়ে সেই ধানের শিষগুলোকে ঘরের একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখে। তারপর পৌষসংক্রান্তির আগের দিন মেয়েরা সেই শিষগুলোকে পূজা করে ও এক-একটা শিষে গেরো দিয়ে 'বাউনি' তৈরি করে। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্রের (যেমন খাট, বাক্স, চৌকি, সিন্দুক ইত্যাদি) এবং ধানের গোলা ও গোয়াল-ঘরে সেই 'বাউনি' রাখে ও বলে, 'আওনি বাউনি তিনদিন পিঠে-ভাত খাওনি'। মনে করা হয় 'বাউনি' শব্দটা 'বন্ধনী' শব্দের দেশজ অপভ্রংশ এবং লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখবার জন্য এককালে অনুষ্ঠিত কোন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার এটা স্মারক-চিহ্ন মাত্র।

নূতন ফসলকে আবাহন জানাবার জন্য মাত্র হিন্দুদের মধ্যেই এসব উৎসব পালিত হয় না। আদিবাসী-সমাজেও হয়। আমাদের প্রতিবেশী সাঁওতাল সমাজে অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত 'জান বাড়' পূজা, 'বাওয়াই' উৎসব, ল্যাপচাদের অনুষ্ঠিত 'নামবান' উৎসব প্রভৃতি তার নিদর্শন।

বাঙলাদেশের বাগদীদের অনুষ্ঠিত 'পৌষবুড়ীর' উৎসব যদিও 'পৌষ-পার্বণ' থেকে একটু অন্যরকমভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলেও এটা 'পৌষালি' উৎসবেরই একটা রকমফের মাত্র।

বাঙালী লোকজীবনে এসব উৎসব যে মাত্র কালোপযোগী উৎসব তা নয়। এসব উৎসব বিশেষ শুভদিনে পালিত হয়। কতকগুলি উৎসবের জন্য অবশ্য নির্দিষ্ট দিন আছে, যেমন 'পৌষপার্বণ' হয় পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা একটা শুভদিন। কেননা, পৌষ মাসের সংক্রান্তি হচ্ছে মকরসংক্রান্তির দিন। পূজা ও উৎসব শুভদিনে পালন করা উচিত, এ ধারণা বাঙালীর লৌকিক জীবনের ওপর জ্যোতিষিক প্রভাব সূচিত করে। লৌকিক ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে জ্যোতিষের প্রভাব, দাক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির ন্যায়, বাঙলার লোকসংস্কৃতিরও এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমে আমাদের সামাজিক জীবনের দিকে তাকানো যাক। সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় আগেকার দিনে কোষ্ঠী-ঠিকুজীতে সপ্তমঘরে কোন্ গ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন্ ঘরে আছে, তার বিচার করত। যদি সপ্তমঘরে মঙ্গল কিংবা অন্য কোন পাপগ্রহ থাকত, তবে সে-বিবাহ বর্জন করত। তারপর গণের মিল বা অমিলও দেখত। তাছাড়া, সব মাসে বা সব দিনে বিবাহ হয় না। এর জন্য শুভমাস, শুভদিন ও শুভলগ্ন আছে। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙালী জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আসে দ্বিরাগমনের ব্যাপার। বাঙালী পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিতা মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অনুষ্ঠান ছিল, যথা গর্ভাধান বা প্রথম রজঃদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠানের জন্যও পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করা হত।

উপনয়নের ক্ষেত্রেও বিবাহের মত পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসৃত হয়। এছাড়া আছে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এসবও পঞ্জিকা-অনুমোদিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালীর বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রপরিধান, রত্নধারণ, দেবগৃহারম্ভ, জলশয়ারম্ভ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, দেবতাগঠন, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, শিবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, রাজদর্শন, ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, আরোগ্যস্নান, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদি রোপণ, ধান্যরোপণ, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন, ধান্য-নিষ্ক্রমণ, নাট্যারম্ভ, নবান্ন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও আজকাল এসকল ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর দিন-ক্ষণ ছাখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত দিনগুলি দেখানো থাকে। এসকল দিন যে পঞ্জিকায় এখনও দেখানো হয়, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে একসময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিনক্ষণ দেখেই এসকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খাদ্যাখাদ্য ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত, এবং এখনও হয়। উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অনুসরণ করা হত, তা হচ্ছে—‘শোয়া ওঠা পাশ মোড়া। তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া॥ ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট। এ নিয়েই কাল কাট॥’ তার মানে শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের

শুক্লপক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী)—এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশিষ্ট দিন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এইসব জ্যোতিষিক অনুশাসন বা তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা (পরিশিষ্ট দেখুন) উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগে যুগে এগুলির ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এগুলি এসেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

বাঙালীর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ (taboos) আছে। অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন সধবা স্ত্রীলোকেরা মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবারের দিন হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন। ওইসকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিনও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না, যদিও পূর্ববঙ্গের লোকেরা বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওইদিন থেকে পুনরায় (বিজয়াদশমীর পর থেকে খাওয়া বন্ধ রাখে) ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু করে। দশহরার দিন একশো বছর আগে পর্যন্ত 'ফলার' আহার করবার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া, কোন কোন দিন ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। অরন্ধনের জন্য মেয়েরা প্রকাশ করত তাদের রন্ধনক্রিয়ার দক্ষতা। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হত। নানা পদের খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করে তাদের রসনার তৃপ্তিসাধন করা হত। ওইদিন তপ্ত খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না-করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী 'শীতলা, ষষ্ঠী' নামে আখ্যাত। ওইদিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। আগের দিন বেগুন, আলু ইত্যাদি সমেত মাষ-কলাই সিদ্ধ করা হয়। পরদিন সেই কলাই দইয়ের সঙ্গে খাওয়া হয়।

এছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ-খাওয়া নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে পঞ্জিকায় যে-সকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত আছে, তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আজ আর মানে না। আগেই বলেছি যে, সে-সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমিশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই-শাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাষকলাই। এগুলি থেকে বাঙালীর এককালের খাদ্যে তরিতরকারির একটা হদিস পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলি বিদেশী তরিতরকারি, মাত্র দু'তিনশত বৎসর আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। উপরে লিখিত তরিতরকারি ছাড়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্যমাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল।

আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাবই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতে আমরা সেই প্রভাবই লক্ষ্য করি। আগেই বলেছি, বাঙালী মেয়েদের জীবন শুরু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে। আগে আরও বলেছি, সামাজিক জীবনে মেয়েদের শাস্ত্র-বহির্ভূত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে, যেগুলিকে স্ত্রী-আচার বলা হয় এবং যেগুলির ওপর মেয়েরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় বিবাহের সময়। আগে রজঃদর্শন উপলক্ষেও সমারোহের সঙ্গে একটা উৎসব পালিত হত। কিন্তু আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশিবয়সে বিবাহ হয় বলে, সে উৎসব আর পালিত হয় না। তবে বিহার প্রভৃতি রাজ্যে এখনও মেয়েদের কমবয়সে বিবাহ হয় বলে এটা পালিত হয়। সে-সব জায়গায় এটাকে 'গৌনা' বলা হয়। যদিও শাস্ত্রীয়

অনুশাসন অনুযায়ী বারো বছরের পর মেয়েদের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর প্রয়োজন হয় না, তাহলেও লৌকিক আচার অনুযায়ী বাঙালী হিন্দু এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরে দ্বিরাগমন পালন করে। এটাকে 'ধুলো পায়ে দিন করা' বলা হয়। এক কথায়, এসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অভাব সত্ত্বেও লৌকিক সংস্কৃতির ওপর 'ট্র্যাডিশন' বা পরম্পরার প্রভাব জ্ঞাপন করে। তেমনই, যদিও আগেকার দিনে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পালিত অনেক শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গেছে, তা হলেও লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনও প্রচলিত আছে। প্রচলিত লৌকিক ব্রতগুলি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষরা নয়। এসমস্ত ব্রতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে। এসকল পূজার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অগ্রহায়ণ মাসে বাঙালী মেয়েদের ইতুপূজা ও সংলগ্ন বিহার রাজ্যে কার্তিক মাসে পালিত 'ছটপূজা'। লক্ষণীয়, এ দুটিই সূর্যপূজা। মনে হয় 'ইতু' শব্দ থেকেই সংস্কৃতে 'আদিত্য' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে এবং এটা উত্তরভারতে 'এতোয়ার' (রবিবার) শব্দে প্রতিফলিত হয়েছে। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সাহায্যে লক্ষ্মীপূজার কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা নিজেরাই প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী-পূজা করে ও ওই উপলক্ষে 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' পাঠ করে। মনে হয় এটাই লক্ষ্মীপূজার আদিম রূপ। অনুরূপভাবে মেয়েরা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে ও মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী পাঠ করে। নানা অঞ্চলে নানা নামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয় ; যথা—হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, ভাওতা মঙ্গলচণ্ডী, ভাদাই মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। দেবী-ভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে—মঙ্গলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃক পূজিতা দেবতা—'যোষিতানাম্ ইষ্টদেবতাম্'।

ষষ্ঠীর পূজার সঙ্গেও মেয়েদের সম্পর্ক দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল-

কামনায় ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আরাধ্যা দেবতা। সন্তানের মঙ্গলকামনায় নানা সময় এঁর পূজা করা হয়। সন্তানজন্মের ছয়দিনে ষেটেরা পূজা হয়। তাছাড়া, ছেলেমেয়ের যদি কোন বৈলক্ষণ্য দ্যাখে তো তিনবার 'ষাট, ষাট, ষাট' উচ্চারণ করে। একুশ বা ত্রিশদিনে ষষ্ঠীপূজা করার প্রথা আছে। মনে হয়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই ষষ্ঠী-পূজা প্রচলিত আছে, কেননা সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র মহেঞ্জোদারোয় আমরা এক দেবীর মূর্তি পেয়েছি যার কোলে এক শিশু উপবিষ্ট আছে। অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকাজে, সকল আনুষ্ঠানিক কাজের আগে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। তাছাড়া, বছরের বিভিন্ন মাসে নানা নামে ষষ্ঠীঠাকরুনের পূজা করা হয় ; যেমন বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্যষষ্ঠী (নামটা অর্থবাহক), আষাঢ় মাসে কার্দমী ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে নোটন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিক মাসে নাড়ি ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূলা ষষ্ঠী, পৌষ মাসে অন্ন ষষ্ঠী, মাঘ মাসে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গো ষষ্ঠী ও চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী। ষষ্ঠী তিথি ছাড়া, অন্য কোন দিনেও ষষ্ঠীপূজার প্রচলন আছে। যেমন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদে হরিষষ্ঠী, চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীলষষ্ঠী। নদীয়া জেলায় হরিষষ্ঠীতে কাঁচা ঘট পূজা করা হয়। নীলষষ্ঠীতে মেয়েরা উপবাস করে ও শিবের পূজা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। মেয়েরা মনে করে যে নীলের দিনই শিবের বিবাহ হয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা শ্রাবণ মাসের যে-কোন সোমবারে শিবের উপবাস করে, কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্মমাস। অরণ্যষষ্ঠী যে একসময়ে অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তা থেকেই তা প্রমাণ হয়।

বাঙলার দুটি জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব হচ্ছে জামাইষষ্ঠী ও ভাই-ফোঁটা। অরণ্যষষ্ঠীর দিনই জামাইষষ্ঠী। ওইদিন জামাইকে নিমন্ত্রণ

করে শ্বশুরবাড়ি আনা হয় ও শাশুড়ীঠাকরুন জামাইকে 'বাটা' প্রদান করে। এছাড়া, জামাইকে বিশেষ যত্ন করে আপ্যায়ন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসে, কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিন জামাই শ্যালক-সম্বন্ধীদের নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি নিয়ে যায় ও তাদের আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়ায়। বোন ওইদিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে যেন পড়ে কাঁটা।' জামাইষষ্ঠীতে জামাইকে 'বাটা'দান ও ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের কপালে ফোটা-দেওয়া সব বারে হয় না। কতকগুলো বার বর্জন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। মেয়েরাই এতে অংশগ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তাও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরা নিজেরাই করে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে, তা ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনো, এই নাম দুটি থেকেই প্রকাশ পায়।

বাঙালী হিন্দু বিধবাদের অবশ্যপালনীয় একটা ব্রত হচ্ছে অম্বুবাচী। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিনদিন অম্বুবাচীর কাল ধরা হয়। এই তিনদিন কোন বিধবা রন্ধন করে না ও অগ্নিপক্ক কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অম্বুবাচী মানে বর্ষার সূচনা। নববর্ষাকে অভি-নান্দত করবার জন্য এই তিনদিন চাষবাস বন্ধ রাখা হয়। বলা হয়, এই তিনদিন পৃথিবী রজঃস্বলা হয়। ওড়িশায় অম্বুবাচী বহুল প্রচলিত। সেখানে অম্বুবাচীকে 'রজ-উৎসব' বলা হয়। অম্বুবাচী উপলক্ষে ওড়িশায় অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে।

বাঙলা নদীবহুল দেশ। সেজন্য বাঙলার লৌকিক জীবনে নদীর প্রভাব খুব বেশি। নদীর দেশে বাস করে বলেই বাঙালী মাছ খায় ও সধবা মেয়েরা হাতে শাঁখা পরে। নদীই বাঙালীকে জগতের শ্রেষ্ঠ

নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালীকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী অতিক্রম করে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। নদীই বাঙলাকে শস্য-শ্যামলা করে তুলেছিল।

যখন আমরা চিন্তা করি যে, বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এজন্য বাঙলাদেশের সকল জাতির লোক (ব্রাহ্মণ পর্যন্ত) কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। বাঙলার কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। সেজন্যই এর আগে আমরা ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি পূজাচার ও উৎসব বাঙালীর লৌকিক জীবনে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, সে কথা উল্লেখ করেছি। ধানচাল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, মুড়ি, খই, চিঁড়ে ইত্যাদি রূপে), তা নয়, তার দেবতাকেও সে নিবেদন করে। অস্ট্রিক সমাজের লোকেরাও তাই করে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ধানের চাষ অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের দান। বাঙালীর পূজাচারে চাল-কলা না হলে ঠাকুরের নৈবেদ্যই হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই দেখেছি নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পালপার্বণও চালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার, এই চালের পিটুলি তৈরি করে বাঙালী মেয়েরা তাদের নান্দনিক মননশীলতা প্রকাশ করে আলপনা-রেখাচিত্রে। লক্ষ্মীপূজাও ধানের পূজা।

কদলী বা কলাও অস্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। সেজন্য বাঙালী কলা নিবেদন করে তার দেবতাকে। আখের চাষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলাদেশেই হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মাত, যার নাম ছিল 'পৌণ্ড্রক'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্যত্রও উৎপন্ন হয়, এবং তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুড়ি' ও 'পৌড়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'গুড়' শব্দটাও 'গৌড়' শব্দ থেকে উদ্ভুত। পাণিনি বলেছেন—'গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়ঃ'।

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী

নানারূপ যন্ত্রাদি তৈরি করা হত। তাম্রাশ্মযুগে এসব যন্ত্রপাতি তামা বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ-উৎপাদন হত। এসকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এইসকল অঞ্চলের লোকেরা লৌহ-উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দেশজ প্রণালীতে লৌহ-উৎপাদন হত। তা দিয়ে মুঘল ও ইংরেজ আমলে কামান তৈরি হত। বিষ্ণুপুরের 'দলমাদল' কামান তার নিদর্শন। বস্তুত ধাতুশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদের ধাতুশিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্যে, স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে ও কাংস্যশিল্পের উৎকর্ষে।

বাঙালীর আরও অনেক লৌকিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি বহন করত বাঙালী মনীষার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। ঘরে ঘরে সূতা কাটা হত। মাটির দেশ বাঙলার মাটি দিয়ে তৈরি করা হত পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অসামান্য সজীবতা। এই শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বাঙালীর প্রতিমা-গঠন ও পোড়ামাটির মন্দিরালঙ্করণ, যাতে রূপায়িত হয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। পটচিত্রও বাঙলার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদান। পটে চিত্রিত করা হত নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মূর্তি, পাপ-পুণ্যের পরিণাম ও নানারকম নৈসর্গিক বিষয়বস্তু। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মীসরা ও মনসার চালি তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও সর্পদেবতা মনসার পূজা করত। 'ছউ'নাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা আরও প্রকাশ পেত শাঁখের ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারে, শোলার কাজে, কাঠ-খোদাইয়ের কাজে ও আরও কত কি

শিল্পে যা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সার্থক করে তুলত। মেয়েদের অনুশীলিত আলপনা, কেশবিন্যাস ও নকশীকাঁথা ইত্যাদিও বহন করত তাদের সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর। বস্তুত বাঙালীর লৌকিক শিল্পসমূহে অনুরণিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্যা। (লেখকের 'ফোক্ এলিমেণ্টস ইন বেঙ্গলী লাইফ' দ্রষ্টব্য)।

অস্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। এখনও বাঙালী যদি ছাখে রাস্তার তেমাথায় কেউ রেখে গিয়েছে সরায় করে জবাফুল ইত্যাদি, তা হলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। শনি-মঙ্গলবার রাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছ বা বেলগাছের তলা দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস, অপদেবতার দৃষ্টি লাগবে। গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে 'নিশিডাক'-এ। সেজন্য রাত্রিকালে কেউ কারো নাম ধরে তিনবারের বেশি না ডাকলে, কখনও উত্তর দেয় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে 'বাছুলে' (বৃষ্টির দিন যার জন্ম) ছেলেমেয়ের বিয়েব দিন নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। সেজন্য পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়, সেজন্য বৃষ্টি এড়াবার জন্য মেয়েরা বাটনাবাটার শিল উলটো করে উঠানে স্থাপন করে। আর তা নয়তো কারো বাড়ি থেকে একটা তৈজসপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস এরূপ করলে, আর বৃষ্টি হবে না। বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিশ্বাস করে যে কারো নজর লেগেছে এবং তার জন্য জলপড়া খাওয়ায়। এছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে ভূতপ্রেতের ভয়ও বিলক্ষণ। রাত্রিকালে আলগা জায়গায় কখনও ছেলেমেয়েদের জামা-কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না, পাছে অপদেবতার নজর লাগে। তাছাড়া, 'ভূতে-পাওয়া' ব্যাপারও আছে। ভূতে পেলে 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা' ভূত ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে 'রোজা', 'গুণিন' ইত্যাদির ভূমিকা একসময় খুব

বেশি ছিল। যাঁরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছেন, তাঁরা জানেন ঠক-চাচা এ-বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সাপে কামড়ালেও 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা'র ক্ষমতা আছে সাপের বিষ ঝাড়াবার। শুনেছি, যে সাপ লোকটাকে কামড়েছে, সেই সাপটা নাকি 'রোজা'র সামনে এসে হাজির হয়। এছাড়া, কিছু চুরি গেলে, বাঙালী বাটিচালা, চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালার বাটি নাকি অপরাধীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। চালপড়াতে যে চুরি করেছে তার থুতুর সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়। নখদর্পণে কালি-লাগানো বুড়ো আঙুলের নখে অপরাধীকে দেখা যায়।

এছাড়া, বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেত, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে পায়—বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস। এসবের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করা আছে আমার 'ফোক এলিমেণ্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ' গ্রন্থে (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৭৪)। এসব মন্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সব প্রাক্-আর্যকালের।

আর্য-পুরোহিতরাও কোন কোন ক্ষেত্রে আদিম যুগের এসব প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেছিল। সেটা, 'অথর্ববেদ' পড়লে বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এছাড়া, বিরুদ্ধ গ্রহের প্রশমনের জন্য কয়েকটি গাছের মূল, ধাতু ও রত্নও ব্যবহার করা হয়; যেমন—বিরুদ্ধ সূর্যের জন্য বিল্বমূল, চন্দ্রের জন্য ক্ষীরিকামূল, মঙ্গলের জন্য অনন্তমূল, বুধের জন্য বিষধড়কের মূল, বৃহস্পতির জন্য বামনহাটির মূল, শুক্রের জন্য রামবাসকের মূল, শনির জন্য শ্বেতবেড়েলার মূল, রাহুর জন্য শ্বেতচন্দনের মূল ও কেতুর জন্য অশ্বগন্ধার মূল সুতা দিয়ে বেঁধে ডানদিকের ওপর-হাতে ধারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতু অনুরূপভাবে ধারণ করে; যেমন—সূর্যের জন্য তামা, চন্দ্রের জন্য শঙ্খ (হাতের আঙুলে আংটিরূপে),

মঙ্গলের জন্য প্রবাল, বুধের জন্য স্বর্ণ, বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য হীরা, শনির জন্য সীসা, রাহুর জন্য লৌহ ও কেতুর জন্য রারিয়াটি পাথর ধারণ করে। আবার রত্নের দিক দিয়ে সূর্য বিরুদ্ধ হলে চুনি, চন্দ্রের জন্য 'ক্যাটস্-আই', মঙ্গলের জন্য প্রবাল, বুধের জন্য পোখরাজ, বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য হীরা, শনির জন্য নীলা, রাহুর জন্য গোমেদ ও কেতুর জন্য পান্না ধারণ করে।

কতকগুলি বীজমন্ত্র নির্দিষ্টসংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুলির কোনটাই যে মৌলিক আর্যসংস্কৃতির অবদান নয়, তা এই বীজমন্ত্রগুলির ভাষা থেকেই বুঝতে পারা যায়। যেমন, রবির 'ওঁ হ্রীং সূর্যায়', চন্দ্রের 'ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়', মঙ্গলের 'ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়', বুধের 'ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রাং বুধায়', বৃহস্পতির 'ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে', শুক্রের 'ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়', শনির 'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়', রাহুর 'ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে' ও কেতুর 'ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে'।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এইসকল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অনুসৃত 'সদৃশবিধানী' ও 'সংস্পর্শবিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুলসীর প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। এ-সম্পর্কে একটা বিধিনিষেধের (taboo) কথা বলি। সধবা মেয়েরা পূজার জন্য তুলসীপাতা তোলে না। কেন? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে তুলসীর সতীত্বনাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিকে 'নষ্টচন্দ্র' বলা হয়। ওইদিন চাঁদ-দেখা নিষিদ্ধ, কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ওইদিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিল। ওইদিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে। কেউ এটা দোষ মনে করে না।

আগে কার্তিক মাসে 'আকাশপ্রদীপ' দেওয়ার রীতি ছিল।

এখন শহরে এটা উঠে গেছে। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও আছে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে ভেলার ওপর বা কাগজের তৈরি নৌকায় প্রদীপ জ্বেলে মেয়েরা সেটা জলে ভাসিয়ে দেয়। একে 'সোদো' (বোধ হয় 'সহোদর'-এর অপভ্রংশ) পূজা বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীন কালে বাঙালী বণিকরা যখন বাণিজ্যে বেরোত তখন তাদের মঙ্গলকামনায় সহোদরারা এই পূজা করত।

মুর্শিদাবাদে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে 'ব্যারা' বা ভেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলাগাছের বিরাট ভেলা রং-বেরং-এর কাগজ ও প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত করে জলে ভাসানো হয়। লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পূর্বতীরে এই উপলক্ষে সমবেত হয়। আদিতে এগুলি সব ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ছিল বলে মনে হয়।

সবশেষে কয়েকটি লৌকিক দেবতার কথা বলব। এদের মধ্যে আছে রক্ষাকালী, ওলাইচণ্ডী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, বারামূণ্ড, কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তুঠাকুর, দক্ষিণরায়, টুসু, ভাদু, একাচুরা. বরকুমার, লালমা, বিশ্বেশ্বর, খলকুমারী, গোরক্ষনাথ, সোনারায়, ইটাকুমার, সাঁজুই, তোষালি, অন্ধেশ্বরী, দক্ষিন্দর, ঝোলা, ভাদালি. সুডাই, হুড়ুমদেও, হুড়কামড়কা, বারুক, কান্দারী প্রভৃতি।

পল্লীর জনগণের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ করে মহামারীর সময় রক্ষাকালীর পূজা করা হয়। গভীর রাত্রে পূজা সমাপ্ত করে, প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। কখনও কখনও এর পূজা শ্মশানে হয়। তখন একে শ্মশানকালী বলা হয়। ওলাইচণ্ডী ওলাউঠার দেবী। অনেক জায়গায় ওলাইচণ্ডী ও কালী অভিন্ন বলা হয়। তবে নানা জায়গায় এক সিঁদুর-লেপা পাথরের গোলারূপী ওলাইচণ্ডীর মন্দির আছে। লোকে সেখানে ওলাইচণ্ডীর পূজা দেয়। মেয়েরা বছরে একদিন ওলাইচণ্ডীতলায় গিয়ে, পূজান্তে সেখানে রান্না করে খায়। শীতলা বসন্তের দেবতা। বসন্তকালে বসন্তের হাত থেকে

পরিত্রাণ পাবার জন্য লোক নিজ পল্লীতে প্রতিমা এনে সমারোহের সঙ্গে শীতলার পূজা করে। তাছাড়া, এখানে-সেখানে শীতলার মন্দিরও আছে। বাড়ির কেউ বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে, লোকে ডাক্তারী চিকিৎসার পরিবর্তে শীতলামন্দির থেকে শীতলার চরণামৃত জল এনে খাওয়ায়। তাতেই রোগী ভালো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় দীঘার সন্নিকটে রামনগর গ্রামে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে মহাসমারোহের সঙ্গে শীতলার পূজা হয়। লোকে বলে তারা নাকি দেখেছে যে গভীর রাত্রে সপ্তযোগিনী ও ৬৪ ডাকিনী এসে মাকে সাহচর্য দেয়। খুলনা জেলায় পোদ জাতির লোকেরা শীতলাকে মাত্র বসন্তের দেবী হিসাবে মনে করে না, তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেও। যখন তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায় বা কেউ ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তারা ভাবে যে শীতলা তাদের ওপর রুষ্ট হয়েছে। ঘণ্টাকর্ণকে শীতলার স্বামী বলে গণ্য করা হয়।

বারা ধড়হীন মনুষ্যমূর্তি। বারার পূজা হয় চব্বিশ-পরগনায় পৌষ-সংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ 'আশ্বিন' দিনে—বনে বা নদীর ধারে বা গাছতলায় বা ক্ষেতের আলে। অনেক জায়গায় এক পুরুষ-বারার পাশে এক জলঘটকে স্ত্রী-বারার প্রতীক হিসাবে রাখা হয়। আবার অন্যত্র স্ত্রী-পুরুষ যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। এটা যে যাতুমন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক উর্বরতা বা সুফলনবর্ধক পূজা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণরায়ের বারা-ই বিশেষভাবে খ্যাত। এর পূজা দক্ষিণ বাঙলায়, বিশেষ করে চব্বিশ-পরগনা ও হাওড়া জেলায় নিবদ্ধ। তবে খুলনা, যশোহর ইত্যাদি জেলাতেও বারার প্রচলন আছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই লৌকিক দেবতার মৌলিক পরিচয় অজ্ঞাত। তবে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা।

অনেকে আবার বলেন, তিনি বুদ্ধ বা শিব। তিনি নিরাকার। সেজন্য শিলারূপেই তিনি পূজিত হন। তবে তিনি যে আদিম সমাজের দেবতা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা ডোমজাতীয় লোকেরাই ধর্ম-ঠাকুরের পুরোহিত। তাছাড়া, ধর্মঠাকুরের উৎসবে কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। তবে হিন্দুপ্রভাবে কোন কোন জায়গায় এখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরাও ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। যেখানে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির আছে, সেখানে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা হয়। তা না হলে, বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও শিবের গাজনের মত ধর্মঠাকুরের গাজন হয়। ওই সময়ে ভক্তেরা ধর্মঠাকুরের 'সন্ন্যাসী' হয়, ও কৃচ্ছ্রসাধন করে। বলা হয় ধর্মঠাকুর পুত্রসন্তানদাতা ও মানুষকে কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাময় করেন। এঁকে বাবাঠাকুরও বলা হয়।

বাস্তুঠাকুর নানা নামে খ্যাত—যথা বাস্তুদেব, বাস্তুপুরুষ, বাস্তুপাল, বাস্তুরাজ ইত্যাদি। ইনি মানুষের গৃহ বা বাস্তুর দেবতা। নানা সময়ে নানা উপলক্ষে এঁর পূজা হয়। তবে একসময় পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে ঘরে ঘরে বাস্তুপূজার লৌকিক অনুষ্ঠান হত। বাস্তুঠাকুর সিংহিকার পুত্র, কৃষ্ণবর্ণ, অসুরাকৃতি, মহাকায় ও উগ্র। বাস্তুঠাকুরের পূজায় ছাগ ও মাটির তৈরি কুমীরের মূর্তিও বলি দেওয়া হত। বাখরগঞ্জ জেলায় বাস্তুপূজা প্রসঙ্গে কুলাইপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি ব্যাঘ্রবাহনা, অনেকাংশে জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার মত। প্রতিমার দুই পাশে দুটি কুমীর ও দুটি বাঘের মূর্তি থাকে। বাস্তুঠাকুরের সঙ্গে কোকিলাক্ষ, শঙ্খপাল, বঙ্কপাল ও ক্ষেত্রপালের পূজা হয়। কোকিলাক্ষ বাঘের ওপর উপবিষ্ট দেবতা। এঁর পূজায় কচ্ছপ বলি দেওয়া হয়। শঙ্খপালও বাঘের ওপর উপবিষ্ট দেবতা। এঁর চোখ পিঙ্গলবর্ণ ও হাতে শূল। বঙ্কপাল ভীষণনয়নবিশিষ্ট ও লোকবিঘ্ননাশক। ক্ষেত্রপাল শিবের ছেলে, পিঙ্গল-কেশধারী, উগ্রদন্ত, ভুজঙ্গভূষণ ও দিগম্বর।

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে পঞ্চানন বা পাঁচুঠাকুর খুব প্রসিদ্ধ।

নানা জায়গায় পঞ্চাননতলায় পঞ্চাননের মন্দির আছে। পঞ্চানন শিশুদের মঙ্গল করেন। সন্তানকামনায় অনেকে পঞ্চাননের 'দোর ধরেন'।

বয়্যাল দেবতার ভয়ঙ্কর মূর্তি। ছেলেরা এই দেবতাকে দেখলে ভয় পায়। সকল রোগের উপশম কামনায় তাঁর পূজা দিয়ে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

জয়দুর্গাও ভীষণাকৃতি দেবতা। এঁর পূজার রীতিনীতিও বীভৎস। সাধারণত এঁর কোন পূজানুষ্ঠান হয় না। তবে কোথাও কোথাও বিপত্তারিণী ব্রত (আষাঢ় মাসে রথযাত্রার অব্যবহিত পরে শনি বা মঙ্গলবারে এই ব্রত হয়) বা শুবচনী ব্রতের সঙ্গে এঁর পূজা হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন জায়গায় শেওড়াগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বনদুর্গার পূজার প্রচলন আছে। তবে উল্লেখনীয় যে, জয়দুর্গা ও বনদুর্গার কোন প্রতিমা তৈরি হয় না। মাত্র ধ্যানের সাহায্যে পূজা হয়।

জাতাপহারিণীর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করা হয় না। নিবেদিত সব জিনিসই পূজার স্থানে রেখে দেওয়া হয়। বলির পাঁঠাও জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

জ্বরের প্রকোপের জন্য জ্বরাসুরের পূজা করা হয়। তাঁর তিন মাথা, তিন পা, ছয় হাত ও নয় চোখ। বর্ণ কাজলের মত কালো। ইনি কালান্তক যমের তুল্য ও মৃত্যুর কারণ।

এইসব লৌকিক দেবতা ছাড়া, আরও লৌকিক দেবতা আছে; যেমন—চৈত্রসংক্রান্তিতে পূজিত কৃষ্ণকুমার ও কালকুমার, ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে পূজিত ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু, রক্তমাদ্রী, জলকুমার, হ্যাচড়া-প্যাচড়া, ডাঙ্কুর, শোঘট্ট ইত্যাদি।

টুসুর পূজা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। বস্তুত পুরুলিয়া-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের লোকদের কাছে টুশুর চেয়ে বড় উৎসব সারা বছরে আর কিছু নেই।

কুমারী মেয়েরাই টুসু উৎসবের প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী। টুসুর উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে শুরু হয় ও পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে শেষ হয়। টুসুপূজার জন্য কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মেয়েরাই মহা আনন্দের সঙ্গে এ-পূজা সম্পূর্ণ করে। প্রত্যেক বাড়িতেই সন্ধ্যেবেলা টুসুগানের আসর বসে। গানের মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার কথা প্রকাশ করে।

টুসুর প্রতীক হচ্ছে টুসুর চৌডল বা চতুর্দোলা। এগুলো রঙিন কাগজ দিয়ে খুব হালকা ধরনে তৈরি করা হয়, যাতে যে-কোন মেয়ে এটা সহজে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। টুসু উৎসবের চরম পরিণতি হয় পৌষসংক্রান্তির দিন। সেটাই হচ্ছে নিকটস্থ জলাশয় বা নদীতে টুসুভাসান দেবার দিন। ভাসান উপলক্ষে মিছিল বেরোয়, এবং সকলে টুসুর গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। মানভূমের মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেরা টুসুর উৎসবের দিন খিচুড়ি ও খাসির মাংস খায়। সেদিন সব বাড়িতে তৈরি হয় নতুন চালের তৈরি পিঠে ও নারকেলের পুর দেওয়া নানারকম মিষ্টান্ন, যেরকম বাঙলাদেশের অন্যত্র পৌষপার্বণে বা পৌষালিতে তৈরি হয়। অনেকে মনে করেন, ধানের তুষ থেকে টুসু শব্দের উদ্ভব।

পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় সমগ্র ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব হয়। লোককাহিনী অনুযায়ী পঞ্চকোটের এক রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর (ডাকনাম ভাদু) এই উৎসব প্রবর্তিত করেছিল। এটাও কুমারী মেয়েদের উৎসব এবং বাগদী, বাউরি, ডোম ও আদি-বাসী সমাজে এর প্রচলন বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সারা ভাদ্র মাস লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে এ-উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মাটির ভাদুমূর্তি তৈরি করা হয়। মূর্তি হেমবর্ণা, ক্ষুদ্রাকৃতি ও পদ্মের ওপর উপবিষ্টা বা দণ্ডায়মানা। ভাদুর পূজার জন্যও

ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ভাসানের আগের রাত্রিকে 'জাগরণ' বলা হয়। সেদিন উদ্দাম নাচগান চলে এবং মেয়েপুরুষ সকলে অবাধে মেলামেশা করে।

বলা বাহুল্য, এসব উৎসব আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছে এবং লোকসমাজে হিন্দুর জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

লোকায়ত দেবদেবীর উপাখ্যান

যত দেবতা তত কাহিনী। সব দেবতার কাহিনী এখানে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকটি লৌকিক দেবতাকে নিয়ে মধ্যযুগে এক বিরাট বাংলা-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। তবে এখানে যাদের কথা বলছি, তারা সে-সাহিত্যের বাইরে।

প্রথমেই ধরুন 'লক্ষ্মীর কথা'। একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর লোকেরা কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন। লক্ষ্মীঠাকরুন তাঁকে ধরে বসলেন যে তিনিও সঙ্গে যাবেন। তাঁকে সঙ্গে নিতে নারায়ণ এক শর্তে রাজী হলেন। শর্তটা হচ্ছে এই যে, ধরাধামে অবতরণের পর লক্ষ্মীঠাকরুন উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে আসবার পর লক্ষ্মীঠাকরুনের কৌতূহল হল, নারায়ণ তাঁকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করলেন কেন, ওদিকে কী আছে তা তিনি দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরদিকে তাকালেন, এবং তাঁর চোখে পড়ল এক তিল-ক্ষেত। তিলের ফুল তাঁর মনোহরণ করল, এবং তিনি রথ থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ফুল তুলে আনলেন। নারায়ণ যখন ফিরে এসে লক্ষ্মীর এই কাণ্ড দেখলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীকে বললেন— 'এজন্যই আমি তোমাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করেছিলাম; তুমি কি জান না যে, ক্ষেত্রস্বামীর বিনা অনুমতিতে তার ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলা পাপ? এখন তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তিন বছর ওর গৃহে থেকে দাসীবৃত্তি করে।' তাবপর নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে, ক্ষেত্রপতির গৃহে এসে বললেন—'ছাখো, এই স্ত্রীলোক তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ক্ষেত থেকে তিল-ফুল তুলেছে, এজন্য ওকে তিন বছর তোমার গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে, তবে ওকে কখনও উচ্ছিষ্ট খাদ্য দেবে না, ঘর ঝাঁট দিতে দেবে না এবং

অপরের পরা ময়লা কাপড় কাচতে দেবে না।' এই কথা বলে নারায়ণ চলে গেলেন। ক্ষেত্রস্বামী নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে অত্যন্ত দরিদ্র। স্ত্রী ছাড়া, তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও এক পুত্রবধূ ছিল। তাঁদের নিজেদেরই খাওয়া জোটে না, তারপর আর একজনকে খাওয়াতে হবে এই ভেবে ব্রাহ্মণগৃহিণী খুব চিন্তিত হলেন। তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—'মা, আমরা খুবই গরীব, আমাদের ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই, তিন ছেলে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, যদি কিছু যোগাড় করে আনতে পারে, তবেই আজ আমাদের খাওয়া হবে।' লক্ষ্মী দেখলেন ব্রাহ্মণগৃহিণী শতচ্ছিন্ন এক মলিন কাপড় পরে আছেন। তাই দেখে লক্ষ্মীঠাকরুনের দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন—'চলো তো মা, গিয়ে দেখি কেমন তোমার ঘরে কিছু নেই?' যখন ব্রাহ্মণগৃহিণী লক্ষ্মীঠাকরুনকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তখন তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে ঘর ভরতি রয়েছে চাল ডাল, নুন, তেল, ঘি ইত্যাদি, এবং আলনায় ঝুলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়। এই দেখে বাড়ির সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ভাবল এই স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কোন দেবী হবেন। লক্ষ্মীকে কিছু না বলে, তারা মনে মনে তাঁকে প্রণাম করল।

সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঐশ্বর্য বাড়তে লাগল, এবং তারা লক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হল।

তিন বছরের শেষে একদিন গঙ্গায় পুণ্যস্নানের দিন এল। ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গাস্নানে যাবেন। তাঁরা লক্ষ্মীকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। লক্ষ্মী বললেন—'আমি যাব না, তবে আমি এই কড়ি-পাঁচটা দিচ্ছি, তোমরা আমার নাম করে এই কড়ি-পাঁচটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।' গঙ্গাস্নান সারবার পর ব্রাহ্মণ-গৃহিণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মী তাঁকে পাঁচটা কড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জন্য। তিনি কড়ি-পাঁচটা আঁচল থেকে খুলে যেমনি গঙ্গায় ফেলে দিলেন, দেখলেন যে, মা-গঙ্গা নিজে মকরে চেপে এসে কড়ি-পাঁচটা নিয়ে

গেলেন। এই দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে একখানা রথ দাঁড়িয়ে আছে। রথের ভেতর একজন ব্রাহ্মণ রয়েছেন, আর লক্ষ্মী এক পা রথে ও এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই দেখে ব্রাহ্মণী লক্ষ্মীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'মা, তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি, আমাদের যা কিছু দোষ-ত্রুটি হয়েছে আমাদের মাপ কর, আমাদের ছেড়ে তুমি যেয়ো না।' লক্ষ্মী বললেন, 'মা, আমার তো আর থাকবার উপায় নেই, তোমাদের বাড়ি দাসী হিসাবে থাকবার আমার তিন বছরের মেয়াদ ছিল, আজ তিন বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, নারায়ণ এসেছেন আমাকে গোলোকে নিয়ে যাবার জন্য।' তিনি আরও বললেন—'তোমরা মনে ব্যথা পেয়ো না, বাড়ির পিছনে বেলগাছের তলায় গিয়ে খুঁড়লে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে; আর ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীর পূজা করবে; তা হলে তোমরা সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হবে।'

বেলগাছের তলা খুঁড়ে তারা যে ধনরত্ন পেল, তা দিয়ে তারা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল ও দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ছেলেমেয়ে, জামাই ও পুত্রবধূ নিয়ে সুখে দিন কাটালো। এইভাবে ধরাধামে লক্ষ্মীপূজার প্রবর্তন হলো।

এবার জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রবর্তনের কাহিনীটি বলি। কোন এক দেশে দুই বণিক ছিল। একজনের সাতটি মেয়ে; আর অপরজনের সাতটি ছেলে। একবার মঙ্গলচণ্ডী ভিখারিনী ব্রাহ্মণীর বেশে প্রথম বণিকের বাড়ি ভিক্ষার জন্য আসেন। বণিকপত্নী ভিক্ষা দিতে এলে, মঙ্গলচণ্ডী বললেন—'মা, তুমি অপুত্রক, তোমার হাতে আমি ভিক্ষা নেব না।' ভিখারিনী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বণিকপত্নী তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে। মঙ্গলচণ্ডী তাকে একটা শুকনো ফুল দিয়ে বললেন—'এই ফুল জলে গুলে প্রত্যহ তুমি খাবে, তাহলে তোমার ছেলে হবে এবং ছেলের নাম রাখবে জয়দেব।' তারপর মঙ্গলচণ্ডী দ্বিতীয়

বণিকের বাড়ি গেলেন এবং বণিকপত্নীর মেয়ে-সন্তান নেই বলে তার হাত থেকে ভিক্ষা নিলেন না। বণিকপত্নী তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, তাকেও মঙ্গলচণ্ডী একটা শুকনো ফুল দিলেন এবং বললেন—'মেয়ে হলে তার নাম রাখবে জয়াবতী।' এর ফলে দুই বণিকপত্নীরই যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে হল।

জয়দেব একটা পায়রা নিয়ে খেলা করত, আর জয়াবতী ফুল তুলে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত। একদিন জয়দেবের পায়রাটা উড়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে বসল। জয়দেব পিছনে পিছনে এসে জয়াবতীর কাছ থেকে পায়রাটা ফেরত চাইল। জয়াবতী দিতে অস্বীকার করল। জয়দেব বলল—'আমি তোমার পূজার সমস্ত সামগ্রী ভেঙে দেব।' জয়াবতী বলল—'আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করছি, আর তুমি আমার পূজার উপকরণ নষ্ট করতে চাও?' জয়দেব জিজ্ঞাসা করল—'মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলে কি হয়?' জয়াবতী বলল—'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করলে আগুনে কিছু পোড়ে না, জলে কিছু ডোবে না, নষ্টজিনিস উদ্ধার হয়, কেউ তাকে তলোয়ার দিয়ে কাটতে পারে না, মরে গেলে, সে আবার জীবন ফিরে পায়।'

কিছুকাল পরে স্বপ্নে মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে জয়দেবের সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে হল। জয়দেব যখন জয়াবতীকে বিয়ে করে নৌকা করে ফিরছিল, জয়াবতীর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেটা জয়মঙ্গলবার। জয়াবতী তাড়াতাড়ি মঙ্গলচণ্ডীর একটা শুকনো ফুল গিলে ফেলল এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করল তার ত্রুটি যেন তিনি মার্জনা করেন। জয়দেবের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল, মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জয়াবতী তাকে যা বলেছিল। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে বলল —'এখানে বড় দস্যুর ভয়, তুমি তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে ফেলে, একটা পোঁটলা করে আমাকে দাও।' জয়াবতী এরূপ করলে, জয়দেব পোঁটলাটা জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বোয়াল মাছ এসে

সেটা গিলে ফেলল।

বরকনে বাড়ি এলে, অত বড় ধনীর মেয়েকে নিরাভরণা দেখে সকলেই নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। জয়াবতী চুপ করে রইল। বউভাতের দিন একটা বড় বোয়াল মাছ আনা হল। জেলে মাছটা কাটতে পারল না। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে মাছটা কাটতে বলল। জয়াবতী রাজী হল, তবে বলল যে, সে পরদার আড়ালে বসে মাছটা কাটবে। পরদার আড়ালে গিয়ে জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করল। মঙ্গলচণ্ডী আবির্ভূতা হয়ে মাছটা কেটে ফেললেন, এবং মাছটার পেট থেকে তার অলঙ্কারের পোঁটলাটা বের করে তার হাতে দিলেন। জয়াবতী যখন অলঙ্কার পরে পরদার ভেতর থেকে বেরোল, তখন সকলে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর অত মাছ কেউ রাঁধতে পারল না। তা-ও জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর সাহায্যে রাঁধল।

তারপর জয়াবতীর এক সন্তান হল। জয়দেব আবার পরীক্ষা করবার জন্য ছেলেটাকে কুমোরদের ভাঁটির মধ্যে রেখে এল। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী এসে জয়াবতীর কোলে তার সন্তানকে দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন জয়দেব ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দিল। আবার মঙ্গলচণ্ডী ছেলেটাকে এনে জয়াবতীর কোলে দিয়ে গেলেন এবং বললেন ভবিষ্যতে যেন সে ছেলের সম্বন্ধে সাবধান হয়। একদিন জয়দেব ছেলেটাকে কেটে ফেলতে যাচ্ছে, এমন সময় জয়াবতী দেখতে পেয়ে, জয়দেবকে বলল—'তুমি এখনও মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় বিশ্বাস করছ না?' জয়দেব বলল—'হাঁ, এখন আমি বিশ্বাস করি।' এইভাবে জয়মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রবর্তন হল।

অরণ্যষষ্ঠীর পূজার প্রবর্তন সম্বন্ধে যে কাহিনীটা আছে, তা হচ্ছে—এক ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ ছিল। ছোটবউটা খুব পেটুক ছিল, এবং খাদ্যসামগ্রী লুকিয়ে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিত।

বিড়াল হচ্ছে মা-ষষ্ঠীর বাহন। মিছামিছি তার নামে দোষ দেয় বলে, সে মা-ষষ্ঠীর কাছে গিয়ে ছোটবউয়ের নামে নালিশ করল।

কালক্রমে ছোটবউ অন্তঃসত্ত্বা হল, এবং যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু সকালবেলা কেউ আর ছেলেটাকে তার কাছে দেখতে পেল না। এইভাবে তার সাতটা সন্তান হল, কিন্তু রাত্রিকালে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কেউ আর ছেলের সন্ধান পায় না।

মনের দুঃখে ছোটবউ বনে গিয়ে কাঁদতে লাগল। সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ষষ্ঠীঠাকরুন আবির্ভূতা হয়ে ছোটবউকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি বনে এসে কাঁদছ কেন মা?' ছোটবউ তাঁকে তার সব দুঃখের কথা বলল। তখন ষষ্ঠীঠাকরুন রুষ্টকণ্ঠে তাকে বললেন—'তুই জানিস্ না, চুরি করে খাস্, আর ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালের নামে দোষ দিস্?' তখন ছোটবউ বুঝতে পারল ওই ব্রাহ্মণী কে, এবং তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ষষ্ঠীদেবীর দয়া হল। তিনি বললেন—'ছাখ্, ওখানে একটা মরা বিড়াল পড়ে আছে, এক ভাঁড় দই এনে ওর গায়ে ঢেলে দে, এবং চেটে তা ভাঁড়ে তোল।' ছোটবউ ষষ্ঠীর আদেশ-মত ওইরূপ করলে, ষষ্ঠীঠাকরুন তাকে তার সাত ছেলে ফিরিয়ে দিলেন ও তাদের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন, 'কখনও চুরি করে কিছু খাস্ না। আর বিড়ালকে কখনও লাথি মারবি না, এবং বাঁ হাত দিয়ে কখনও ছেলেকেও মারবি না, বা "মরে যা" বলে কখনও ছেলেকে গাল দিবি না।' অরণ্যষষ্ঠীর দিন কি ভাবে ষষ্ঠীপূজা করতে হয়, সে-সম্বন্ধেও তিনি উপদেশ দিলেন। আরও বললেন—'অরণ্যষষ্ঠীর দিন ফলার করবি, কখনও ভাত খাবি না।' তারপর ষষ্ঠীদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবউ সাত ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল এবং সব কথা নিজের জায়েদের বলল। সকলেই সেই থেকে অরণ্যষষ্ঠীর পূজা আরম্ভ করল।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার মেয়েরা ইতুপূজা করে। ইতুপূজার কথা তারা যা বলে তা হচ্ছে—কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুই মেয়ে ছিল, নাম উমনো ও ঝুমনো। ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল এনে ব্রাহ্মণীকে বললেন তাকে পিঠে তৈরি করে দিতে। এক-একটা পিঠে তৈরি হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসে একগাছা দড়িতে একটা করে গেরো দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণকে যখন পিঠে দেওয়া হল, তখন তিনি দুখানা পিঠে কম দেখলেন। গৃহিণী বললেন, দুখানা পিঠে দুই মেয়েকে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে, পরদিন মাসীর বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে মেয়েদের বনবাসে দিয়ে এলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা কতকগুলি মেয়েকে ইতুপূজা করতে দেখল। তাদের কাছ থেকে তারা জানল যে, ইতুপূজা করলে বাপ-মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। এই কথা শুনে তারা বাড়ি গিয়ে ইতুপূজা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তাদের দেখে প্রথমে খুব চটে গেল, কিন্তু যখন ইতুপূজার মাহাত্ম্যের কথা শুনল, তখন কিছু নরম হল।

এর কিছুদিন পরে ওই দেশের রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাদের বাড়ি এসে জল চাইল। উমনো-ঝুমনো জল এনে দিল। তাদের দেখে রাজা ও মন্ত্রী তাদের বিয়ে করতে চাইলেন।

বিয়ের পর স্বামিগৃহে যাবার দিন উমনো ভাত-তরকারি খেল। সেদিন ইতুপূজা, সেজন্য ঝুমনো শুধু ইতুর প্রসাদ খেল। উমনো রাজপ্রাসাদে আসামাত্র নানারকম অঘটন ঘটতে লাগল। রাজা তাকে বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ঝুমনো উমনোকে বলল—'বোন, তুই ইতুপূজার দিন ভাত খেয়েছিলি, সেজন্য ইতুর কোপে পড়েছিস্। তুই ইতুপূজা করে ইতুকে প্রসন্ন কর্।' উমনো তাই করল। রাজার আবার সমৃদ্ধি ফিরে এল। রাজা উমনোকে নিয়ে গেলেন। উমনো রাজাকে সব কথা বলল। সেই থেকে ইতুপূজার প্রচলন হল।

একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিসে সবচেয়ে

বেশি তুষ্ট হও?' শিব বললেন, 'শিবরাত্রির দিন যদি কেউ উপবাস করে আমার মাথায় জল দেয়, তা হলে আমি খুব তুষ্ট হই।' তখন মহাদেব পার্বতীকে একটা কাহিনী বললেন। বারাণসীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে অনেক পশু শিকার করে, এবং তার ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে সে এক বেলগাছের উপর আশ্রয় নেয়। ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল। রাত্রিতে ব্যাধ যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন গাছের এক পাতা ও একবিন্দু শিশিরকণা মহাদেবের মাথায় পড়ে। সেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। মহাদেব তার ওই একফোঁটা শিশিরবিন্দুতেই তুষ্ট হন। যথা-সময়ে যখন ব্যাধের মৃত্যু হয়, যমদূত এসে তাকে নরকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শিবদূত তাকে বাধা দিয়ে, ব্যাধকে শিবলোকে নিয়ে গেল। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হল।

শীতলাপূজা প্রচলিত হয়েছিল এইভাবে: রাজা নহুষ একবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমাসুন্দরী রমণী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁর নাম দেন শীতলা, এবং বলেন যে, 'তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও। এরূপ করলে, লোকে তোমার পূজা করবে।' শীতলা বললেন, 'আমি একা পৃথিবীতে গেলে, লোকে আমার পূজা করবে না, আপনি আমার একজন সঙ্গী দিন।' ব্রহ্মা তাঁকে কৈলাসে শিবের কাছে যেতে বললেন। শীতলা কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। মহাদেব চিন্তিত হয়ে ঘামতে লাগলেন। তাঁর ঘাম থেকে জ্বরাসুর নামে এক ভীষণকায় অসুর সৃষ্টি হল। জ্বরাসুর শীতলার সঙ্গী হলেন। শীতলা বললেন, 'দেবতারা যদি আমার পূজা না করেন, তা হলে পৃথিবীর লোক করবে কেন?' তখন শিব তাঁকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুরীতে যেতে বললেন। ইন্দ্রপুরীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে জ্বরাসুরের মাথা থেকে বসন্তের কলাইয়ের ধামাটা রাস্তায় পড়ে গেল।

সে-সময়ে ইন্দ্রের ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা তাকে ধামাটা জ্বরাসুরের মাথায় তুলে দিতে বললেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করে, ব্রাহ্মণীকে ঠেলে ফেলে দিল। শীতলার আদেশে জ্বরাসুর ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করলেন। এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হল। তারপর শীতলা দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। ইন্দ্র তো চটে লাল! ভাবলেন, সমস্ত জগতের লোক তাঁকে পূজা করে, আর এ কোথাকার এক বুড়ী এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছে। এর আস্পর্ধা তো কম নয়! ইন্দ্র তাঁকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেও বসন্তরোগে আক্রান্ত হলেন। অন্যান্য দেবতারাও হলেন। মহামায়ার দয়া হল। তিনি গিয়ে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব বললেন, 'দেবতারা সকলে শীতলার পূজা করুক, তা হলে রোগমুক্ত হবে।' তখন দেবতারা ঘটা করে শীতলার পূজা করলেন। এইভাবে শীতলা দেবলোকে স্বীকৃতি পেলেন।

তারপর শীতলা জ্বরাসুরকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। প্রথমে তিনি বিরাটরাজার রাজ্যে আসেন। স্বপ্নে তিনি বিরাটকে শীতলার পূজা করতে বললেন। বিরাট বললেন, 'আমার বংশে কেউ কখনও নারীদেবতার পূজা করেনি, আমি নারীদেবতার পূজা করব না।' বিরাটরাজ্যে মহামারী রূপে বসন্ত দেখা দিল। প্রজারা সব মরতে লাগল। বিরাটের তিন ছেলেও মারা গেল। তবুও বিরাট অচল, অটল। নারীদেবতার তিনি পূজা করবেন না। বিরাটের এক পুত্রবধূ তখন পিত্রালয়ে ছিল। শীতলা সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি যদি শীতলার পূজা কর, তা হলে তোমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা বেঁচে উঠবে।' পুত্রবধূ দ্রুত বিরাট-রাজ্যে ফিরে এসে শীতলার পূজা করল। তার স্বামী ও তার ভাইয়েরা সব বেঁচে উঠল। শীতলা যে বসন্তের দেবতা, তা বিরাটরাজার প্রত্যয় হল। সেই থেকে পৃথিবীতে শীতলাপূজার প্রচলন হল।

ক্ষেত্রপালের ব্রতকথায় বলা হয়, একদিন এক কৃষকরমণী কিছু

ছাতু ও তার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে মাঠে যায় এবং কাপড়ে করে কিছু ছাতু এক কুলগাছে ঝুলিয়ে রেখে, তার তলায় স্বামীকে শুইয়ে রাখে। ক্ষেত্রপাল ঠাকুর ওই ছাতু খেয়ে ফেলেন এবং তাঁর দাড়িতে কিছু ছাতু লেগে যায়। দাড়ির ছাতু ঝেড়ে ফেলবার সময় কিছু ছাতুর গুঁড়া গাছের তলায় শুয়ে-থাকা কুষ্ঠীর গায়ে পড়ে। কুষ্ঠী ক্ষণেকের জন্য দেবতার দর্শনলাভ করে ও সে রোগমুক্ত হয়। এর ফলে ক্ষেত্রপালের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারিত হয়। বরিশালে ব্রতমাহাত্ম্য বর্ণনার সময় বলা হয়, এই ব্রত করলে বাঘের ক্ষুধাও নষ্ট হয়।

অঞ্চলভেদে এসব কাহিনীর পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে রচিত নূতন কাহিনী আদিম কাহিনীকে চাপা দিয়েছে। যেমন, ওপরে লক্ষ্মীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আদি কাহিনী। এখন প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা লক্ষ্মীর পূজা করে ও ছাপা বই দেখে যে পাঁচালী পাঠ করে, তার কাহিনী অন্যরূপ। আবার অরণ্যষষ্ঠীর যে কাহিনী আগে দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর একটা কাহিনী আছে। সে কাহিনীতে ছোটবউয়ের কথা নেই। তার পরিবর্তে আছে অভিশপ্ত এক বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কাহিনী। এসকল অলিখিত সাহিত্যের উপাখ্যানসমূহের রূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গন্ধেশ্বরীপূজার কাহিনীসমূহে। গন্ধেশ্বরী হচ্ছেন গন্ধবণিক জাতির দেবতা। গন্ধেশ্বরী তাদের শত্রু গন্ধাসুরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবণিক সমাজ তাঁর পূজা করে। কিন্তু গন্ধেশ্বরীপূজার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

এইসব উপাখ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উপাখ্যানের মধ্যে অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। হিন্দু এসব কাহিনীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করত। সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চস্তরে ছিল। আজ হিন্দু সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণ্যের বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সেজন্যই হিন্দুর নৈতিক মান আজ নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

পাল-পার্বণ ও উৎসব

ভারত পাল-পার্বণ ও উৎসবের দেশ। সারা বছরের প্রতি মাসেই একটা-না-একটা উৎসব লেগে আছে। সেজন্যই বলা হয় যে হিন্দুর 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। কিন্তু এক রাজ্যের উৎসবের সঙ্গে অন্য রাজ্যের উৎসবের অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই। শুধু তাই নয়। দেবতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। এক এক দেবতা দেশের এক এক অঞ্চলে বেশী সমাদর পেয়ে থাকেন। যেমন উত্তর ভারতে রামসীতা বেশী সমাদর পান। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যদেব বা কার্তিকেয়ের সমাদরই বেশী। বাঙলাদেশে মঙ্গলচণ্ডী, সুবচনী ইত্যাদি দেবতার পূজা ঘরে ঘরে হয়। কিন্তু বাঙলার বাইরে অন্যত্র তা নয়। বাঙলার গাজন ও চড়কের মত কোন উৎসব বাঙলার বাইরে দেখা যায় না। বিহারের ছট্-পূজা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বাঙলার ইতুপূজাও তাই। তবে কতকগুলি উৎসবের সর্বভারতীয় প্রচলন আছে, যেমন শারদীয়া, শ্রীপঞ্চমী, শিবরাত্রি, হোলি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, দীপাবলী ইত্যাদি। কিন্তু তা হলেও এগুলি সব জায়গায় একই ভাবে পালিত হয় না। আবার একই উৎসব নানা অংশে নানা ভাবে পালিত হয়।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাকে বৌদ্ধপূর্ণিমা বলা হয়। কেননা ওই একই তিথিতে বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণ ঘটেছিল। সেজন্য বৌদ্ধরা ভারতে ও ভারতের বাইরে ওইদিনে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান করে। বাঙলার গন্ধবণিক সমাজ ওইদিন গন্ধেশ্বরীপূজা করে। গন্ধেশ্বরী গন্ধবণিকদের অধীশ্বরী দেবী। আবার ওই বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় বাঙলায় ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটায় বাঙলায় হালখাতা (ও ইদানীং নববর্ষ উৎসব) হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে হয় না। উত্তর ভারতে ওইদিন ধ্বজারোপণ নামে

এক উৎসব হয়। তা ছাড়া, উত্তর ভারতে বৈশাখ মাসেই হয় উত্তর ভারতের এক বড় উৎসব—রামনবমী, যেদিন রামের জন্ম হয়েছিল। বাঙলায় বৈশাখ মাসের অন্যান্য পর্ব হচ্ছে অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, সাবিত্রীব্রত ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙলাদেশের মেয়েরা জয়মঙ্গলবারের ব্রত ও অরণ্যষষ্ঠী পালন করে। ওই অরণ্যষষ্ঠীর দিনটাই হচ্ছে জামাই-ষষ্ঠীর দিন। আষাঢ় মাসের বড় উৎসব (বাঙলায় ও ওড়িশায়) স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা। আবার ওই আষাঢ় মাসের ৬ তারিখ থেকে শুরু হয় অম্বুবাচী।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলা হয়। ওই দিন ভারতের নানা স্থানে সর্পের দেবতা মনসাদেবী ও অষ্টনাগের (অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই আট-প্রকার সর্প) পূজা হয়। ওই সময় সর্পের দেবী সীজ বা মনসাগাছকে আশ্রয় করে থাকেন। সেজন্য উঠানে মনসাগাছ পুঁতে তাঁর পূজা করা হয়। প্রোথিত মনসাগাছের বা ঘরের দু'পাশে গোবর দিয়ে সাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। কোথাও কোথাও সাপের অঙ্কিত মূর্তি অথবা মাটি দিয়ে তৈরি সাপের মূর্তিও পূজা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও জ্যান্ত সাপেরও পূজা করা হয়। সাপকে দুধ খেতে দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় কেউটে সাপের অধীশ্বরী ও মনসাদেবীর ভগিনী জগৎগৌরীর পূজা করা হয়। বাঙলায় অনন্ত-দেবকে হিতকারী দেবতা বলা হয়। কিন্তু ওড়িশায় তাঁকে সর্পেরই দেবতা বলা হয়, এবং ১৪ ভাদ্র তারিখে ১৪ বছর যাবৎ তার পূজা করা হয়। যদি ১৪ বছর সম্পূর্ণ হবার আগেই কেউ মারা যায়, তা হলে তার ছেলেকে বাকী বছর পূর্ণ করে ১৪ বছর সম্পূর্ণ করতে হয়। দাক্ষিণাত্যে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা হয়। বাঙলা-দেশ সম্পর্কে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন—'কোথাও কোথাও জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে

গৃহস্থের বাড়িতে মনসাগাছের তলায় দেবীর পূজা করা হয়। শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যাকালে সুর করিয়া মনসামঙ্গল পাঠ ও শ্রবণ এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সমারোহ সহকারে মনসার পূজা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে উনানের মধ্যে মনসাগাছের ডাল পুঁতিয়া মনসার পূজা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল।'

উত্তর ভারতের শ্রাবণী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত রক্ষাবন্ধন বা রাখিবন্ধন একটা বড় উৎসব। ওই সময় লোকে একজন আর-একজনের হাতে মঙ্গলসূত্র বা রাখি বেঁধে দিয়ে তার মঙ্গল কামনা করে। বাঙলায় রাখিবন্ধনের সেরকম প্রচলন নেই, তবে ওইদিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা আছে। আবার পশ্চিম ভারতে ওইদিনটিকে নারিকেল-পূর্ণিমা বলা হয় এবং সেদিন সমুদ্রপূজার ব্যবস্থা আছে। ওইদিন লোকে সমুদ্রতটে সমবেত হয়ে সমুদ্রের পূজা করে ও সমুদ্রে নারিকেল নিক্ষেপ করে। মাত্র শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ছাড়া বাঙলাদেশে শ্রাবণী পূর্ণিমায় আর কোন পূজা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'উপাকর্ম' নামে এক উৎসব আছে। উপবীতধারীরা এ-সময় পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করে নূতন উপবীত ধারণ করে ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে। শ্রাবণী পূর্ণিমার কয়েকদিন পরে কেরলে 'ওনম' উৎসব পালিত হয়। এটা কেরলের 'নবান্ন' উৎসব।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী গণেশ-চতুর্থী নামে পরিচিত। বাঙলাদেশে এদিন কোন পূজা-অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু অন্যত্র ঘরে ঘরে ওইদিন গণেশপূজা ও তার সঙ্গে উৎসবাদি হয়। সবচেয়ে বেশি সমারোহের সঙ্গে গণেশ-চতুর্থী পালিত হয় মহারাষ্ট্রে। সেখানে এই সম্পর্কে যে উৎসব হয়, তা বাঙলাদেশের দুর্গোৎসবের মত। অনেকসময় উৎসব দশ-বারো দিন ধরে চলে। বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার মত মহারাষ্ট্রে গণেশপূজা পারিবারিক ও সর্বজনীন—দু'ভাবেই হয়। দুর্গাপূজার মত সমারোহের সঙ্গে গণেশ বা গণপতির ভাসান হয় এবং বাঘনাচ

(বাঘের আকারে সজ্জিত হয়ে উদ্দাম নৃত্য) এর একটা বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভারতেও খুব ঘটা করে গণেশ-চতুর্থী পালিত হয়। আগেই বলেছি যে, ভাদ্র মাসের চতুর্থীটা বাঙলাদেশে 'নষ্টচন্দ্র' নামে আখ্যাত। আগেকার দিনে বাঙলাদেশের লোকেরা ওইদিন প্রতিবেশীদের গাছ থেকে ফলমূল চুরি করত এবং চাঁদ দেখত না। কেননা, চন্দ্র ওইদিন দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করে তার সতীত্বনাশ করেছিল।

তবে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীটি সর্বভারতীয় উৎসবের দিন হিসাবে পালিত হয়। ওটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন এবং সেজন্য 'জন্মাষ্টমী' বলা হয়। বাঙলাদেশে ওইদিনটিকে গোকুলাষ্টমীও বলা হয়। বাঙলাদেশে ওর পরের দিন নন্দোৎসব পালিত হয়। সেটা একটা খুব আনন্দের দিন, এবং একটি ছেলেকে বর্ণাঢ্য বেশে বাড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে নাচগান করানো হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মাপূজা হয়। সকলেই সেদিন যন্ত্রপূজা করে ও ছেলেদের ঘুড়ি ওড়াবার ধুম পড়ে যায়। এর মধ্যেই এসে যায় আগমনী গান গাওয়ার পালা। আগমনী গীত গাওয়া বাঙলাদেশে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। শারদোৎসবের আগের অমাবস্যা মহালয়া নামে পরিচিত। এদিন লোকেরা পিতৃপুরুষের তর্পণ করে। শারদোৎসব ভারতের সর্বত্রই পালিত হয়, কিন্তু নানা নামে ও নানা রূপে। বাঙলায় শারদোৎসবের নাম দুর্গাপূজা। বছরের গোড়া থেকেই বাঙলার লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করে দুর্গাপূজার জন্য। এত বড় উৎসব বাঙলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই। 'পূজা' বললেই বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা বোঝায়। এটি চারদিনের উৎসব। নূতন জামাকাপড় পরে এ চারদিনই বাঙালী মহানন্দে মেতে থাকে দুর্গাপূজায়। মহারাষ্ট্রের গণেশ-চতুর্থীর মত বাঙলায় দুর্গাপূজা পারি-বারিক ও সর্বজনীন, দু'ভাবেই হয়। উত্তর ভারতে এই সময়ে নবরাত্রি, রামলীলা, দশেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেটাই সেখানে শারদোৎসবের নামান্তর ও রূপান্তর। এর অঙ্গ হিসাবে সেখানে নানা স্থানে রামলীলার

মেলা ও মিছিল বেরোয়। দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও এসময়ে সরস্বতীপূজা ও আয়ুধপূজা হয়। আয়ুধপূজা অনেকটা বাঙলাদেশের বিশ্বকর্মাপূজার মত। বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার পরেই পূর্ণিমাতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার শেষে নারিকেল ও চিপিটক ভক্ষণ এবং অক্ষক্রীড়া ও রাত্রিজাগরণ করা হয়। লক্ষ্মী তাতে প্রীত হয়ে ধনদান করে। উত্তর ভারতে এদিন আকাশে দীপ দেওয়া হয়। হরিজনেরা এদিন বাল্মীকির জন্মদিন উৎসব পালন করে।

দুর্গাপূজার পরের অমাবস্যাতে বাঙলাদেশে সাড়ম্বরে কালীপূজা হয়। কালীপূজার আগের দিন ভূত-চতুর্দশী। এদিন দীপদান করা হয় ও লৌকিক আচার হিসাবে চোদ্দ-শাক খাওয়া হয়। আর, কালীপূজার দিন দীপমালায় গৃহ সজ্জিত করা হয়। ছেলেরা এদিন আতসবাজি পুড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। বাঙলার বাইরে কালীপূজা দীপাবলী বা দেওয়ালি নামে পরিচিত। এদিন উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের লোকেরা ঘরবাড়ি আলোকমালায় সজ্জিত করে। পশ্চিম ভারতের লোকেদের এটা এক বিশেষ আনন্দ-উৎসবের দিন। তারা রাত্রি-জাগরণ করে ও জুয়াখেলায় মত্ত হয়। জুয়ার হার-জিতের ওপর তাদের পরের বছরটা কিরকম যাবে তা নির্ভর করে।

কালীপূজার পরের দিন বাঙলাদেশে মহাসমারোহের সঙ্গে অন্নকূট উৎসব পালিত হয়। অন্নকূটের পরের দিন ভাইফোঁটা বা 'ভাইয়া দুজ'। এটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা যমদ্বিতীয়া নামেও পরিচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ, এদিন বোনেরা যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজা করে ভাইকে খাওয়াবেন। বাঙলাদেশে এদিন বোনেরা বাঁ হাতের কড়ে-আঙুল দিয়ে ভাইদের কপালে চন্দন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের ফোঁটা দিয়ে বলে 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা'। বিহারে এদিন দোয়াত ও চিত্রগুপ্তের পূজা করা হয়। বাঙলাদেশে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে

জগদ্ধাত্রীপূজা হয়। চন্দননগরের বিশালকায় জগদ্ধাত্রী প্রসিদ্ধ। কার্তিক মাসের আরও উৎসব-অনুষ্ঠান আছে। আগে সারা কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও এখনও দেওয়া হয়। কিন্তু কলকাতায় আর দেওয়া হয় না। অথচ আমাদের ছেলেবেলায় এটা ঘরে ঘরে দেওয়া হত। কার্তিক মাসের এক বড় উৎসব হচ্ছে রাসোৎসব। রাস উপলক্ষে উৎসব ও মেলা অনেক জায়গায় কয়েকদিন ধরে চলে। শিখেরা এটা গুরু নানকের জন্মদিন হিসাবে পালন করে, আর জৈনরা এদিন রথযাত্রা উৎসবের অনুষ্ঠান করে। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিকপূজা হয়। এদিন হতেই ইতুপূজার আরম্ভ হয়।

একসময় পৌষ সংক্রান্তি বাঙলাদেশে এক মহা উৎসবের দিন ছিল। এদিন পৌষপার্বণ বা পৌষালি উৎসব পালিত হত। এই উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল পিঠেপুলি খাওয়া। (আগে দেখুন)। পূর্ববঙ্গে এসময় ঘরে ঘরে বাস্তুপূজার ও গৃহদেবতার নবান্ন উৎসব হয়। এদিন তিলদান ও তিল-ব্যবহারের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে বলে, একে তিলসংক্রান্তি বলা হয়। আসামেও এদিন থেকে 'মাঘ-বিহু' উৎসবের সূচনা হয়। সারা ভারতের লোক এসময় বাঙলাদেশে আসে গঙ্গা-সাগরতীর্থে মকরস্নান করতে। বস্তুত পৌষ মাসের সংক্রান্তিকে মকর-সংক্রান্তি বলা হয় এবং এই উপলক্ষে সর্বত্র লোক কোন-না-কোন পুণ্যসলিলায় স্নান করে। বলা হয়, এরূপ স্নান করলে, স্নানার্থী অশেষ পুণ্য অর্জন করে। পৌষ মাসের সংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তি ছাড়া, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি ও দধি-সংক্রান্তিও বলা হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে ভারতের নানা স্থানে নানা ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোন জায়গায় একে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়, আবার কোন জায়গায় বসন্তপঞ্চমী। বাঙলাদেশে এদিন সরস্বতীপূজা হয় এবং এটা অনধ্যায়ের দিন বলে গণ্য। সরস্বতী-

পূজার দিন থেকেই বাঙলাদেশে কুল খাওয়া আরম্ভ হয়। পূর্ববঙ্গে এদিন থেকে ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এদিন নিরামিষ খিচুড়ি খাওয়া হয়। আগেকার দিনে অনেকক্ষেত্রে সরস্বতী-পূজার দিনই হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান হত। এখনও বাঙলা-দেশের ছেলে-মেয়েরা এদিন বাসন্তী রঙের ছোপানো কাপড় পরে সরস্বতীর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। মিথিলা ও উত্তর বিহারে এদিন লাঙলপূজার রীতি আছে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি বা শিব-চতুর্দশী একটা সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান। যারা শিবরাত্রি পালন করে, তারা এদিন উপবাস করে এবং উপবাসান্তে গঙ্গাস্নান করে উপবাস ভঙ্গ করে। যারা উপবাস করে তাদের রাত্রিজাগরণ অবশ্য কর্তব্য। পরদিন ব্রতের পারণের পর দিবানিদ্রাও নিষিদ্ধ। বলা হয় যে, অশ্বমেধের মত যজ্ঞ ও শিবরাত্রির মত ব্রত আর দ্বিতীয় নেই। এদিনই নাকি মহানিশায় আদিশিব শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডে বলা হয়েছে যে শিবের তুল্য দেবতা আর দ্বিতীয় নেই, তিনি দেবাদিদেব ও মহাদেব।

ফাল্গুন মাসের সর্বভারতীয় উৎসব হচ্ছে হোলি। বাঙলাদেশে হোলিকে দোলযাত্রা বলা হয়। এদিন ফাগখেলা ও রঙখেলার দিন। দোলযাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় বহ্ন্যুৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে একে চাঁচর বা 'বুড়ীর ঘর-পোড়ানো' বলা হয়। বাঙলাদেশে রঙখেলা পূর্ণিমার দিনে হয়। বিহার ও উত্তর প্রদেশে পরের দিন প্রতিপদে।

চৈত্র মাসের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে শিবের গাজন ও চড়ক। এই উপলক্ষে অনেকে সারা চৈত্র মাস নিষ্ঠার সঙ্গে 'সন্ন্যাস' পালন করে। বাঙলার বাইরে শিবের গাজনের ন্যায় কোন উৎসব দেখা যায় না। চৈত্র মাসে আরও যে-সব উৎসব হয় তার মধ্যে পড়ে দুর্গাপূজার অনুরূপ চারদিনব্যাপী বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা ইত্যাদি। চৈত্র মাসে গাজনের

পূর্বদিন মেয়েরা নীলের উপবাস করে। আর সংক্রান্তির দিন দেবতাকে ছাতু উৎসর্গ করা হয়, এবং যবের ছাতু খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেজন্য চৈত্রসংক্রান্তিকে ছাতু-সংক্রান্তিও বলা হয়। কেউ কেউ এদিন কমল-কুমার-কৃষ্ণকুমার দৈত্যের পূজা করে চৌরাস্তার মোড়ে ছাতু ছড়িয়ে বলে 'শত্রুর মুখে ছাই আর মিত্রের মুখে ছাতু'।

বিলীয়মান ব্যবহারিক জীবন

গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হত। দু'রকমের মাটির হাঁড়ি ব্যবহৃত হত। এক হচ্ছে ঘাটালের হাঁড়ি, আর এক হচ্ছে ফরাসডাঙার (চন্দননগরের) তিজেল হাঁড়ি। ভাত ফুটবার সময় হাঁড়ির মুখে মাটির সরা চাপা দেওয়া হত। ডালও মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হত। তবে ডাল রান্নার জন্য তিজেল হাঁড়িই ব্যবহৃত হত। ব্যঞ্জন-তরকারি রান্নার জন্য ব্যবহার করা হত লোহার তৈরি কড়া ও তই। কড়া আর তই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কড়ার দু'পাশে দুটি আঙটা থাকত, আর তই-এর ওরকম কোন আঙটা থাকত না। সেজন্য উনুন থেকে তই নামাবার জন্য লোহার সাঁড়াশির প্রয়োজন হত। ডালের হাঁড়ি বা অনুরূপ কণ্ঠবিশিষ্ট পাত্র উনুন থেকে নামাবার জন্য লোহার 'বেড়ি' ব্যবহৃত হত। যশোহর জেলার লোকরা বেড়িকে 'বাউলি' বলত। এছাড়া ফুটন্ত ডাল হাঁড়ির ভেতর নাড়বার জন্য কাঠের তৈরি একখণ্ড যষ্টি ব্যবহার করত, একে 'ডালের হাঁড়ির কাঠি' বলা হত। রান্নাঘরে লোহার তৈরি আরও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হত : যথা চাটু, খন্তি, হাতা, ঝাঁঝরি ইত্যাদি। এগুলির প্রতিটিরই ব্যবহার ছিল রান্নার কোন-না-কোন কাজে। এ ছাড়া ছিল শিল-নোড়া মশলা বাটবার জন্য। গৃহস্থালীর অন্যান্য নানা কাজে আর যে-সব সরঞ্জাম ব্যবহৃত হত সেগুলি হচ্ছে জাঁতা, কুলো, ধুচুনি, ধামা, চুপড়ি, ঢেঁকি, হাতপাখা, হামানদিস্তা ইত্যাদি। জাঁতার ব্যবহার ছিল ডাল-কলাই ভাঙবার জন্য, কুলোর ব্যবহার ছিল চাল ঝাড়বার জন্য, ধুচুনির ব্যবহার ছিল হাঁড়িতে চাল দেবার আগে চাল ধোবার জন্য, ধামা ও চুপড়িতে রাখা

হত সবজি ও নানারকম জিনিস, ঢেঁকিতে নানারকম জিনিস কোটা হত, হাতপাখা ব্যবহৃত হত উনুনে হাওয়া দেবার জন্য, আর হামান-দিস্তাতে মশলা ইত্যাদি নানা জিনিস কোটবার জন্য। রান্নাঘরে দু'রকম উনুন থাকত—আমিষ ও নিরামিষ রান্নার জন্য। নিরামিষ রান্নার উনুন ব্যবহৃত হত বিধবাদের রান্নার জন্য। মেয়েদের বিলক্ষণ শুচিতা-জ্ঞান ছিল। রান্না ভাত ইত্যাদি কাপড়ে ঠেকলে কাপড় 'সকড়ি' হয়ে যেত। আবার কাপড় বদলাতে হত। কোন জায়গা 'সকড়ি' হয়ে গেলে ন্যাতা-গোবর দিয়ে সে-জায়গাটা শুদ্ধ করতে হত। উনুনের গায়েও ন্যাতা-গোবর বুলিয়ে নিকানো হত। তা ছাড়া, গ্রহণ ও অশৌচান্তে মাটির হাঁড়িকুড়ি সব ফেলে দেওয়া হত ও রান্নাঘরের অন্যান্য সরঞ্জাম মেজে-ঘষে ফেলা হত। এসব উপলক্ষ ছাড়া রান্নাঘর প্রতিদিন দু'বেলা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হত।

এবার সেকালের হিন্দুর বাসন-কোসনের কথা বলি। প্রভূত পাথরের বাসন-কোসন ছিল—থালা, বাটি, গেলাস, খোরা ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল কাঁসার বাসন। পিতলের বাসনও ছিল, যেমন পিতলের ঘড়া, রেকাবি ইত্যাদি।

এবার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কিছু বলি। সুক্তা থেকে আরম্ভ করে অম্বল পর্যন্ত, মেয়েরা অনেকরকম ব্যঞ্জন রান্না করত। লোকে মেঝের ওপর আসন বা কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে খেত। যে জায়গাটাতে বসে খেত, সে জায়গাটা খাবার আগে জল দিয়ে মুছে দিত। খাবার পর এঁটো বাসন-কোসন সরিয়ে ফেলা হত এবং জায়গাটা 'সকড়ি' হয়েছে বলে, সে জায়গাটা ন্যাতা-গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে ফেলত।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে এসবের আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন আর মাটির হাঁড়িকুড়িতে রান্না হয় না। বাসন-কোসনও পাথর-কাঁসা-পিতলের হয় না। অ্যালুমিনিয়ম ও স্টেনলেস্ স্টীল তাদের জায়গা দখল করেছে। রান্নাবান্নাও এখন আর মাটির

উনুনে হয় না। কেরোসিনের স্টোভ, 'জনতা', ইলেকট্রিক বা গ্যাস উনুনে রান্না হয়। 'সকড়ি' ও ন্যাতা-গোবরও উঠে গেছে। এবেলার রান্না রেফরিজেরেটারে তুলে রাখা হয়, রাত্রে বা তার পরদিন খাবার জন্য। তাতে রেফরিজেরেটার 'সকড়ি' হয় না। মানুষ মাটির ওপর আসন বা পিঁড়ি পেতেও খায় না। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে খায়। এক্ষেত্রেও টেবিল 'সকড়ি' হয় না। তা ছাড়া, মেয়েরা আর শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসে না। এখন গুঁড়ো মশলাতেই কাজ সেরে নেয়। একই উনুনে আমিষ ও নিরামিষ রান্না হয়। বিধবারা স্বচ্ছন্দে তা খায়। এক কথায়, আগেকার দিনের শুচিতা ও 'সকড়ি'-সংস্কার এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লোকে আগে গামছা পরে গাড়ু হাতে করে পায়খানায় যেত। পায়খানার পর গামছাটা কেচে ফেলত। এখন আর ওসব বালাই নেই। লোকে পরিহিত কাপড় পরেই পায়খানায় যায়। গাড়ুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পায়খানা করবার পর 'হাতে-মাটি' করবার প্রথাও এখন আর নেই। পায়খানায় গেলে কাপড় যে নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যায়, এ বোধ এখন আর নেই। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসব পরিবর্তন ঘটেছে।

বসনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মেয়েরা আর পাছা-পাড় শাড়ি পরে না। প্রস্তুতকারকরাও আর পাছা-পাড় শাড়ি তৈরি করে না। পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত সাধারণ বাঙালী ধুতি পরত ও উড়ানি বা চাদর ব্যবহার করত। এখন ট্রাউজার পরাই ফ্যাশন হয়েছে। আর বাড়ির ভেতর অনেকেই লুঙ্গি পরে। তা ছাড়া, পাঞ্জাবি ও শার্ট পরা একরকম উঠেই গেছে। এখন অধিকাংশ লোকই 'হাওয়াই শার্ট' পরে। আগে মেয়েরা হাতে কাঁচের চুড়ি ও কপালে কাঁচপোকার টিপ পরতে ভালবাসত। এখন হাতে রিস্ট-ওয়াচ ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে। মেয়েদের পায়ে মল বা তোড়া পরাও উঠে গেছে। বুক পর্যন্ত ঘোমটাও

আর তারা দেয় না। স্বামীর সঙ্গে ঘোমটাহীন অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। আগে মেয়েরা পায়ে জুতো পরত না। এখন ছোট-বড় সকলের কাছেই জুতা-পায়ে-দেওয়া একটা মর্যাদার চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরত না। তারা একরকম অসূর্যম্পশ্যা ছিল। এখন মেয়েরা একা-একাই স্বচ্ছন্দে সিনেমা-থিয়েটার ও বাজার-হাটে যাচ্ছে। অনেকে আপিসেও যাচ্ছে।

বাড়ির ভেতরেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে সেকালে মেয়েদের দুটি বড় কাজ ছিল—পান-সাজা ও প্রদীপের জন্য সলতে পাকানো। এ দুটির কোনটিই এখন নেই। খুব কম বাড়িতেই এখন পানের ডাবর ও পান-সাজবার সরঞ্জাম দেখতে পাওয়া যাবে। বাড়ির ভেতর মেয়েরা ঘোমটা দিয়েই ঘুরে বেড়াত। ভাশুর, শ্বশুর বা অন্য কোন গুরুজন সামনে এসে পড়লে, তাদের পথ দেবার জন্য সরে দাঁড়াত। ভাশুর ও মামাশ্বশুর সম্বন্ধে একটা বিধি-নিষেধ (taboo) ছিল। এদের কারোর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ধান-সোনা উৎসর্গ করতে হত। এখন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ভাশুর ও মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে, একসঙ্গে বসে খায় ও গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে সিনেমা-থিয়েটারে বসে। তাদের সামনে ঘোমটাও দেয় না।

বাড়ির ভেতরে শোবার ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো থাকত, বিশেষ করে নরকে পাপীদের কিরূপ শাস্তি পেতে হয় সেই ছবিখানা। এখন টাঙানো থাকে স্বামী-স্ত্রীর ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি বা নেতাজী সুভাষের ছবি।

প্রতি বাড়িতেই একটা করে আঁতুড়-ঘর থাকত। সেখানেই বাড়ির বৌ-ঝিরা সন্তান প্রসব করত। আঁতুড়-ঘরে মেয়েদের একমাস কাল অশুদ্ধ বা অপবিত্র অবস্থায় থাকতে হত। অনেকে একুশ দিনের দিন স্নান করে বেরিয়ে আসত, কিন্তু একমাস পূর্ণ হবার দিন ষষ্ঠীপূজা না

হওয়া পর্যন্ত তারা শুদ্ধ হত না। আঁতুড়-ঘরে থাকাকালীন ছয়দিনের দিন 'ষেটেরা পূজা' হত। চার বা আট দিনের দিন চার-কৌড়ে বা আটকৌড়ে হত। এখন মেয়েরা হাসপাতাল বা নার্সিং-হোমে প্রসব হয় বলে আঁতুড়-ঘর উঠে গেছে—আনুষঙ্গিক অশুচিতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহও।

সেকালে কোন বাড়িতে ঝি-চাকর ঢুকলে, আজীবন তারা সেই বাড়িতেই থেকে যেত। বাড়ির লোকেরা তাদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করত এবং তাদের 'মাসী', 'দিদি' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত। এখন সে-প্রথা লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন লোকে তাদের 'কাজের লোক' বলে এবং তাদের নাম ধরে সম্বোধন করে।

ব্যবহারিক জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে ছেলেদের এবং মেয়েদের সম্বন্ধে। 'হাতেখড়ি' ছাড়া সেকালে বিদ্যারম্ভ হত না। 'হাতে-খড়ি' সাধারণত চার-পাঁচ বছর বয়সে হত। 'হাতেখড়ি'টা কী, তা আমি আমার 'হাতেখড়ি'র দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানটা শ্রীপঞ্চমীর দিন হত। আমারও তাই হয়েছিল। সকালে পুরোহিতঠাকুর এসে নারায়ণপূজা, সরস্বতীর আরাধনা, হোমাগ্নি ইত্যাদি করলেন। ইত্যবসরে আমি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে, একখানা নূতন কাপড় পরে তাঁর সামনে এসে বসলাম। তিনি আমার হাতে একটা রামখড়ি দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে মেঝের ওপর 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' লেখালেন। এই অনুষ্ঠানের পরই আমার বিদ্যারম্ভ শুরু হল। সেকালে ছেলেরা বাড়িতে নিজেরাই লেখাপড়া করত। এখনকার মত মোটা মাইনে দিয়ে 'প্রাইভেট টিউটর' রাখার প্রথা ছিল না।

মেয়েরা সেকালে পাঁচ থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত নানারকম ব্রতানুষ্ঠান করত। (আগে দেখুন)। অল্পবয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যেত। বিয়ের পর প্রথম রজঃদর্শনের সময়ে রজঃদর্শন উৎসব হত। এটা

খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত, এবং বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির মত আত্মীয়-স্বজন ও অনেককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। তারপর গর্ভধারণের পর মেয়েদের তিনমাস, পাঁচমাস ও সাতমাসে 'সাধ' হত। এগুলোও খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হত। এখন মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহ হয় বলে রজঃদর্শন উৎসব একেবারে উঠে গেছে। তবে মেয়েদের 'সাধ' এখনও হয়। কিন্তু আগেকার সে-ঘটা ও আনন্দ-উৎসব নেই।

আগেকার দিনের মেয়েরা এখনকার দিনের মেয়েদের চেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণা ছিল। সকালে উঠে তারা পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করত ও সদর দরজা থেকে শুরু করে সমস্ত বাড়িতে গোবরজলের ছিটা দিত। তা ছাড়া সন্ধ্যাবেলায় তারা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করত। এখনকার মেয়েরা সে-সময়টা রেস্টুরেন্ট বা সিনেমায় কাটায়।

সেকালের কয়েকটা সংস্কারের কথা বলে আমাদের 'বিলীয়মান ব্যবহারিক জীবন' প্রসঙ্গ শেষ করব। সেকালের লোক ভিখারীকে কখনও ফিরিয়ে দিত না। তবে অশৌচকালে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়েরা কখনও দু-চার কণা চালও মাটিতে ফেলত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল মাটিতে পড়লে, সে কন্যা-সন্তান-প্রসবিনী হবে। সেকালে লোক সকালে কৃপণ বা নিঃসন্তান লোকের নাম করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ওরূপ লোকের নাম করলে সেদিন তাদের অন্ন জুটবে না। চলতি ভাষায় বলত সেদিন হাঁড়ি ফাটবে। যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে, সেটাকে অমঙ্গল জ্ঞান করত এবং পুনরায় ফিরে বসে অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করত। তা ছাড়া লোক বিশ্বাস করত যে বাঁ চোখ, বাঁ পা বা বাঁ অঙ্গ যদি নাচে, তা হলে তার ক্ষতি হবে। অঙ্গে টিকটিকি পড়াতেও বিশ্বাস করত। আরও বিশ্বাস করত যে মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামলে তিনদিন হবে, শনিবার নামলে সাতদিন হবে। বাইরে বেরুতে গিয়ে যদি বাধা পড়ত, সেটাকে কর্মপণ্ডের লক্ষণ বলে মনে করত। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, কেউ তার নাম

করছে। এ ছাড়া, বৃহস্পতিবারে কেউ লেনদেন করত না। বৃহস্পতিবারের বারবেলাটাও সব কাজে অশুভ বলে মনে করত। শনিবারে, মঙ্গলবারে ও জন্মবারে কখনও নববস্ত্র পরিধান করত না। জন্মবারে বা জন্মমাসে কোন ক্ষৌরকর্ম বা কেশকর্তন করত না। মেয়েরাও ছেলের জন্মবারে বা জন্ম-মাসে নূতন কাপড় ভাঙত না বা নূতন হাঁড়ি 'কাড়তো' না। রাত্রিকালে মেয়েরা চুল বাঁধত না, বা সিঁদুর পরত না ; কিংবা আয়নায় মুখ দেখত না। বলত, সেরূপ করলে কুলটা হতে হবে। দাঁড়কাক ডাকলে, সেটা খুব অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। দোকানীরা রাত্রে সূচ বেচত না। রাত্রে কালপেঁচা ডাকলে, সেটাকেও অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। এ ছাড়া, বারবেলা, কালবেলা ইত্যাদিতে কোন শুভকর্ম করত না। একাদশীতে সধবা মেয়েদের মাছ খাওয়া অবশ্যকর্তব্য ছিল। বিশ্বাস করত যে, একাদশীতে মাছ না খেলে সে বিধবা হবে। ওইদিন মেয়েরা পায়ে আলতাও পরত। নাপ্‌তিনী এসে আলতা পরিয়ে দিয়ে যেত। বোধ হয় এ বিশ্বাস বাঙালী সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। স্বামীর আগে মেয়েরা কখনও অন্নগ্রহণ করত না। স্বামী বা কোন গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। নামের প্রথম বর্ণটা পরিবর্তন করে তাদের নাম করত। কেউ এক চোখে দেখালে, লোকে ভাবত অপরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। এর প্রতিকারার্থে তাকে দু'চোখ বন্ধ করে দেখাতে বলা হত।

ইদানীং সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো সম্বন্ধে। যজ্ঞিবাড়িতে আগে মেয়েরাই রান্নাবান্না করত। কিন্তু গত শতাব্দীতে ভোজপণ্ডেদের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে, লোকে ওড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করতে লাগে। এখন তাদেরও প্রস্থান ঘটেছে। ক্যাটারাররা তাদের স্থান দখল করেছে। এ ছাড়া, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের জন্য পৃথক পংক্তি হত। এখন সেটা উঠে গেছে। আরও, আগেকার দিনে আট আনা-একটাকা দিয়ে লৌকিকতা সারা হত। এখন তার পরিবর্তে প্রচলন হয়েছে একখানা দামী শাড়ি দেওয়া।

পরিশিষ্ট ক

জাতি ও পদবী

পদবী দেখে বাঙলাদেশে জাতি নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কেননা, একই পদবী বহু জাতি বহন করে। যথা : 'কর' উপাধি ২২টি জাতি ব্যবহার করে, 'কুণ্ড' ১৮টি, 'গুপ্ত' ৯টি, 'গোস্বামী' ১২টি, 'ঘোষ' ১৫টি, 'চৌধুরী' ৩২টি, 'জানা' ১৯টি, 'ঠাকুর' ৯টি, 'দত্ত' ২৮টি, 'দাস' ৭৬টি, 'দে' ২৮টি, 'ধর' ১৫টি, 'নন্দী' ১৯টি, 'নাগ' ১৬টি, 'পাত্র' ১৮টি, 'পাল' ২৮টি, 'পালিত' ৬টি, 'প্রামাণিক' ২৯টি, 'বাগচী' ৫টি, 'বিশ্বাস' ৩২টি, 'ভাদুড়ী' ৩টি, 'মণ্ডল' ৪৪টি, 'মল্লিক' ৩৯টি, 'মজুমদার' ২৪টি, 'রায়' ৪৭টি, 'রায়চৌধুরী' ১৯টি, 'রায়বর্মণ' ৪টি, 'সরকার' ৩৫টি, 'সাহা' ১২টি, 'সামন্ত' ১৩টি, 'সেন' ১৪টি, 'সিংহ' ২৯টি, 'হালদার' ২৭টি ও 'হাজরা' ২১টি। 'মুখোপাধ্যায়' ব্রাহ্মণ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের অনেক পদবী সদ্‌গোপদের মধ্যেও আছে। আবার ব্রাহ্মণদের অনেক পদবী দেখে বোঝা কঠিন তারা ব্রাহ্মণ কিনা—যথা : চম্পটি, শিহড়ি, মৎস্যাসি, তোড়ক, খড়খড়ি, ঝম্পটি, গোচণ্ড, কাবরী, শূল, দলোংকটা, লাড়ুলি, বাড়ুরি ইত্যাদি। (খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস', লোকেশ্বর বসু, 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' ও লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট খ

খনার বচন

জন্মলগ্নের শুভাশুভ নির্ণয় : সূর্য কুজে রাহু মিলে। গাছের দড়ি বন্ধন গলে॥ যদি রাখে ত্রিদশনাথ। তবু সে খায় নীচের ভাত॥ খনা বরাহরে বলে কোন্ লগ্ন দেখ। লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন্ গ্রহ দেখ॥ আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তারে খোঁড়া করে॥ থাকয় রবি ভ্রমায় ভূখণ্ড। চন্দ্র থাকয়ে ধরে নবদণ্ড॥ মঙ্গল থাকে করে খণ্ড খণ্ড। অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড॥ থাকে বুধ বিবয় করায়। গুরু শুক্র থাকে বহু ধন পায়॥ লগ্নে আঁকা, লগ্নে বাঁকা। লগ্নে থাকে ভানুতনুজা॥ লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ। মরে জননী পীড়ে বাপ॥ খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা। মিথুনে পুরিয়ে বেদা॥ সিংহে বসু কি কর বসে। আর সব পুরিবে দ্বশে॥

পরমায়ু গণনা : কিসের তিথি কিসের বার। জন্মনক্ষত্র কর সার॥ কি কর শ্বশুর মতিহীন। পলকে জীবন পাবে যেদিন॥ নরা গজা বিশে শয়। তার অর্ধেক বাঁচে হয়॥ বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্ধেক বরা পাগলা॥

দম্পতির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মরণ গণনা : অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা। নামে নামে করি সমতা॥ তিন দিয়ে হরে আন। তাহে মরা বাঁচা জান॥ একে শূন্যে মরে পতি। দুই থাকলে মরে যুবতী॥

প্রশ্ন গণনা : সাত পাঁচ তিন কুশল বাত। নয়ে একে হাতে হাত॥ কি করবে ছয়ে চটে। কার্য নাশ দুয়ে আটে॥

যাত্রার শুভসময় নিরূপণ : মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা॥ রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা। আর সব ফাসাফুসা॥ ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা। উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা॥ ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা॥ উড়ে পাখী খায় না। তখনি

কেন যায় না ॥

হাঁচি-টিক্‌টিকির ফল : (খনার জিহ্বা কর্তন করিয়া বরাহ তাহা নিভৃত স্থানে রক্ষা করেন। খাদ্যদ্রব্য মনে করিয়া টিক্‌টিকি উহা ভক্ষণ করে। তদবধি টিক্‌টিকির শব্দেও ভূত-ভবিষ্যৎ প্রকাশ হয়।) শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে। বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে ॥ এই সপ্ত কর্মে হাঁচি আদি সুশোভন। অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন ॥ বৃদ্ধ বা শিশু অথবা কফের যে হাঁচি। যত্নপূর্বক সেই হাঁচি কদাচ না বাছি ॥ গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ। জ্যোতিষ-বচনে ইহা অবশ্য বারণ ॥ দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি। উর্ধ্বভাগে হৈলে ধনভোগ কার্যসিদ্ধি ॥ পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়। দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানহ নিশ্চয় ॥ নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব। বায়ু-কোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ। উত্তরে টিক্‌টিকি হাঁচি স্ত্রীলাভ কারণ। ঈশানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ ॥

তিথি গণনা : রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল। বুধ এগারো বৃহস্পতি বারো। শুক্র চৌদ্দ শনি তেরো ॥ হাঁচি জ্যেঠি পড়ে যবে। অষ্টগুণ লভ্য হবে ॥

যাত্রাকালীন শুভলক্ষণ : শূন্য কলসী শুক্‌না না। শুক্‌না ডালে ডাকে কা ॥ যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পা-ও না বাড়াও বাপা ॥ ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়। আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥ মরা হতে জেন্ত ভাল যদি মরতে যায়। বাঁয়ে হতে ডানে ভাল যদি ফিরে চায় ॥ বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে চায়। হাঁসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয় ॥

চন্দ্রগ্রহণ গণনা : যে যে মাসের যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী। সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী ॥ দুই তিন পাঁচ ছয়। একাদশে দেখ্‌তে হয় ॥

রবিবার দোষে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির লক্ষণ : পাঁচ রবি মাসে পায়।

ঝরা কিম্বা খরায় যায় ॥

তিথিভেদে ফাল্গুনমাসের ফল : ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই। আগামী বৎসর গণিয়া পাই ॥ সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান। নবমীতে বন্যা, দশমীতে নির্মূল পাতান ॥

চৈত্রমাসে বারদোষে বৎসরের ফল : মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যেই বার। রবি চোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার। সোম শুক্র গুরু বার। পৃথিবী না সহে শস্যের ভার ॥ পাঁচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥

শনির অবস্থাভেদে চৈত্রমাসের ফল : মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি। খনা কয় সে বৎসর হবে শস্যহানি ॥

ধর্মার্থে উপবাসের দিন : শয়ন উত্থান পাশমোড়া। তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া ॥ দুই ছেলের জন্মতিথি। অষ্টমী নবমী দুটি ॥ পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট ॥ এও যদি না করতে পারিস্। ভবার খাদে ডুবে মরিস্ ॥

সময়-বিশেষে ভূমিকম্পের দ্বারা অমঙ্গল আশঙ্কা : ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শুনহে পতির পিতা। ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা ॥ রাজ্য নাশ, গোধন নাশ, হয় অগাধ বান। হাতে কাঠা গৃহী ফেরে, কিনতে না পায় ধান ॥

গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা : যত মাসের গর্ভ নারীর নাম য' অক্ষর। যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর ॥ সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়। ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয় ॥ বাণের পিঠে দিয়ে বাণ। পেটের ছেলে গণে আন ॥ নামে মাসে করে এক। আটে হরে সন্তান দেখ। এক তিন থাকে বাণ। তবে নারীর পুত্র জান ॥ দুই চারি থাকে ছয়। অবশ্য তার কন্যা হয়। যদি থাকে শূন্য সাত। তবে নারীর গর্ভপাত ॥ গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা। তিন দিয়া হয় পূতা ॥ একে সুত দুয়ে সুতা। শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা ॥ এ কথা যদি মিথ্যা হয়। সে ছেলে তার বাপের

নয় ॥ নামে মাসে করি এক। তার দ্বিগুণ করি দেখ ॥ সাতে পূরি আটে হরি। সমে পুত্র বিষমে নারী ॥

মড়ক গণনা : চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান ॥

বন্যা গণনা : পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়। সেই বৎসর বন্যা হয় ॥ আমে ধান। তেঁতুলে বান ॥ বামুন বাদল বান। দক্ষিণা পেলেই যান ॥

বৃষ্টি গণনা, কুয়াসা গণনা, বন্যা গণনা, ধান্যাদি গণনা ও মৎস্যাদি গণনা : দিনে জল রাতে তারা। এই দেখ যে শুকোর ধারা ॥ পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥ খনা বলে শুন হে স্বামী। শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি ॥ পূর্বেতে উঠিল কাঁড়। ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥ চাঁদের সভার মধ্যে তারা। বর্ষে পানি মুষলধারা ॥ চৈত্রেতে থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর ॥ জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে ॥ কি কর শ্বশুর লেখাজোখা। মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥ কোদালে কুড়ালে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা ॥ বল্‌গে চাষায় বাঁধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল ॥ দূর সভা নিকট জল। নিকট সভা রসাতল ॥ পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে ধারা ॥ বেঙ ডাকে ঘন ঘন। শীঘ্র বৃষ্টি হবে জান ॥ বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয় ॥ পৌষে কুয়া বৈশাখে ফল। য'দিন কুয়া ত'দিন জল ॥ শনির সাত মঙ্গলের তিন। আর সব দিন দিন ॥ ভাদ্বরে মেঘে বিপরীত বায়। সে দিন বড় বৃষ্টি হয় ॥ কর্কট ছরকট সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান। বিনা বায় তুলা বর্ষে, কোথা রাখ্‌বি ধান ॥ যদি বর্ষে আঘনে। রাজা যান মাগনে। যদি বর্ষে পৌষে। কড়ি হয় তুষে ॥ যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ ॥ যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউন দ্বিগুণে ॥ জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা ॥ মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা ॥ জ্যৈষ্ঠে মারে আষাঢ়ে ভরে। কাটিয়া মাড়িয়া ঘর করে ॥ যদি বর্ষে মকরে। ধান হবে টেকরে ॥ যদি হয়

চৈত্রে বৃষ্টি। তবে হবে ধানের সৃষ্টি॥ কার্তিক পূর্ণিমা কর আশা। খনা ডেকে বলে শোন্‌রে চাষা॥ নির্মল মেঘে যদি বাত বয়। রবিখন্দের ভার ধরণী না সয়॥ মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল॥ আষাঢ়ে নবমী শুকুল পাখা। কি কর শ্বশুর লেখাজোখা॥ যদি বর্ষে মুষলধারে। মধ্যসমুদ্রে বগা চরে॥ যদি বর্ষে ছিটেফোঁটা। পর্বতে হয় মীনের ঘটা॥ যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি। শস্যের ভার না বয় মেদিনী॥ হেসে চাকি বসে পাটে। শস্য সেবার না হয় মোটে॥

শস্য গণনা, হল-চালন করিবার সময় নির্ণয়, শস্যাদি রোপণ ও কাটিবার সময় নিরূপণ, আলবন্ধনের প্রণালী ইত্যাদি : শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো। এর মধ্যে যত পারো॥ ষোল চাষে মূলা। তার অর্ধেক তুলা॥ তার অর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥ খনা বলে শুন কৃষকগণ। হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন॥ শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা॥ কর গিয়ে আগে দিক্‌ নিরূপণ। পূর্বদিক হতে কর হল চালন॥ তা হলে তোর সমস্ত আশয়। হইবে সফল নাহিক সংশয়॥ থোড় তিরিশে। ফুলো বিশে॥ ঘোড়ামুখো তের (দিন) জান। ইহা বুঝে কাট ধান॥ পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ চিরকাল॥ তার বলদের হয় বাত। নাহি থাকে ঘরে ভাত॥ খনা বলে আমার বাণী। যে চষে তার প্রমাদ গণি॥ আষাঢ়ে কাড়ান নামকে। শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥ ভাদ্দরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে॥ থেকে বলদ না বয় হাল। তার দুঃখ চিরকাল॥ বাড়ীর কাছে ধান পা। যার মা'র আছে ছা॥ চিনিস বা না চিনিস। খুঁজে দেখে গরু কিনিস॥ আঁধার পরে চাঁদের কলা। কতক কালা কতক ধলা॥ উত্তরে উচো দক্ষিণে কাত। ধারায় ধারায় ধানের ধাত॥ ধান চাষ হবে লতা। লোকে কবে মিঠে কথা॥ কোল পাতলা ডাগর গুছি। লক্ষ্মী বলে এখানে আছি॥ ডেকে ডেকে খনা

গান। রোদে ধান ছায়ায় পান॥ এক অঘ্রাণে ধান। তিন শ্রাবণে পান॥ কার্ত্তিকের ঊন জলে। দুনো ধান খনায় বলে॥ অঘ্রাণে পৌটি। পৌষে ছেউটি॥ মাঘে নাড়া। ফাগুনে কাঁড়া॥ শীষ দেখে বিশ দিন। কাট্‌তে মাড়তে দশ দিন॥ শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষা খোঁড়ো কেবলমাত্র॥ বাপ বেটায় চাষ চাই। তা অভাবে সোদর ভাই॥ আগে বেঁধে দিবে আলি। তবে রুয়ে দেবে শালি॥ তাতে যদি না ফল ফলে। গালি পেড়ো খনা বলে॥ আষাঢ়ের পঞ্চ দিনে রোপয় যদি ধান। সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান॥ আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস॥ ভাদ্রে চারি আশ্বিনে চারি। কলাই রোবে যত পারি॥ সরিষা বুনে কলাই মুগ। বুনে বেড়াও চাপ্‌ড়ে বুক॥ আশ্বিনের উনিশ কার্তিকের উনিশ। বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বুনিস॥ ফাল্গুনের আট, চৈত্রের আট। সেই তিল দায়ে কাট॥ খনা বলে চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো॥ সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাবে মায়ে পোতে। কলা লাগিয়ে না কেটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥ যদি থাকে টাকা করবার গোঁ। তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা রো॥ দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল॥ মানুষ মরে যাতে। গাছলা সারে তাতে॥ পচলা সরায় গাছলা সারে। গোধলা দিয়ে মানুষ মরে॥ বৈশাখের প্রথম জলে। আশু ধান দ্বিগুণ ফলে॥ শুন ভাই খনা বলে। তুলার তুলা অধিক ফলে॥ আউশের ভুঁই বেলে। পাটের ভুঁই আঁটালে॥ কোদালে মান, তিলে হাল। কাতেন ফাকার মাঘে কাল॥ ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল। করে বা চাষার ছাওয়াল॥ সরষে ঘন পাতলা রাই। নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস চাই॥ কাপাস বলে কোষ্টা ভাই। জাতির পানি না যেন পাই॥ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি॥ ঘরে বসে পুছে বাত। তার ঘরে হা ভাত॥ যেবার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে। সর্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে॥ নানা শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়। খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয়॥ বুধ রাজা, শুক্র তার

মন্ত্রী যদি হয়। শস্য হবে ক্ষেত্রে পুরা নাহিক সংশয়॥ লাউ গাছে মাছের জল। ধেনো মাটিতে বাড়ে ঝাল॥ বাঁশবনের ধারে বুনলে আলু। আলু হয় গাছ বেড়ালু॥ চাল ভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন আমি তথা॥ পান পোঁতে শ্রাবণে। খেয়ে না ফুরোয় রাবণে॥ উঠান ভরা লাউ শসা। খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥ ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ। কিন্তু তাহে নাহি দুখ॥ পটল বুনলে ফাগুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে। নদীর ধারে পুঁতলে কচু। কচু হয় তিন হাত উঁচু॥ ফাগুনে না রুলে ওল। শেষে হয় গণ্ডগোল॥ কচুবনে যদি ছড়াস ছাই। খনা বলে তার সংখ্যা নাই। মূলার ভূঁই তুলা। ইক্ষুর ভূঁই ধুলা॥ শোন্‌রে মালি বলি তোরে। কলম রো শাওনের ধারে॥ ভাদ্দর আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল। যে চাষা মায়ে কাটায় কাল॥ পরেতে কার্তিক আঘন মাসে। বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়া আসে॥ সে গাছ মরিবে ধরিবে ওলা। পুরিতে হবে না ঝালের গোলা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও। দাবা পাশা খেলা যে লয়ে থোও॥ আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদ্দরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি॥ অন্য নিয়মে পুতলে হলদি। পৃথিবী বলে তাতে কি ফল দি॥ ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটি। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥ শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥ দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে। দুই কুড়া ভূঁই বেড়বে ঝাড়ে॥ শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটীর মধ্যে ফেলে যেটা॥ তাতে যদি বুনিস্ পটোল। তাতেই তোর আশা সফল॥ খনা বলে শুন শুন। শরতের শেষে মূলা বুন। বলে গেছে বরাহের পো। দশ মাস বেগুন রো॥ চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ॥ ধরলে পোকা দিবে ছাই। এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥ মাটি শুকালে দিবে জল। সকল মাসেই পাবে ফল। আঘণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি॥ এক পুরুষে রোপে তাল। পর পুরুষে করে পাল। তারপর যে সে খাবে। তিন পুরুষে ফল পাবে॥ হাত বিশে করি ফাঁক। আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ॥ গাছ-গাছালি ঘন সবে

না। গাছ হবে তার ফল হবে না॥ বারো বছরে ফলে তাল। যদি না লাগে গরুর নাল। নালকান্তার গজেক বাই। কলা রুয়ে খেয়ো ভাই। রুয়ে কলা না কেটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥ ফাল্গুনে এঁটে। পৌত কেটে॥ বেড়ে যাবে ঝাড়কে ঝাড়। কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়। ডাক ছেড়ে বলে রাবণে। কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণে॥ তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে। রুবি বটে খাবিনে। কলাতলায় যাবিনে॥ লেগে যাবে ভূঁয়ে। কলা পড়বে শুয়ে। এক হাত এক মুটন কলা পৌত। তবে দেখবে কলার গোট॥ সিংহ মীন বর্জে। কলা খাবে আজে॥ যদি রোপে ফাল্গুনে কলা। তবে হয় মাস সফলা। ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা। সবংশে মলো রাবণ শালা॥ আগে পুঁতে কলা। বাগ বাগিচা ফলা॥ শোনরে বলি চাষার পো। কলা নারিকেল ক্রমে গুয়ো॥ নারিকেল বারো সুপারি আট। এর ঘন তখনি কাট॥ গো নারিকেল নেড়ে রো। আমটুটুরে কাঠাল ভো॥ গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটি। অফলা নারিকেল শিকড় কাটি। ওলে কুটি, মানে ছাই। এইরূপে কৃষি করগে ভাই॥ নারিকেল গাছে দিলে নুন মাটি। শীঘ্র শীঘ্র কাটে গুটি॥ দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে বারো মাস। খনা ডাকিয়ে বলে। চিটা দিলে নারিকেল মূলে॥ গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥ শোনরে বাপু চাষার পো। সুপারি বাগে মান্দার রো॥ মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে। ফল বাড়ে ঝটপট কোরে॥ হাতে হাতে ছোঁয় না। মরা ঝাটি রয় না॥ খনা বলে যখন চায়। তখন কেন না লয়॥

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

অতুল সুর : বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।

: ভারতের বিবাহের ইতিহাস।

: হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য।

: বাঙলার সামাজিক ইতিহাস।

: বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঙলার ব্রত।

অশোক মিত্র : পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।

কামিনীকুমার রায় : লৌকিক শব্দকোষ।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাঙলার লৌকিক দেবতা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান।

তুষার চট্টোপাধ্যায় : বিবিধ নিবন্ধ।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার : বিবাহের লোকাচার।

নির্মলকুমার বসু : হিন্দুসমাজের গড়ন।

নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব।

পল্লব সেনগুপ্ত : বিবিধ নিবন্ধ।

প্রদ্যোৎকুমার মাইতি : বাঙলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি।

বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : আচার প্রবন্ধ।

যোগেশচন্দ্র রায় : পূজাপার্বণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য।

শঙ্কর সেনগুপ্ত : বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য।

সুধীরকুমার করণ : সীমান্ত বাঙলার লোকযান।

সুহৃদকুমার ভৌমিক : বাঙালীর জাতিতত্ব ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়।

ইংরেজি

Allchin, B. & R. : The Birth of Indian Civilization.
Bhowmik, P. K. : Cultural Profile of Frontier Bengal.
Birket-Smith, K. : Primitive Man and His Ways.
Boas, Franz : General Anthropology.
Census Reports 1901, 1911, 1931 and 1961.
Chanda, R. P. : Indo-Aryan Races.
Childe, Gordon : How Man Made Himself.
Cipollo, Carlo : An Economic History of the World. Population.
Clodd : Animism.
Coon, Carlton : History of Man.
Crooke, W. : Popular Religion & Folklore of North India.
Dalton : Descriptive Ethnolgy of Bengal.
Das, A. K. : Handbook of Scheduled Castes and Tribes of West Bengal.
Elwin, Verrier : The Religion of an Indian Tribe.
Frazer, J. G. : Golden Bough.
Freud, Sigmund : Totems and Taboos.
Grierson, G. A. : Linguistic Survey of India.
Guha, B. S. : Races of India.
Hoebel, A. : Man in the Primitive World.
Lal, B. B. & Thapar, B. K. : Excavations at Kalibangan.
Leakey, L. S. B. : The Search for Man's Ancestry.
Levi-Strauss, C. : Structural Anthropology.
Mackay, E. : Further Excavations at Mohenjodaro.

Malinowski, B. : Argonauts of the Western Pacific.
Marshall : Mohenjodaro.
Meade, Margaret : Man and Woman.
Pigott. S. : Prehistoric India.
Possehl, G : Ancient Cities of the Indus.
Rao, S. R. : Lothal & the Indus Civilization.
Rapport, S. & Wright, H. : Anthropology.
Risley, H. : People of India.
Roy, S. C. : The Birhors.
Sauer, C. O. : Agricultural Origins and Dispersal.
Shapiro, H. L. : Man, Culture & Society.
Sur, A. K. : Pre-Aryan Elements in Indian Culture.
" " Prehistory & Beginnings of Civilization in Bengal.
" " History & Culture of Bengal.
" " Dynamics of Synthesis in Hindu Culture.
" " Folk Elements in Bengali Life.
Vats, M. S. : Excavation at Harappa.
Washburn, S. L. : Anthropology Today.
Westermarck : History of Human Marriage.
Whitehead, H. : Village Gods of South India.

নির্ঘণ্ট